স্বয়ংসিদ্ধা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

তিন টাকা

পঞ্চম মুদ্রণ

সমর্পণ

ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে বারাণসী ধামে

লেখকের কর্ম্মশালায় পদার্পণ করিয়া

বঙ্গের যে স্বয়ংসিদ্ধ মহামনীষী

স্বয়ংসিদ্ধার নায়িকা চণ্ডীর

প্রাথমিক চরিত্র-চিত্রণ-প্রসঙ্গে

মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন

ষোড়শ বৎসর পরে সেই চিত্রটি

গ্রন্থাকারে রূপপরিগ্রহ করিয়া

বাঙ্গালার সেই চিরস্মরণীয় পুরুষসিংহ

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

অবিনশ্বর স্মৃতির উদ্দেশে

লেখক কর্ত্তৃক

গভীর শ্রদ্ধাসহকারে সমর্পিত হইল।

পরিচয়

এই উপন্যাসখানির কিঞ্চিৎ অংশ ১৩২৭ সালে বারাণসী হইতে প্রকাশিত "প্রবাস-জ্যোতি" নামক পত্রিকায় 'চণ্ডী' নামে বাহির হয়। তৎকালে ইহা সাহিত্য-রসিক-সমাজে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইলেও, অধিকদূর অগ্রসর হইবার অবসর পায় নাই। তাহার পর, ১৩৪১ সালের ভয়াবহ বেরিবেরির প্রকোপে কাশীর কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া পুনরায় যখন সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হই, সেই সময় আমার পরমাত্মীয়, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের সুদক্ষ শিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "প্রবাস-জ্যোতি"র জীর্ণপ্রায় কয়েকখানি পাতা আমাকে উপহার দিয়া এই উপাখ্যানটি শেষ করিতে অনুরোধ জানান। উক্ত পাতাগুলিতে চণ্ডীর গোটা দুই অধ্যায় ছাপা হইয়াছিল। চণ্ডী-চরিত্র যখন চিত্রিত হয়, শিল্পীবর তখন লেখকের সংস্রবে কাশীর কর্ম্মক্ষেত্রেই ছিলেন এবং নানা-সূত্রে এই চিত্রটির প্রতি ছিল তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা; ইহার সমাপ্তি সম্বন্ধে এই জন্যই তাঁহার এতটা আগ্রহ দেখা দিয়াছিল।

আমার এই শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয় শিল্পীর সযত্ন রক্ষিত পাতা কয়খানিই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব রচনার আমূল পরিবর্ত্তন ও নূতন পরিকল্পনায় ইহা পুনরায় রচনা করিবার অবকাশ পাই। রচনার সঙ্গে সঙ্গেই ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাস হইতে ইহা "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় "স্বয়ংসিদ্ধা" নামে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। তৎপরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্তৃপক্ষের আগ্রহে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমার সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইহাই প্রথম উপন্যাস। পাঠক-সমাজে ইহার আদর ও প্রশংসাই লেখকের পক্ষে অপরিসীম আনন্দের কথা।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

এই উপন্যাসখানি পাঠক-মহলে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছে—উত্তরোত্তর প্রচার প্রাচুর্য্যেই তাহা উপলব্ধি করা যায়! আমার পক্ষে সর্ব্বাধিক আনন্দের বিষয় এই যে—বিভিন্ন সমাজের অভিভাবকগণ, এমন কি শিক্ষিত তরুণ তরুণীরাও 'উপহার-প্রসংগে' উপন্যাস-রূপে ইহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন।

আরও একটি আনন্দের কথা এই যে, গ্রন্থখানি ছায়া-চিত্রে রূপায়িত হইয়া সর্ব্বজনের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

বিখ্যাত 'হিজ মাষ্টার ভয়েস' (গ্রামোফোন কোং) কর্তৃক গ্রন্থখানি রেকর্ড-নাট্যে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পক্ষে এগুলি অল্প উৎসাহের দ্যোতনা নহে।

সাহিত্য-ভবন
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট : শ্রাবণ, ১৩৫৫

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ংসিদ্ধা

প্রথম পর্ব্ব

এক

বাগুলীর জবরদস্ত জমিদার হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী কবিরাজ করালী চাটুয্যের দজ্জাল মেয়ে চণ্ডীকে দেখিতে আসিতেছেন—এ কথা রাষ্ট্র হইতেই সারা শ্যামাপুর গ্রামখানির ভিতরে একটা রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে গ্রামব্যাপী বিপুল চাঞ্চল্যের মূলে হেতুরও অভাব ছিল না। সেগুলির আলোচনা করিলে বিস্ময়বিলুব্ধ প্রতিবাসীদের মনোবৃত্তির উপর যে দোষারোপ করা চলে না, নিম্নের ঘটনাগুলি হইতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শ্যামাপুর নামে সমৃদ্ধ গ্রামখানি যে পরগণার অন্তর্গত, সেই পরগণাটির প্রায় ষোল আনার মালিক বাগুলীর জমিদার হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী। ইনি আবার যেমন তেমন জমিদার নহেন, বর্ত্তমানের কড়া আইন-কানুনের মধ্যেও তাঁহার এমনই দপদপা যে, প্রজাদের টুঁ-শব্দটিও করিবার জো নাই। শুধু তাহাই নয়, যখন তাঁহার মনে যে খেয়াল উঠিবে, যে জেদ তিনি ধরিবেন, তাহা হইতে কেহ কোন দিন তাঁহাকে নিরস্ত করিতে

পারে নাই। একটিবার যে-কথা তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে, কখনও তাহার নড়চড় হয় নাই। রাজার মত এই গাঙ্গুলী-বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য্য। এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা বাশুলীর গাঙ্গুলী বাবুদের নামে সদাসর্ব্বদাই ভীত, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত-মস্তক।

করালী চট্টোপাধ্যায় ছাপোষা মানুষ। কতকগুলি কবিরাজী ঔষধ নাড়াচাড়া করিয়া তাহারই উপস্বত্বে অনেকগুলি পোষ্য তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে হয়। স্বধর্ম্মে আস্থাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও সজ্জন বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও আছে। যাহা উপায় করেন, তাহাতেই সংসারব্যয় নির্ব্বাহ হয়; অভাবের তাড়না সহ্য করেন না, ঋণের কালিমা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সহধর্ম্মিণী সুগৃহিণী, সংসার-তরীখানির হাল ধরিবার শক্তি ও কৌশলটুকু পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করিয়াছেন, সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সাংসারিক ব্যাপারে একান্ত সুখী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

কিন্তু এই সুখের সংসারে সমস্যা তুলিয়াছে সম্প্রতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনূঢ়া তরুণী শ্রীমতী চণ্ডী।

শ্যামাপুর গ্রাম ও পিতামাতার সহিত চণ্ডীর ঘনিষ্ঠতা দেড়টি বৎসরের বেশী নয়। চণ্ডী যখন পাঁচবছরের বালিকা, তখন তাহার মাতামহ অধ্যাপক বীরমূর্ত্তি শ্যামাপুরে কন্যা-জামাতাকে দেখিতে আসেন। তিনি তখন পাঞ্জাবের কোন প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যায়াম-অধ্যাপক। সেখানেই সপরিবার অবস্থিতি করেন। বালিকা চণ্ডীকে দেখিয়া, তাহার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইয়া তিনি জামাতাকে অনুরোধ করিলেন—তোমার এই মেয়েটিকে দেখে আমার ভারি ভাল লেগেছে। আমি একে পাঞ্জাবে নিয়ে গিয়ে আমার মনের মত ক'রে মানুষ করব। বছর বারো পরে তোমাদের মেয়েকে আবার ফিরিয়ে দেব, তখন তোমরা দেখে অবাক হয়ে যাবে।

শ্বশুরের অনুরোধ জামাতা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। চণ্ডীকে

তাঁহার হাতে তুলিয়া দেন। স্বাস্থ্যবিদ্ মাতামহ চণ্ডীকে সুদূর পাঞ্জাবে লইয়া যান, এবং সেই সময় হইতেই তাহাকে তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে সকল বিদ্যাতেই পটীয়সী করিয়া তুলিতে যথাশক্তি প্রয়াস পান।

অধ্যাপক বীরমূর্ত্তি শুধু শক্তিসাধকই ছিলেন না, বহু ভাষা ও নানা দেশের পণ্ডিতদের গ্রন্থরাজির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ ও সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল অসাধারণ। চণ্ডীকে তিনি সত্যকার শিক্ষা দিয়া যেমন শিক্ষিতা করিয়া তুলিতেছিলেন, পক্ষান্তরে তেমনই স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিবিধ শিক্ষায় কিশোর বয়সেই তাহাকে এমন পারদর্শিনী করিয়াছিলেন যে, পঞ্চনদের জলবায়ু, শক্তিসাধক শিক্ষকের শিক্ষানৈপুণ্য এবং ছাত্রীর ঐকান্তিক সাধনা সম্যক্‌রূপেই সার্থক হইয়াছিল।

এই সময় সহসা অধ্যাপক বীরমূর্ত্তি ইহলোকের সাধনা শেষ করিয়া পরলোকের পথে মহাপ্রস্থান করিলেন। চণ্ডী তখন কৈশোরের সীমা প্রায় অতিক্রম করিয়াছে। শক্তিসাধক গুরুর তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যসাধনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে তখন যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লীলায়িত, স্বাস্থ্যপুষ্ট নিটোল দেহের সে রূপৈশ্বর্য্য অতুলনীয়, অনবদ্য।

মাতামহের মৃত্যুর পর চণ্ডীকে শ্যামাপুরে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু শ্যামাপুরের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন চণ্ডীর আবাল্যের রুচি ও প্রকৃতির সম্মুখে পদে পদেই অন্তরায় তুলিতে লাগিল। তাহার চলা-ফেরা আচার-ব্যবহার, খাওয়া-পরার ধারা সমবয়সী মেয়েদের পক্ষে যেমন নূতন, তেমনই বিসদৃশ। চণ্ডী চায়, সে যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এত বড় হইয়াছে, এখানকার মেয়েরাও সেই ধারায় চলে; কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মেয়েরাও হাসিয়া খুন! তাহারা বলে, ব্যায়াম ত করে ছেলেরা; মেয়েরাও তাহাদের মতন মুগুর ভাঁজিবে, কুস্তি করিবে, মাথায় বোঝা লইয়া নাচিবে, ডনবৈঠক করিবে—দূর্ দূর্!

কথায় কথায় এক একদিন ঝগড়াও যে হয় না, তাহা নয় ; কিন্তু ঝগড়া বাধিলেই পাড়ার মেয়েদের নাকালের আর অন্ত থাকে না। চণ্ডী অতর্কিতভাবে যুযুৎসুর এমন প্যাঁচ তাহাদের উপর প্রয়োগ করিয়া বসে যে, তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া যায়। নিজের সমবয়সী বা অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের মেয়েদের সে সহসা এমন তৎপরতায় দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া ধরে যে তাহারা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠে। চণ্ডী হাসিয়া বলে—আমার মুখ চলে না তোদের মত, কিন্তু হাত এমনই বেপরোয়া চলে। কাজেই আমাকে ঘাঁটালেই মুস্কিল !

চণ্ডীর সহিত ভাব করিবার জন্য যাহারা ছুটিয়া আসিত, চণ্ডীর কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার তাহাদিগকে অবাক্ করিয়া তফাতে সরাইয়া দিত। পল্লীপথে মেয়েদের যে সব অবস্থায় ভয়ে বা সঙ্কোচে অভিভূত হইবার কথা, চণ্ডী সে সমস্ত ভয়-বাধায় ভ্রূক্ষেপও করিত না। কোনও মেয়ে যদি তাহাকে প্রশ্ন করিত—তোমার ভয় করে না ? চণ্ডী গম্ভীর হইয়া উত্তর দিত—গায়ে জোর থাকলে ভয়-ডর কাছে ঘেঁষে না।

চণ্ডীর কথা লইয়া পাড়ায় চর্চ্চার অন্ত নাই। বর্ষীয়সীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন—মাগো মা, চাটুয্যেদের কি মেয়েই তৈরী হয়েছেন—যেন ধিঙ্গী। কি ক'রে পার করবে বাবা !

মেয়ের এইরূপ সপ্রতিভ ও নিঃশঙ্কভাব পিতামাতার মনেও ক্রমশঃ সংশয়ের রেখাপাত করিতে থাকে। বয়স হইয়াছে, পরের ঘর করিতে হইবে এতটা বেপরোয়া হওয়া ত ভাল কথা নয়। বছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই গ্রামময় টি-টি পড়িয়া গিয়াছে।

অথচ যাহার সম্বন্ধে এই সকল অনুযোগ, তাহার আচরণে নীতির দিক দিয়া এমন কোনও অপরাধ কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, যাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করা চলে। সুযোগ্য গুরুর নিকট

সে শুধু শিক্ষা ও শক্তির মর্য্যাদা রক্ষার দীক্ষা লয় নাই, আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধেও চণ্ডী ছিল একান্ত সচেতন।

তথাপি চণ্ডী প্রতিবাসীদের সুখ্যাতি পাইল না। সে ভাল ভাবিয়া যে কার্য্যটিতে হাত দিত, তাহাতেই হইত তাহার নিন্দা। এ অঞ্চলে দরিদ্র ঘরের নীচ জাতির মেয়েরা বাড়ী বাড়ী বরাবর তরিতরকারী, মাছ প্রভৃতি ফেরি করিয়া বিক্রয় করে, তাহাতেই তাহাদের অন্নসংস্থান হয়। কিন্তু সম্প্রতি দূরবর্ত্তী সহর হইতে খোট্টারা ঝাঁকা ভরিয়া সহরের চালানী আনাজ-পত্র বহিয়া আনিয়া বিক্রয় সুরু করিয়া দেওয়ায়, পল্লীর অনাথারা মাথায় হাত দিয়া পড়িল, পল্লীবাসীদের তাহাতে দৃক্পাত নাই। সস্তায় দেশ-দেশান্তরের চালানী মাল পাইয়া তাহারা পল্লীর উৎপন্ন পণ্যের মায়া অনায়াসেই কাটাইয়া দিল। কিন্তু চণ্ডী ইহা সহিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে কাহারও সহানুভূতি না পাইলেও, এ মেয়েটি একাই বিদেশী ফিরিওয়ালাদের এমন বিব্রত ও নাকাল করিয়া তুলিল যে, তাহারা গ্রামের ত্রিসীমানাও আর মাড়াইতে সাহস করিল না। কিন্তু পল্লীসমাজে এজন্য চণ্ডীর নামে নানারূপ নিন্দা রটিল।

পল্লীর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চার্চ্চ মিশন সোসাইটীর সৌজন্যে একটি মিশনারী স্কুলও গ্রামের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিল। ছোট ছোট মেয়েরা এখানে লেখাপড়ায় যতটা ওস্তাদ না হউক, পাদরীদের অনুকরণে নানারূপ ছড়া কাটিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও দেবদেবীর বিকৃত বর্ণনায় রীতিমত কৃতবিদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মিস্ খৃষ্টকুমারী নাম্নী এক সদ্য ব্যাপ্টাইজড্ তরুণী এই শিক্ষালয়টির ভার পাইয়া এই অঞ্চলের বালিকা-গুলিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। ছাত্রীদের লেখাপড়ার দিকে এই নবীনা শিক্ষয়িত্রীর যত না আগ্রহ ছিল, তাহাদিগের তরুণ চিত্তগুলির উপর তাহাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম ও আরাধ্য দেবতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণার সঞ্চার করিতে

তাঁহার যত্নের অভাব দেখা যাইত না। ছোট ছোট মেয়েরা যখন তোতা-পাখীর মত শেখানো ছড়া কাটিত, গান গাহিত—ধর্ম্মপদ্ধতি ও ঠাকুর দেবতাদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভদ্র বিদ্রূপ ঐ সকল ছড়া ও গানে ব্যক্ত হইয়া পড়িত তাহাদের পরিজনরা হাসিয়া উপেক্ষা করিলেও চণ্ডী তাহাদের ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিত না। সে প্রায়ই প্রতিবাদ করিয়া বলিত, ও স্কুলে আপনারা মেয়ে পাঠাবেন না। ওখানে ওদের মনের ভিতরে যে বিষ ঢোকানো হচ্ছে, তার ফল কখন ভাল হবে না।

কিন্তু কে তাহার কথা শুনিবে? পশ্চিমের ফেরত বেহায়া একটা মেয়ে পাড়ার 'মোড়ল' হইয়া সকল বিষয়েই মাথা দিয়া দাঁড়াইতে চায়! ইহা অসহ্য। অভিভাবিকাদের কেহ ঝাঁঝাইয়া প্রশ্ন করিলেন—ও স্কুলে পাঠাব না ত পাঠাব কোন চুলোয়?

চণ্ডীও দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—ওখানে পাঠিয়ে মেয়েদের মাথা খাওয়ার চেয়ে ঘরে বসিয়ে সংসারের কাযকর্ম্ম শেখানো ঢের ভাল।

এক বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী মুখখানা মচকাইয়া কহিলেন—তোর বে হলে, শ্বশুরকে বলিস্ যেন এ গাঁয়ে একটা 'পাঠশালা' বানিয়ে দেয়, আর তোকে করে তার মাষ্টারণী!

চণ্ডী বুঝিল, তাহার যুক্তি নিষ্ফল। কিন্তু পল্লীর এতগুলি মেয়ের এই মনোবৃত্তি তাহার মনে সদা-সর্ব্বদাই খোঁচা দিতে লাগিল, কি করিয়া এই অনাচার হইতে সে এই গ্রামখানিকে রক্ষা করিবে? কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না। মেয়েদের বুঝাইতে গিয়া, সে তাহাদের চাপা হাসির টিট্‌কিরি শুনিল। সকলে মিলিয়া, তাহার দিকে চপলকটাক্ষে চাহিয়া, সমস্বরে এমন এক গান ধরিল, চণ্ডী শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না।

স্নানের ঘাটেই ঘটিয়াছিল সে দিন এই ব্যাপার। চণ্ডীও স্নান করিতে আসিয়াছিল, মেয়েরাও জলে নামিয়া চণ্ডীর কথার উত্তরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া স্কুলের শেখানো গান ধরিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সব

চুপ! প্রত্যেক মেয়েটিকে ধরিয়া চণ্ডী এমনভাবে জলে চুবাইয়া দিল যে, তাহাদের একেবারে মৃতকল্প অবস্থা। কেহই রেহাই পাইল না সে দিন চণ্ডীর কঠোর হস্তের কঠিন শাসন হইতে।

কিন্তু ইহার পর অভিভাবকদের পক্ষ হইতে মেয়েদের এই লাঞ্ছনার বিনিময়ে চণ্ডীর উদ্দেশে যে সব মন্তব্য প্রচারিত হইয়া সারা গ্রামখানিকে মুখর করিয়া তুলিল, চণ্ডী তাহা হাসিয়া উপেক্ষা করিলেও তাহার পিতা-মাতা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। চণ্ডীকে সে দিন তাঁহারা রূঢ়ভাবে জানাইয়া দিলেন, এটা পাড়াগাঁ, দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে এখানে থাকতে হয়। পাঞ্জাবী ধিঙ্গীপণা এখানে সম্পূর্ণ অচল!

চণ্ডী নীরবে পিতামাতার তিরস্কার শুনিল। তাহার মনে জাগিল দীক্ষাদাতা মাতামহের দৃপ্ত কথা—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ —ঘটা করিয়া যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করে কিম্বা জোর করিয়া যাহারা ধর্ম্মে আঘাত দেয়, শুধু কি তাহারাই ভয়াবহ? ছোট ছোট মেয়েদের তরুণ মনগুলি যাহারা শিক্ষার ছলে বিষাইয়া দিয়া তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস গোড়াতেই শিথিল করিয়া দেয়—তাহা কি অধিকতর ভীতিপ্রদ নয়? তাহার মনে পড়িল, পাঞ্জাবের এক ঘটনা। পাঞ্জাবী মেয়েদের শিক্ষা দিবার ছলে এইরূপ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ফলে কি আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেখানে! আর এখানে, এ সম্বন্ধে কোনও প্রতিকারেরই পথ নাই, চেষ্টা নাই, ইচ্ছাও নাই কাহারও। দুই চক্ষু তাহার আর্দ্র হইয়া গেল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে তাহার দাদামহাশয়ের দেওয়া গীতাখানি খুলিয়া বসিল।

চণ্ডীর পড়াশুনা কতদূর, তাহা কেহ জানিত না। দীর্ঘ একযুগ ধরিয়া খেয়ালী দাদামহাশয় তাঁহার এই আদরিণী নাতিনীটিকে কি ভাবে শিক্ষিতা করিয়াছেন, চণ্ডীর পিতামাতাও তাহা জানিতে কিছুমাত্র আগ্রহই কোনও দিন প্রকাশ করেন নাই। চণ্ডীও কোনও সূত্রেই কখনও

কাহাকেও জানিবার অবসর দেয় নাই, কি পর্য্যন্ত তাহার বিদ্যার দৌড়! এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া বরং দৌড়-ঝাঁপের দিকেই ঝুঁকিয়া সেই পথেই সে তাহার দক্ষতাটুকু প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে প্রকাশ করিত। কিন্তু নিজের ছোট ঘরখানির দ্বারটি রুদ্ধ করিয়া বিনিদ্রিত-নয়নে সে যে দীর্ঘরাত্রি অতিবাহিত করে, সে সংবাদটুকুও অধিকদিন গুপ্ত থাকে নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে সপ্রতিভ ভাবেই চণ্ডী উত্তর দিত—গীতা পড়ি।

কিন্তু গীতা পড়িয়াও চৈতন্য হইল না। উপরের ঘটনার কিছু দিন পরেই মিশনারী বিদ্যালয়ের এক উৎসব-সভায় এমন এক কাণ্ড সে করিয়া বসিল, যাহাতে পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলির মধ্যেও তাহার দুর্ব্বার 'দজ্জালপনা' জাহির হইয়া পড়িল।

বিদ্যালয়ের সভায় বিভিন্ন গ্রামের মহিলাসমাজ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। চণ্ডীও এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। সভা আরম্ভ হইতেই শিক্ষয়িত্রী খৃষ্টকুমারী হিন্দু মহিলাদের কুরুচি ও কুসংস্কার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ উপদেশ দিতে উঠিলেন। ক্রমে তাহার উচ্ছ্বাস—রুচি ও সংস্কার অতিক্রম করিয়া দেবীদের উদ্দেশে ছুটিল এবং প্রথমেই আক্রমণ হইল কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-জাতির আরাধ্যাদেবী কালী ঠাকরুণটির উপর। নগ্নদেহ, কদর্য্যমূর্ত্তি, রুধিরলোলুপা এই অসভ্য দেবীটি সম্বন্ধে তাঁহার বিদ্বেষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সভায় ভক্তিমতী মহিলাদেরও অভাব ছিল না, পল্লী 'পলিটিক্সে'র চর্চ্চায় দিগন্তবিস্তারী উচ্চকণ্ঠিদেরও সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু গৃহপ্রাঙ্গণে বা পল্লীঅঙ্গনে প্রতিবেশিনীদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে ইঁহাদের যত কৃতিত্বই থাক, কোনও বিশিষ্ট স্থানে একান্ত বিরুদ্ধ কথা উঠিলেও, তাঁহাদের দুর্ব্বার বাক্‌শক্তি তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িত। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহারা সকলেই নির্ব্বাক-বিস্ময়ে স্বধর্ম্মের নিন্দা ও আরাধ্যা দেবীর উদ্দেশে ভিন্নধর্ম্মীর অবমাননা নীরবেই পরিপাক করিতেছিলেন। কেহ কেহ এই সুযোগে চণ্ডীর দিকে কটাক্ষ করিয়া

মুখ টিপিয়া হাসিবার প্রলোভনটুকুও যে সম্বরণ করিতে পারেন নাই, এ সংবাদও পরে গুপ্ত ছিল না।

চণ্ডী কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিল না। সভাস্থ সকলকেই চমকিত করিয়া সে উঠিয়া তীক্ষ্মস্বরে কহিল—আমি প্রতিবাদ করছি আপনার বক্তৃতায়—থামুন আপনি।

মুহূর্ত্তে সভা হইল স্তব্ধ। সমগ্র মহিলা ও ছাত্রীদের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি চণ্ডীর দিকে। খৃষ্টকুমারীর পাউডারচর্চ্চিত শুভ্র মুখখানি বিকৃত হইয়া উঠিল। রূঢ়স্বরে প্রশ্ন হইল—তুমি! অসভ্য বালিকা, তুমি আমার 'স্পীচে' বাধা দিতে সাহস কর?

চণ্ডী স্বর দৃঢ় করিয়া কহিল—নিশ্চয়ই! আপনি আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনে যথেষ্ট অপমান করলেন। আপনার উচিত সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এ পর্য্যন্ত এত বড় কথা মিস্ খৃষ্টকুমারীকে কোন বাঙ্গালীর মেয়ে এ ভাবে বলিতে সাহস করে নাই। সমবেত মহিলা ও ছাত্রীদের সমক্ষে এ লাঞ্ছনা পরিপাক করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সভাস্থলে অস্ফুট গুঞ্জন শিক্ষয়িত্রীকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। আত্মমর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি হাতের তর্জ্জনীটি তুলিয়া কহিলেন—এসে দাঁড়াও তুমি আমার সামনে।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে সকল চক্ষুগুলি চমৎকৃত করিয়া চণ্ডী শিক্ষয়িত্রীর টেব্‌ল-খানির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সভাস্থ সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু চণ্ডীর মুখে তাহার একটি রেখাও পড়ে নাই। কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি শিক্ষয়িত্রীর অপ্রসন্ন মুখখানির উপর তুলিয়া সে উত্তরপ্রার্থিনী হইল।

কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ধৈর্য্য হারাইয়া যে উত্তর দিলেন, তাহা তাঁহার উদ্ধত প্রকৃতির উপযুক্ত হইলেও, সভাস্থ সকলেই তাহাতে শিহরিয়া

উঠিলেন। টেব্‌লের উপর ঝুঁকিয়া তিনি চণ্ডীর গণ্ডদেশে সবলে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন—অসভ্যতার এই পুরস্কার!

পরক্ষণেই যে কাণ্ড বাধিল, তাহাতে সভাস্থ সকলেই উঠি-পড়ি অবস্থায় ঘরমুখী হইতে ব্যস্ত হইলেন। প্রহৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডীর একখানি হাত এমন অতর্কিতভাবেই টেব্‌লটির তলায় আটকাইয়া গেল যে, তাহাতে উপরে সাজানো মসীপত্র, ঘড়ি, হাতবাক্স, ফুলদানি ও মোটামোটা বাইবেলগুলির সহিত সেখানি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। মিস্ খৃষ্টকুমারী তখন টেব্‌লখানির উপরেই দেহের সম্পূর্ণ ভারটুকু রক্ষা করিয়াছিলেন, বিপর্য্যস্ত আধার তাঁহাকেও রেহাই দিল না, তিনিও সেই সঙ্গে সশব্দে—পপাত ধরণী তলে! শুধু মুখের আর্ত্তস্বর শোনা গেল—ও গড্!

বিদ্যালয়ের পরিচারিকা নিকটেই ছিল, ছুটিয়া আসিয়া মিস্‌কে টানিয়া তুলিল। সভা তখন বিশৃঙ্খল, সকলেই স্থানত্যাগে ব্যস্ত; তথাপি শেষ দৃশ্যটুকু উপভোগ করিবার আগ্রহ সকলকে পরিত্যাগ করে নাই। শিক্ষয়িত্রী পরিচারিকার সহায়তায় উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার বিচিত্রমূর্ত্তি এই বিক্ষোভের সময়ও সভায় হাস্যরসের উচ্ছ্বাস তুলিল। টেব্‌লে রক্ষিত, প্রকাণ্ড দোয়াতটির সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ-টুকু মিস্ খৃষ্টকুমারীর বিবর্ণ মুখে ও অঙ্গের অমল ধবল পরিচ্ছদে প্রবাহিত হইয়া বর্ণবিভ্রাট ঘটাইয়াছিল!

শিক্ষয়িত্রীর কালিমালিপ্ত মুখের দিকে তাকাইয়া সহজ-স্বরে চণ্ডী কহিল—এ মা-কালীর শাস্তি, গুরুমা! তাঁর মর্ম্ম না জেনে আপনি যেমন মিছে নিন্দা করলেন, তিনিও তেমনই অদৃশ্য হাত দুখানি দিয়ে আপনার মুখখানিতে কালি লেপে দিলেন। এমন কাজ আর কখনও করবেন না।

এই ঘটনা অতিরঞ্জিতভাবেই পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। চণ্ডীই

যে অন্যায় কাজ করিয়াছে, বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে লেখাপড়া-জানা সাহেবসুবোঘেঁষা মাষ্টারণীর সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া এই কেলেঙ্কারী বাধাইয়াছে এবং সে-ই যে টেব্‌লখানি উল্টাইয়া দিয়া দস্যিপনা করিয়াছে—এ বিষয়ে সকলেই একমত। ঐ ঘটনার পর চণ্ডীর পরিণাম সম্বন্ধে চর্চ্চাই পল্লীবাসিনীদের অবসরসময়ের নিয়মিত কার্য্য হইয়া উঠে। কবরেজ-চাটুয্যে কি করিয়া এই মেয়েকে পার করিবে, কোন্ গৃহস্থই বা এই দজ্জাল ধিঙ্গীকে ঘরে তুলিবে, আর যদিও কোনও রকমে পার হইয়া যায়, শ্বশুরবাড়ী গিয়া এই 'বাবা-নাচুনে' মেয়ে কেমন করিয়া ঘরসংসার করিবে—পল্লীর মহিলা-মজলিস যখন চণ্ডীর সম্বন্ধে এই সকল দুশ্চিন্তায় একান্ত ভারাক্রান্ত, সেই সময় সমগ্র পল্লীকে সচকিত করিয়া অপ্রত্যাশিত সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে, বাগুলীর জমিদার হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী চণ্ডীকে দেখিতে আসিতেছেন—পছন্দ হইলে চণ্ডী গাঙ্গুলী-বাড়ীর বড় বধূ হইবে! সুতরাং চণ্ডীর একটা গতি-মুক্তির চিন্তাই যাহাদিগকে এতটা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উর্দ্ধগতির এমন চমকপ্রদ সংবাদটুকুও যে তাহারা প্রীতির সহিত পরিপাক করিতে পারিবে না—আর একটা নূতন রকমের দুর্ভাবনায় তাহারা আকুল হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দুই

যেমন অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব মেয়ে চণ্ডী, তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে আসিলেন যিনি, তাঁহার প্রকৃতিও সেই অনুযায়ী অদম্য ও একান্ত রহস্যময়! কোনও সংবাদ না দিয়া সহসা তিনি পাত্রী দেখিতে উপস্থিত হইলেন গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে! কথাটা অবশ্য গুপ্ত রহিল না, অবিলম্বেই পল্লবিত হইয়া পড়িল। শ্যামাপুর হইতে দশ ক্রোশ দূরে বাগুলীর জমিদার বাবুদের বাড়ী। হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর নাম গ্রামবাসীদের জপমালা হইলেও, চর্ম্মচক্ষুতে এ গ্রামের কেহই তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত দেখে নাই। এই বিখ্যাত নামের মালিকটিকে দেখিবার জন্য কবিরাজের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় পর্য্যন্ত জনসমাগম হইয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় বাহিরের বৈঠকখানায় রাজতুল্য অতিথিকে অতি সঙ্কোচের সহিত বসাইয়া কর জোড়ে আদেশপ্রার্থীর মত হুজুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

হুজুর হুকুম করিলেন—আপনার একটি বিবাহযোগ্যা ডাগর মেয়ে আছে শুনেছি। আমি তাকে দেখব ব'লে এসেছি। যদি পছন্দ হয়, আমার কোনও ছেলের জন্য গ্রহণ করব তাকে।

হুজুরের কথায় কবিরাজ মহাশয়ের বাক্‌শক্তি যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হুজুরের দিকে অপরাধীর মত তাকাইয়া রহিলেন।

হুজুরের মুখের হাসিটুকু সুপুষ্ট পরিপক্ক গোঁফ যোড়াটির ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; কহিলেন—বুঝতে পেরেছি, আপনি কথাটা প্রত্যয় করতে পারছেন না। কিন্তু এ কথাও ভুলবেন না, চাটুয্যেমশাই—

হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী বাজে কথা কইবার মানুষ নয়, আর সে অবসরও তার নেই। আমি যে প্রকৃতির মেয়ে খুঁজছি, আপনার মেয়ের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমি যতটুকু খবর পেয়েছি, তাতে—আপনার মেয়ে আমার মনে স্থান পেয়েছে ; এখন চোখে যদি লাগে—তা হ'লে তিনি আমার ঘরেও স্থান পাবেন।

কি সর্ব্বনাশ! হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর কানেও তাঁহার দুর্জ্জয় মেয়ের সকল কথাই উঠিয়াছে—সে সমস্ত শুনিয়াও তিনি তাহাকে তাঁহার বাড়ী বহিয়া দেখিতে আসিয়াছেন! বিস্ময়ের স্বরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখ দিয়া মৃদু স্বর বাহির হইল—এই দীন দরিদ্রের মেয়ের কথা হুজুরের—

হুজুরের মুখের হাসিটুকু এবার আরও একটু গাঢ় হইয়া ফুটিল রসিকতার ভঙ্গিতে। হাস্যমুখে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়াই যেন কহিলেন—সারা পরগণার খবর হুজুরের মনের কেতাবে যে লেখা আছে, তা বুঝি জানেন না? মেয়েদের খবরও বাদ যায় না, কেন না, নিজের ঘরে যখন উপযুক্ত ছেলে, পরের ঘরের একটি যোগ্য মেয়েরও ত দরকার। তবে আপনার মেয়েটি পঞ্জাবে থাকত বলে, খবরটি পেতে বিলম্ব হয়েছে। আর খবরটি পেয়েছি—সত্য কথা বলতে কি—তার বিরুদ্ধে নালিশের সূত্রে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! নালিশ—তবে কি চণ্ডীর সম্বন্ধে কোনও নালিশ হুজুরের দরবারে উঠিয়াছে, এবং সেই সূত্রেই—

কিন্তু হুজুরই সমস্যা ভঞ্জন করিলেন। কহিলেন—আপনারই কোনও হিতৈষী প্রতিবেশী আপনার মেয়ের বিরুদ্ধে এক আর্জ্জী পাঠান আমার কাছে। তাতে তাঁর সম্বন্ধে দোষারোপ ক'রে যে সব কথা লেখা হয়েছে, শুনে আমি ত একেবারে অবাক! পাড়াগাঁয়ে যে এমন মেয়ে থাকা সম্ভব, এ আমি ধারণা করতেই পারি নি। যিনি আর্জ্জী পাঠিয়েছিলেন, নামটুকু দিতে অবশ্য সাহস পান নি। কাজেই তাঁকে না পেয়ে, অগত্যা

এই মহালের নায়েবকে লিখি, আপনার মেয়ের সম্বন্ধে সঠিক খবর সব জেনে আমাকে দাখিল করতে। তারপর আপনাকে আমি এইটুকু বলতে পারি—নালিশ গেছে উল্‌টে। আপনার মেয়ের দোষগুলো আমি গুণ ব'লেই ধ'রে নিয়েছি, তাই না এসেছি তাঁকে দেখতে। যান, আপনি আর বিলম্ব করবেন না; এই ঘরেই মাকে নিয়ে আসুন। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা আমার সম্ভব হবে না।

অল্পসময়ের মধ্যেই যতটুকু সম্ভব, সেইভাবে চণ্ডীকে সাজাইয়া বাহিরের ঘরে আনাইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। বাহিরের ছোট বৈঠকখানা-ঘরটির পার্শ্বেই একটি বড় প্রাঙ্গণ, তার পরেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্দর-মহল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভিতরে তাড়া দিয়াই বাহিরে আসিয়া রাজ-অতিথির সম্বর্দ্ধনায় তৎপর—বাড়ীর পরিচারিকার সহিত সুসজ্জিতা চণ্ডী সবেমাত্র প্রাঙ্গণে পা দিয়াছে, এমন সময় যেন দৈবনির্দ্দেশেই এক বিভ্রাট দেখা দিল!

প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সদ্যঃপ্রসূতা এক স্থূলকায় গাভী বাঁধা ছিল। বাছুরটি কাছেই খেলা করিতেছিল, ছোট একটি ছেলে সেই গোবৎসটির কানদুটি ধরিয়া টানাটানি করিতেই বৎসমাতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া দুইটি তীক্ষ্ণধার শৃঙ্গ মেলিয়া সে ছুটিল বালকটির দিকে। বৈঠকখানায় সমবেত সকলেই সে দৃশ্যে যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—চণ্ডী তখন ক্ষিপ্রহস্তে আঁচলটি কোমরে জড়াইয়া আক্রান্ত বালকটির সম্মুখে গিয়াই দুই হাতে গাভীর দুইটী শৃঙ্গ ধরিয়া প্রবল ঝাঁকুনি দিল। হৃষ্টপুষ্ট অত বড় তেজস্বিনী গাভীটির সাধ্য হইল না আর একটি পদ অগ্রসর হইতে। ইতিমধ্যে গাভীর পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যটি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে যথাস্থানে লইয়া গেল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, চণ্ডীর প্রবল ঝাঁকুনীতে তাহার তেজোবহ্নি নির্ব্বাপিত ও আক্রমণস্পৃহা প্রশমিত হইয়াছে।

বৈঠকখানায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে পিতার পদধূলি লইয়া বেশ সপ্রতিভ-ভাবেই চণ্ডী পরগণার মালিকের উদ্দেশে নত হইয়া প্রণাম জানাইল। হরিনারায়ণবাবু এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে চণ্ডীর দিকে তাকাইয়াছিলেন। চণ্ডী তাঁহার পদস্পর্শ করিতেই দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া তিনি স্নেহভরে তাহার হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিলেন—হাতে লাগেনি ত মা ?

চণ্ডী মুখখানি নীচু করিয়া মৃদুহাস্যে কহিল—না।

সকলেই স্তব্ধ, প্রত্যেকেরই নির্ব্বাক দৃষ্টি হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী ও চণ্ডীর দিকে। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া চণ্ডীর দুই করতলের রেখাগুলি পরীক্ষার পর হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—তুমি জিতে গেছ মা, চণ্ডী হয়েই তুমি আমার বাড়ীতে যাবে মা।

পরক্ষণেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন—আপনার মেয়েকে দেখতে এসেছিলুম সংশয়ের মধ্যেই। কানের শোনা, আর চোখের দেখা, এ দুটোয় তফাৎ অনেক। কিন্তু আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিয়েছেন মা চণ্ডী—ঐ উঠোনটিতে প্রথম দেখা দিয়ে। মা আমার নিজের নামকেও সার্থক করেছেন। ঐখানেই আমার দেখাও শেষ হয়েছে। তা হ'লে আমার আর কোনও কথা নেই, এখন আপনার যদি কোনও কথা থাকে, বলতে পারেন।

হুজুরের সামনে আমার আবার কি কথা থাকবে? মেয়েকে আমি এনে হুজুরের সামনে রেখেছি। মালিক সব বিষয়েই যে হুজুর!

হুজুরের ছেলেটিকেও যাচাই করা দরকার আপনার পক্ষে, আমি যে ভাবে আপনার মেয়েকে যাচাই করেছি।

তার কোনও প্রয়োজন নেই হুজুর! আমার মেয়েকে যখন দয়া ক'রে দেখতে এসেছেন, পছন্দ করেছেন, তখন আমি আর কি বলব!

হুজুরের মুখ হইতে তখন হুকুম হইল—তা হ'লে পাঁজী আনুন, দিনস্থির করা যাক।

পাঁজী বাহিরের ঘরেই ছিল, হুজুরের হাতে আসিতে বিলম্ব হইল না। সকলের চক্ষু তখন হুজুরের পাঁজী দেখার ভঙ্গিটির দিকে ; কোন্ দিন স্থির করেন, তাহা জানিতে প্রত্যেকেরই অসীম আগ্রহ।

মিনিট কয়েক পরেই হর্ষোৎফুল্ল মুখে পরগণার মালিক রায় প্রকাশ করিলেন—২৭শে ফাল্গুন বুধবার, খাসা দিন ; এই দিনটিই তা হ'লে স্থির রইল বিবাহের—আপনি প্রস্তুত হোন বেয়াই মশাই !

বেয়াই মশাই ! এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধন অত্যন্ত শ্রবণসুখকর হইল বটে, কিন্তু বিবাহের তারিখটি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মনটির উপর চিন্তার খোঁচা দিল ; এত তাড়াতাড়ি কন্যার বিবাহ কি সম্ভবপর ? তখনই মুখখানি ম্লান করিয়া, হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে আবেদন জানাইলেন—হুজুরের কথার উপর কথা বলাই ধৃষ্টতা, তবুও অবস্থা অনুসারে নিবেদন করতে হচ্ছে হুজুর—আজ মাসের বারো তারিখ, মধ্যে মাত্র পনেরোটি দিন—

হুজুর নিবেদনটি সমস্ত না শুনিয়াই সহসা বাধা দিয়া কহিলেন—তাই কি কম, চাটুয্যেমশাই ? প্রয়োজন হলে রাতারাতি আমরা পুকুর কাটাই, আবার তা ভরাট ক'রে বাগান বসাই—এ সব ত শুনেছেন। কথা যখন হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, এর আর নড়চড় হবে না ; ঐ দিনই স্থির !

কেহই আর এ কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইলেন না। অতঃপর কথার মালিক কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন—তোমাকে শুধু দেখতেই এসেছিলুম মা। আজ শুধু কথা দিয়েই আশীর্ব্বাদ ক'রে চলেছি। তবুও তোমাকে না ব'লে পারছি না—আমার এই ইচ্ছা, তুমি নিজেই আমার কাছে পাকা দেখার যৌতুকটুকু চাও, যা তোমার ইচ্ছা

হয় মা, যা তোমার মনে লাগে—অবশ্য আমার যা সাধ্যের মধ্যে—তুমি মুখ ফুটে চাইলে, আমি ভারি খুসী হব মা!

সকলের মনে আবার জাগিল দারুণ বিস্ময়—চণ্ডী কি চাহিয়া বসে! তাহার প্রার্থনা শুনিবার জন্য বহু কর্ণই উৎকীর্ণ হইয়া উঠিল।

দিব্য সহজ সুরেই চণ্ডী সকলকে চমৎকৃত করিয়া তাহার প্রার্থনা নিবেদন করিল—তাহ'লে আপনি এই গ্রামখানির মধ্যে মেয়েদের এমন একটি স্কুল তৈরী ক'রে দিন, যার কোনও খুঁত না থাকে, আর বিয়ের পরদিন যাতে আমি আপনার তৈরী সেই নোতুন স্কুলটির দরজা খুলে দিয়ে, আপনার বাড়ীর দরজায় মাথা গলাতে পারি। এ ছাড়া আর কোনও প্রার্থনাই আমার নেই।

সকলেই স্তব্ধ, স্তম্ভিত, চমৎকৃত! হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী এতক্ষণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে চণ্ডীর দৃপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়াছিলেন, পরক্ষণেই তিনি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—চমৎকার! অনেক প্রার্থনা এ পর্যন্ত শুনেছি, কিন্তু চাবুক উঁচিয়ে দেবার জিনিষটি এমন তেজের সঙ্গে আর কেউ কোনও দিন শোনাতে পারে নি। গাঙ্গুলী-বংশের আদর্শ বধূর মতই তুমি তোমার ভাবী শ্বশুরের দেবার দম্ভ ভেঙ্গে দিয়েছ। তোমার চাওয়া আর আমার দেওয়া—এ দুটোর সার্থকতা কার—সেইটিই এখন সমস্যা।

তিন

পাকা দেখার পর বাড়ীর ভিতর আসিবামাত্রই বাড়ীর পরিজন ও পাড়ার আর দশ জন চণ্ডীকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রত্যেকেরই মুখে বিস্ময়ের রেখা, চক্ষুগুলিও সেই অনুসারে বিস্ফারিত। চণ্ডী যেন মহিষ-মর্দ্দিনী চণ্ডীর মতই অসাধ্য-সাধন করিয়া—বিজয়-টীকা পরিয়া নূতন মূর্ত্তিতে বাড়ীর ভিতর পা দিয়াছে। সবারই মুখে একই প্রশ্ন—অত বড় লোকটার মুখের ওপর অত কথা কি ক'রে কইলি রে চণ্ডী!

যাহাকে লইয়া এত বিস্ময়, তাহার আকৃতি ও আচরণে কিন্তু কোনও পরিবর্ত্তনের চিহ্নও দেখা গেল না। যেমন সহজ স্বচ্ছন্দভাবে সে বাইরের বৈঠকখানায় গিয়াছিল, সেই ভাবেই সে বাড়ীর ভিতর ফিরিয়াছিল। সকলের মুখে বিস্ময়ের ভাব ও কথায় তাহার আভাস পাইয়া সে বুঝিল, বাহিরের ব্যাপারে ইহারা সকলেই একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিমুখে চণ্ডী উত্তর দিল—কথা এমন বেশী কি বলেছি, হাঁ—তবে জোঁকের মুখে নুন দিয়েছি, এ কথা বলতে পার।

সকলেই অবাক্ হইয়া অপরূপ ভঙ্গীতে চণ্ডীর দিকে চাহিল। পাড়ার মিত্র-পরিবারের সহিত চণ্ডীদের খুব ঘনিষ্ঠতা; মিত্র-গৃহিণীকে চণ্ডীর মা ঠাকুরঝি বলিয়া ডাকিতেন; সেই সূত্রে চণ্ডী বলিত, পিসী! তিনিই প্রথমে বিস্ময়টুকু ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—শোনো মেয়ের কথা!

মেয়ের মুখের হাসিটুকু মুখেই মিলাইয়া গেল, অভিমানের স্বরে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—কেন পিসী, কি অন্যায় আমি করেছি বল! বাবার মুখের উপর বললেন, কথা যখন ব'লে ফেলেছি, নড়-চড় হবার আর জো নেই! রাতারাতি যাঁরা পুকুর কাটান, বাগান বসান,—সেখানে তাঁরা

যেন দয়া করেই বিয়ের সময় দিলেন মাঝে দুটো হপ্তা! আমিও ত বাবার মেয়ে—চট্ ক'রে দিলুম অমনি পাল্টা জবাব।

পিসী কহিলেন—জবাব বলে জবাব, ঘরশুদ্ধ লোক মেয়ের কথা শুনে একেবারে অবাক্; সবাই যেন শুনে 'থ' হয়ে গেল! মিন্‌ষে মুখে যাই বলুক, মনে মনে কি ভাবলে কে জানে!

চণ্ডী কহিল—যারা কথার মানুষ, তারা মনে কিছু চেপে রাখে না। উনি অবাক্‌ও হন নি, আর, আমিও এমন কিছু অন্যায় আব্দার করি নি, যাতে তিনি মনে মনেও ভাবতে পারেন—মেয়েটা কি বেহায়া।

ঐ আব্দারটি ক'রে তুমিই বা এমন কি লাভ করলে, বাছা? শুধু ধান-দূর্ব্বো দিয়েই ত বুড়ো আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল, এক টুকরো সোনাও ঠেকালে না? গেরামে ইস্কুল হলেই তোমার সব আকিঞ্চ্যে মিটবে যেন!

চণ্ডী এ কথার কোন উত্তর দিল না, শুধু হাসিল; কিন্তু সে হাসির মধ্যে যে কথা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা ব্যক্ত করিলেন তাহার মা। তিনিও হাসিতে হাসিতে কহিলেন—তোমাদের এই মেয়েটি সোনাদানায় ভোলবার পাত্রই বটে, মিত্তির ঠাকুরঝি! এখানে এসে অবধি ওর যত কিছু রাগ ঐ মিশনারী ইস্কুলটির ওপর; ওখানকার গুরুমাকে সে-বারে কি নাকালটাই করেছিল, সে ত তোমরা শুনেছ! পাড়ার মেয়েরা ইস্কুলে গিয়ে নিজেদের ঠাকুর-দেবতার নাম করতে পারবে না, যীশুখৃষ্টের কথা তাদের পড়তেই হবে—এই নিয়েই ওর যত ভাবনা, হয়ত ঠাকুরের কাছে ধর্ণা দিতেও কসুর করে নি—তাই তিনিই ওর মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন! এই দুর্জ্জয় মেয়েকে নিয়ে আমাদেরও কি কম ভাবনা ছিল ঠাকুরঝি? মেয়ে আমার যে জেদ্ ধরবেন, কার বাপের সাধ্যি তা থেকে ফেরাতে পারে! কোথায় কার ঘরে পড়বেন, ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছিলুম, এখন তোমাদের কল্যাণে মা সর্ব্বমঙ্গলাই মুখ রাখলেন।

মিত্রবাড়ীর গৃহিণী মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—মেয়ে তোমার যতই একগুঁয়ে আর মুখ তার যতই আল্‌গা হোক বৌদি, ও যে রাজরাণীর বরাত নিয়ে এসেছে, এ কথা গেরামশুদ্ধ সকলকে মানতেই হবে, নইলে বিশখানা তালুকের মালিক, এ অঞ্চলের রাজা—বাশুলীর বাবুদের বাড়ীতে তোমার মেয়ে বউ হয়ে ঢুকতে চলেছে !

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই পাড়ায় একটা সাড়া পাইয়া গ্রামের প্রায় সকলেই ঘরের বাহিরে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, গ্রামের বারোয়ারীতলায় যেন কিসের মেলা বসিয়া গিয়াছে। গাড়ী, গরু, মুটে, মজুর, কত রকমের মানুষ যেন গিস্ গিস্ করিতেছে। একদিকে ইমারতের ভিত কাটা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একজন এঞ্জিনিয়ারের নির্দ্দেশমত রাজমিস্ত্রীরা কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং অনেকগুলি মজুর, নিঃশব্দে শৃঙ্খলার সহিত ব্যস্তভাবে যোগাড় দিতেছে। বারোয়ারী-তলার অত বড় মাঠখানি রাশি রাশি ইট, সুরকী, চূণ, বালি প্রভৃতি ইমারত তৈয়ারীর মাল-মসলায় ভরিয়া গিয়াছে। লগুড়ধারী একপাল দরোয়ান লইয়া কয়েক-জন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি খবরদারি করিতেছেন।

চণ্ডীর প্রার্থনা ও হরিনারায়ণবাবুর প্রতিশ্রুতির কথা পাড়াময় পূর্ব্ব-দিনই রটনা হইয়াছিল, সুতরাং কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ভাবী পুত্রবধূর অসম্ভব আবদারটুকু যথাযথভাবে সম্ভব করিতেই বাশুলীর অদ্ভুত-কর্ম্মা রাজাবাবুর এই বিপুল আয়োজন। লোকের মুখে তখন আর অন্য কথা নাই, প্রত্যেক বাড়ীতেই চলিতে থাকে চণ্ডীকে লইয়া আলোচনা ও সেই সূত্রে বাশুলীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজাবাবুদের অতীত অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্যকলাপের কত রোমাঞ্চকর কথা ও কাহিনী।

সন্ধ্যা তাহার ধূসর অঞ্চলটি গুটাইয়া সবেমাত্র দিনান্তের কোলে বিলীন হইয়াছে, শঙ্খঘণ্টাকাঁসরের সুগম্ভীর রেশটুকু তখনও স্নিগ্ধ বায়ুর সহিত মিশিয়া পল্লী-সুষমার বন্দনায় উচ্ছ্বসিত, প্রদীপের শান্ত শিখা ধীরে

ধীরে গৃহে অন্ধকারকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে—ঠিক এমনই সময় চণ্ডীদের বাড়ীর দেউড়িতে একখানি জুড়ি-ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। উর্দ্দীপরা পাঞ্জাবী সহিস তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই প্রথমে নামিলেন চণ্ডীর ভাবী শ্বশুর হরিনারায়ণবাবু স্বয়ং; তাহার পরেই চামড়ার একটি ব্যাগ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলেন তাঁহার দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী। তিনিও হরিনারায়ণবাবুর মত দীর্ঘাকৃতি ও বর্ষীয়ান্।

করালীবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া পুরোহিত ও অন্তরঙ্গদের সহিত বিবাহ সম্পর্কেই আলোচনা করিতেছিলেন। দরজার সম্মুখে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। করালীবাবু ভৃত্যদিগকে উদ্দেশ করিয়া হাঁকিলেন—কে এল রে?

ভৃত্যগণের কেহই সে সময় বাহিরে ছিল না। করালীবাবুর কথার উত্তর দিতে দিতে ভাবী বৈবাহিক বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করিলেন—আমরাই এসেছি ব্যেইমশাই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই।

ফরাস হইতে সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ সময় অকস্মাৎ এভাবে হরিনারায়ণবাবুর উপস্থিতি তাঁহারা কেহই কল্পনাও করেন নাই—দুর্জ্জয় বিস্ময় দমন করিয়া করালীবাবু করযোড়ে কহিলেন—আসতে আজ্ঞা হোক, আসতে আজ্ঞা হোক, ওরে—কে আছিস, শীগ্‌গীর পা ধোবার জল নিয়ে আয়—

হরিনারায়ণবাবু বাধা দিয়া কহিলেন—ব্যস্ত হবেন না, ব্যেইমশাই, ও সব কিছুই দরকার হবে না, জানেন ত মা-চণ্ডী তাঁর মণ্ডপ তৈরীর হুকুম দিয়ে বুড়ো ছেলেটিকে কেমন জব্দ করেছেন! এসেছিলুম তারই তদারক করতে, ভাবলুম, এই সুযোগে মাকেও আর একবার দেখে যাই।

পুরোহিত মহাশয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন—দেখবেন বই কি, অবশ্য দেখবেন; কিন্তু পায়ের ধূলো যখন পড়েছে, তখন ত আসন গ্রহণ করতেই হবে, তার পর একটু মিষ্টিমুখ, জলযোগ—

হরিনারায়ণবাবু সহাস্যে কহিলেন—ও সব গোলযোগ আর বাধাবেন না, ভট্চাযমশাই—তার অবসরও নেই। আমরা আমাদের মাকে ধূলোপায়েই দেখব ব'লে এসেছি, মা-চণ্ডী এখন কি করছেন, বেহাই-মশাই ?

করালীবাবু কহিলেন—এ সময় নিত্যই সে ঠাকুরঘরে থাকে, মায়ের আরতির গোছগাছ ক'রে দিয়ে স্তব-স্তোত্র পড়ে।

উল্লাসের স্বরে হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—বাঃ! "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" মা-চণ্ডী তা হ'লে এখন যথাস্থানেই, ভালই হয়েছে। সেইখানেই আমাদের দুজনকে নিয়ে চলুন বেহাইমশাই; মায়ের এক রূপ কাল দেখেছি, আজ অন্য রূপ দেখে ধন্য হই। আপত্তি নেই ত কিছু ?

করালীবাবু মিনতির স্বরে কহিলেন—অমন কথা বলবেন না হুজুর—আমাদের পক্ষে এ ত মস্ত সৌভাগের কথা; কিন্তু সত্যই বসবেন না ?

হরিনারায়ণবাবুর সেই কথা—কথার ত নড়চড় হবার উপায় নেই বেহাইমশাই! তবে একটা কথা আছে, হঠাৎ আমরা পূজোর ঘরে গিয়ে মাকে একবার অবাক্ ক'রে দেব, তাঁকে কিন্তু আগে খবর দেওয়া হবে না যে আমরা এসেছি! আর এই দুই বুড়ো যদি আপনার পেছু পেছু বাড়ীর ভেতর ঢোকে তাতে অপরাধও বোধ হয় কেউ নেবেন না, কেন না—আমরা চলেছি ঠাকুরঘরে ধূলো পায়ে আমাদের চণ্ডী-মাকে দেখতে।

এ অঞ্চলের যিনি মুকুটমণি, ধনে, মানে, বংশগরিমায়, শৌর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে—সকল বিষয়েই সকলের আগে যাঁহার নাম, সেই অসাধারণ মানুষটির নানাবিধ সদ্‌গুণের সহিত তাঁহার অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়ালের কাহিনীও গল্পের মত সাধারণের সুপরিচিত ছিল। তাঁহার মুখের কথা কখনও নড়চড় হয় না, মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করেন, কিম্বা যাহা সম্পন্ন

করিবেন বলিয়া কাহাকেও কথা দেন, তাহা শেষ না করিয়া কখনই নিরস্ত হন না। সুতরাং এই অদ্ভুত প্রকৃতির অতিমানুষটীর মনের খেয়ালটুকু মিটাইবার জন্য করালীবাবু যে ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

বাহিরের প্রাঙ্গণ পার হইয়া ভিতরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতেই বামদিকে দক্ষিণমুখী পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা একখানি টানা দালান, তাহার কোলেই খোলা দরদালান। এইখানেই এই পরিবারের যাবতীয় পূজাপাঠ ও ক্রিয়াকর্ম্মাদি সম্পন্ন হয়। পূজার দালানের মধ্যস্থলেই বেদীর উপর কুলদেবীর ঘট প্রতিষ্ঠিত, পার্শ্বেই পিতলের সিংহাসনে শালগ্রামশিলা, দেওয়ালে নানা দেবদেবীর সিন্দূর ও চন্দনচর্চ্চিত চিত্র; দেবীর ঘটের পশ্চাতেই দক্ষিণা-কালিকার সুবৃহৎ আলেখ্য—পুরোভাগে গঙ্গোদকপূর্ণ তাম্রময় কোশা, পুষ্পপাত্র, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি সজ্জিত; পিতলের পীলসুজটির উপর পরিচ্ছন্ন প্রদীপ, তাহার নির্ম্মল আলোকধারায় এই মনোরম দেবস্থানটির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য যেন নিখুঁতভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধূপ ও ধূনার সুগন্ধে সমগ্র বাড়ীখানিই যেন আনন্দিত; আর গালিচার আসনখানির উপর বসিয়া, ভাবার্ত্ত দুইটি চক্ষু দেবীর আলেখ্যটির উপর নিবদ্ধ করিয়া, মধুর স্বরে বিশুদ্ধভাবে চণ্ডী স্তোত্র পাঠ করিতেছে—

জয়া মমাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী
শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা।
চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী।
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী॥

এমনই তন্ময়ভাবে চণ্ডী স্তব পাঠ করিতেছিল যে, তাহারই ঠিক

পশ্চাতে কয়েক জনের উপস্থিতি সে মোটেই লক্ষ্য করে নাই। পাঠের পর হেঁট হইয়া দেবীর উদ্দেশে মাথা নত করিতেই হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—এই জন্যই আমি ঠাকুরঘরে হঠাৎ আসতে চেয়েছিলুম বেহাই-মশাই! তাতেই না মায়ের এই নূতন রূপটি দেখ্‌তে পেলুম!

মুখ তুলিয়াই চণ্ডী সচকিতে উঠিয়া পিতা ও পিতৃবয়সী দুই বর্ষীয়ান পুরুষের পদধূলি মাথায় লইল। মুখে তাহার কথা নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যপুষ্ট সুন্দর মুখখানির উপর এমন একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহার বুঝি তুলনা নাই।

হরিনারায়ণবাবু গাঢ়স্বরে কহিলেন—এখন বুঝতে পারছি বেহাই-মশাই, মা আমার এই বয়সে কোথা থেকে পেয়েছেন এত তেজ! সে দিন মুগ্ধ হয়েছিলুম বাইরের রূপ দেখে, আজ আমার চক্ষু মন সব ভ'রে গেছে ভেতরের একটা রূপের দিব্য জ্যোতিতে! বাপুলী যে চুপ করেই রয়েছো, কিছু বলছো না ত!

দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী এতক্ষণ মুগ্ধের মতই চণ্ডীর দিকে চাহিয়া-ছিলেন, কর্তার কথায় যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; তিনি বেশ সহজভাবেই কহিলেন—মাকে দেখে গিয়ে আপনি আমাকে যা বলেছিলেন, কোনও মানুষের সম্বন্ধে অত উঁচু রকমের প্রশংসা আপনার মুখে এ পর্য্যন্ত কখনও শুনি নি। লোকের চেহারা দেখে তার প্রকৃতিকেও ধরতে পারি ব'লে আমার যে একটা বদনাম আছে, তার উপরে নির্ভর করেই এতক্ষণ আমাদের এই নোতুন মা-টিকে চেনবার চেষ্টা করছিলুম।

চিনতে পেরেছো, না এখনও যাচাই চলবে তোমার?

যাচাই আমার হয়ে গিয়েছে।

কথা না শুনেই?

পাকা সোনা চোখে পড়লেই চেনা যায়, কষ্টিপাথরে কষবার দরকার হয় না।

উচ্চহাস্যে পূজার দালানটি মুখরিত করিয়া হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—তা হ'লে আমি ঠকি নি বল !

বাগুলী মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—এ পর্য্যন্ত বাগুলীর হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীকে কেউ কোনও দিন ঠকাতে পারে নি।

মুহূর্ত্তমধ্যে হরিনারায়ণবাবুর সুন্দর মুখখানি যেন কালো হইয়া গেল। চক্ষু বক্র করিয়া তীক্ষ্নস্বরে তিনি কহিলেন—এ যে তোমার খোসামোদের কথা হল বাগুলী, ঠকি নি আমি—সত্যি বলছ ! বরাবর জিতে এসে, তার পর হঠাৎ কি ভাবে অতি আপনার লোকের কাছে ঠকে গিয়ে মুসড়ে পড়েছি—মুখের কথা রাখতে ছুটে এসেছি—তা কি ভুলে গেলে বাগুলী ?

দেওয়ান কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, তাতে আপনি ঠকেন নি—এ নিয়ে কোন দিন আপনার সঙ্গে তর্ক করি নি, করবও না। তবে, মহামায়া আপনার মুখরক্ষা যে করবেন—এই সংযোগই তার সূচনা।

এই বৃদ্ধের কথা চণ্ডী তাহার পিতার সহিত অবাক্ হইয়াই শুনিতেছিল, রহস্যময় কথা, বুঝিবার উপায় নাই।

হরিনারায়ণবাবু আবার উচ্চ হাস্যধ্বনিতে সকলকে চমকিত করিয়া কহিলেন—কথার পিঠে একটা পারিবারিক কথা এসে গিয়েছিল, দেওয়ানজীই যখন তার নিষ্পত্তি ক'রে দিলে, আর কথা নেই। এবার আমাদের কাজের কথাই হোক্। হাঁ, কাল তোমাকে অমনি অমনিই দেখে গিয়েছি মা-চণ্ডী, তুমি হয় ত মনে মনে দুঃখ করেছ—বুড়ো ভারি কৃপণ, খালি হাতে পাত্রীকে পাকা দেখে গেল ! নয় কি মা ?

চণ্ডী মুখখানি তুলিয়া অকুণ্ঠিতভাবেই কহিল—তা কেন, আমি যে ঠিক এর উল্‌টো ভেবেছি বাবা !

বাবা ! এ সম্বোধনে হরিনারায়ণবাবুর স্বাভাবিক দৃঢ় হৃদয়টি সহসা

যেন ফুলিয়া উঠিল, সে ভাব দমন করিয়া তিনি কহিলেন—কি ভেবেছো মা ?

গাঢ়স্বরে চণ্ডী উত্তর দিল—যে রকম ঘটা ক'রে আপনি পাকা দেখে-ছেন আমাকে, তেমন ঘটা এ অঞ্চলে কেন, সারা বাঙ্গালাদেশে কেউ আর কখনও করে নি।

হরিনারায়ণবাবু বাপুলীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—শুনছ বাপুলী, আমার মায়ের কথা !

বাপুলী কহিলেন—এই জন্যেই ত বলেছিলুম আগেই, খাঁটি সোনা চোখে পড়লেই চেনা যায়।

হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—তোমার ও-কথার এই উত্তর হচ্ছে মা, বাঙ্গালা দেশে কর্ম্মীর অভাব নেই, তবে কি জান মা, কর্ম্মের সন্ধান দেবার মত লোকেরই অভাব। দিতে পারে অনেকে, কিন্তু তার দেওয়াটাকে সার্থক করবার মত বস্তুটিও ত দেখিয়ে দেওয়া চাই। কাল আমি যখন কল্পতরু হয়েছিলুম, কোনও সাধারণ মেয়ে হলে কি চাইত বলো ত! হয় ত মুখ দিয়ে চাইবার কথাই ফুটত না, না হয় লজ্জায় জড়সড় হয়ে বলত, আপনি যা দেবেন ; সাহস একটু যার বেশী থাকত, খপ্ করেই সে চুড়িসুটের অষ্ট অলঙ্কার চেয়ে নিত, কিম্বা এই ধরণের অন্য কিছু। কিন্তু তুমি চাইলে এমন জিনিষ, বাঙ্গালার কোনো মেয়ে কোন দিন যা চায় নি—চাইবার কল্পনাও তারা কখনো করে নি। একেই বলে মা কর্ম্মের সন্ধান দেওয়া, তাকে জাগিয়ে তোলা, আমার দেওয়াকে সার্থক করা। তুমি তা করেছ মা। আর, এটা ঠিক যে, তুমি যা নিয়েছ তার চেয়ে বরং বেশী দিয়েছ। আমার বিচারে তুমি করেছ তোমার জন্মভূমির জন্য—তোমার দেশের মেয়েদের জন্য একটা উঁচু রকমের ত্যাগ।

চণ্ডী মুখখানি নীচু করিয়া কহিল—আমাকে আপনি লজ্জা দিচ্ছেন

বাবা, শুধু শুধু বাড়িয়ে ; আপনি নিজে কি কীর্ত্তি এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করলেন—

বাধা দিয়া হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—এ কীর্ত্তি তোমার মা, তোমার। হাঁ, এবার আসল কাজটাই শেষ করি। বাপুলী, ব্যাগটি এবার খোল ত—

বাপুলী মহাশয় তাঁহার হাতের লম্বা ব্যাগটি খুলিতেই তাহার ভিতরের রত্নখচিত স্বর্ণময় দ্রব্যগুলির দ্যুতি সকলের চক্ষুকে আকৃষ্ট করিয়া তুলিল।

হরিনারায়ণবাবু ব্যাগটির ভিতর হাতটি ঢুকাইয়াই হাসিয়া কহিলেন —তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ মা, তোমার এই নতুন বুড়ো ছেলেটির কাণ্ডকারখানা সবই বেয়াড়া রকমের! কাজেই খেয়ালী ছেলেটি যদি তার নতুন মা'টিকে নিজের ইচ্ছামত সাজায়, তাতে কিন্তু আপত্তি তুলতে পারবে না—তা আমি ব'লে রাখছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগের ভিতর হইতে হাতখানি বাহির করিতেই দেখা গেল, অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত দুইগাছি স্বর্ণময় অতিকায় কঙ্কণ ; নির্ম্মাণপারিপাট্যে সে দুটি যেমন চমৎকার, আয়তনে ও পরিমাণে তেমনই গুরুভার। চণ্ডীর হাত দুইখানি তুলিয়া কঙ্কণ দুইগাছি সযত্নে পরাইয়া দিয়া হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—এই হচ্ছে মা আমাদের মা-লক্ষ্মীদের সত্যিকারের ভূষণ, হাতের এই কঙ্কণ এককালে ছিল তাদের অলঙ্কার আর হাতিয়ার—একাধারে দুইই, তাঁরা এই কঙ্কণ পরেই আয়তী বজায় রাখ্‌তেন, আবার দরকার পড়লে—এই দিয়ে আত্মরক্ষা করতেন। এর একটি ঘা তাগ্‌ ক'রে যদি রগ ঘেঁষে মাথায় লাগানো যায়, অতি বড় পাকা মাথাও তখনই ভেঙ্গে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু মা, এ কালের মা-লক্ষ্মীরা এমন গর্ব্বের গয়না ছেড়ে চুড়ি ব্রেসলেট্ সার করেছে, যেমন সৌখীন বাবুরা বাঁশের পাকা লাঠির সঙ্গে স্বাস্থ্যটুকুও হারিয়ে সখের খাতিরে ছড়ি ধরেছেন। এখন প্রশ্ন এই আমার, তোমার এ অলঙ্কার অপছন্দ নয় মা ?

চণ্ডী উত্তর দিল—আমার দাদামশাই বলতেন, বিয়ের সময় তোকে আমি এমন এক জোড়া কঙ্কণ গড়িয়ে দেব চণ্ডী, যা দেখে সবাই অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকবে। তিনি আজ স্বর্গে, কিন্তু সেই মহাপুরুষের মনের সাধ আপনিই পূর্ণ করলেন বাবা! এখন থেকে সকাল সন্ধ্যা দুটি বেলা আপনার দেওয়া এ দুটি জিনিস ভক্তির সঙ্গে মাথায় ঠেকিয়ে এই দিনটির কথা আমি স্মরণ করব।

হরিনারায়ণবাবু উচ্ছ্বসিতস্বরে কহিলেন—শুনলে ত বাপুলী। তুমি না বলেছিলে, এত খরচ ক'রে আপনি কঙ্কণ গড়ালেন, আজকালকার মেয়ে ত, পছন্দই হয় ত করবে না।

বাপুলী মহাশয় কহিলেন—আপনার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আপনার কুলদেবী যে নির্জ্জনে ব'সে আপনার মনের মত কুলবধূটিকে সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন, এ সন্ধান ত তখন পাই নি।

হরিনারায়ণবাবু হাসিয়া কহিলেন—সাধে কি আমি আমার চণ্ডীমাকে নিজের ইচ্ছামত সাজে আজ সাজাতে এসেছি বাপুলী।

ব্যাগের ভিতর হইতে তাহার পর বাহির হইল এক জোড়া হেমচাঁপার মালা ও রত্নখচিত স্বর্ণময় মুকুট। এই দুইটি অভিনব অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—যেমন তোমার নাম আর তুমি, আমিও ঠিক তেমনই তোমার শ্বশুর, আর আমার দেওয়া যৌতুক! এ দুটি অলঙ্কার আমার লোহার সিন্দুকে তোলা ছিল মা, আমার বৃদ্ধ পিতামহ মহেশ্বর গাঙ্গুলী এই মালা আর মুকুট গড়িয়েছিলেন আমার প্রপিতামহীর জন্য। আমার পিতামহীও এই দুই অলঙ্কার পরতেন শুনেছি, কিন্তু তার পর গাঙ্গুলী পরিবারে যাঁরা কুলবধূ হয়ে প্রবেশ করেন, এ দুটো বস্তুর ভার বহন করবার মত সামর্থ্য তাঁদের কারুরই ছিল না। এই ভার এখন তোমাকে বহন ক'রে গাঙ্গুলী পরিবারের লুপ্ত শক্তিকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে মা।

খাঁটি সোনায় নির্ম্মিত একই আকারের চল্লিশটি বড় বড় চাঁপা তাহাদের সংযোগে এই অপূর্ব্ব মালা গ্রথিত। হরিনারায়ণবাবু চণ্ডীর গলায় প্রায় দুইশত ভরি ওজনের এই অভিনব মালা পরাইয়া দিলেন, তাহার পর সেই বিচিত্র রত্ন-মুকুটখানি তাহার মাথায় আঁটিয়া দিয়া হাসিয়া কহিলেন—এইবার আমাদের মাকে ঠিক মানিয়েছে।

চণ্ডী একে একে সকলেরই পদতলে নত হইয়া শিষ্টতার পরিচয় দিল। নববস্ত্রালঙ্কার ধারণের পর অধিকাংশ স্থলেই মেয়েরা এইভাবে প্রণম্যগণের চরণ বন্দনা করিয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক হিন্দু সমাজে এই প্রথা সুপরিচিত।

হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—বাঃ! অলঙ্কারের ভরে চণ্ডীমা আমাদের মোটেই আড়ষ্ট হন নি।

করালীবাবু হাসিতে হাসিতে এই সময় কহিলেন—এ সব দিক্ দিয়ে মেয়ে আমার বে-পরোয়া। হুজুর হয় ত শুনলে আশ্চর্য্য হবেন—চালের একমোণি বস্তা চণ্ডী মাথায় তুলে অনায়াসে ওপর নীচে ওঠানামা করেছে এমন কত বার।

হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—একমোণি বোঝা বহন করা ত আমার মায়ের কাছে ছেলেখেলা ব্যেই; কিন্তু যে বিষম বোঝার ভার আমি এঁর মাথায় চাপাবো—এর পরে শুনবেন তার কাহিনী। তবে, আমি ঠিক জানি, মা আমার পেছপাও হবেন না কিছুতেই। এইবার মা তোমাকে আর একটি জিনিস দেব এইটেই হচ্ছে আমার সবের শেষ আর সব চেয়ে সেরা যৌতুক।

বলিতে বলিতে তিনি সর্পাকৃতি স্বর্ণময় একটি বিচিত্র বস্তু বাহির করিলেন। সেই জিনিস চণ্ডীর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—বলতে পারো মা, এ জিনিসটি কি?

চণ্ডী মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিল—চাবুক ব'লে মনে হচ্ছে।

ঠিক ধরেছ মা, চাবুকই বটে ; তুমি এ রকম চাবুক দেখেছ ?

দেখেছি ! দাদামশাই আমায় এই রকমেরই একটা চাবুক দিয়েছিলেন। তবে সেটা ছিল চামড়ার—

আর এটা হচ্ছে সোনার। আমি এটি তোমার হাতে দিচ্ছি কেন শুনবে ? আমার বাড়ীতে আছে একটা ভারি বেয়াড়া গাধা, সেটাকে শায়েস্তা করবে তুমি ; সেই জন্যই এই চাবুক।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী প্রশ্ন করিল—গাধাকে শায়েস্তা করতে চামড়ার চাবুক ত যথেষ্ট, সোনার চাবুকের কি দরকার বাবা ?

হরিনারায়ণবাবু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চণ্ডীর কৌতুকোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিলেন, তাহার পরই তাঁর সৌম্য মুখখানিকে কঠিন করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে তিনি উত্তর দিলেন—আমি যার কথা তোমাকে বলেছি মা, সে ত সাধারণ গাধা নয়—সেটাও যে সোনার গাধা, তাই তাকে সংযত করতে প্রয়োজন—সোনার চাবুক। এই নাও মা ধরো, আর এই সঙ্গে মনে রেখো মা আমার কথা।

চণ্ডী হাত বাড়াইয়া এই রহস্যময় পুরুষটির হাত হইতে সেই অপূর্ব্ব স্বর্ণময় প্রহরণটি গ্রহণ করিল।

চার

বাশুলীর এই খেয়ালী জমিদারটির প্রভাব, প্রতিপত্তি ও দপদপা দেখিয়া বিভিন্ন পরগণার লোক ভাবিত, জন্মান্তরের অতি বড় পুণ্যের জোর না থাকিলে মানুষ এতটা ভাগ্যবান হইতে পারে না। কিন্তু তাহারা যদি এই ভাগ্যধরটির পারিবারিক সুখ-সৌভাগ্যের খবর রাখিত, তাহা হইলে তাহারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে পাইত, বিপুল ধন-সম্পত্তি ও একাধিক পরগণার অধিপতি হইয়াও এই অতিমানুষটির দুঃখের অন্ত নাই।

শৈশবেই হরিনারায়ণবাবু পিতৃহীন হন, কিন্তু স্নেহময়ী জননীর আদর ও আশ্রিতা আত্মীয়গণের বিপুল পরিচর্য্যায় তিনি পিতার অভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যৌবনে যখন মাতৃহীন হইলেন, সহধর্ম্মিণী সুলোচনার সাহচর্য্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল। কিন্তু যৌবনের অপরাহ্নে যে দিন সুলোচনা তাঁহার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া পরলোকের পথে মহাপ্রস্থান করিল, বিশাল জমিদারী, বিপুল ঐশ্বর্য্য, দুর্ব্বার প্রতাপ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, সেইদিন হরিনারায়ণবাবু প্রথম উপলব্ধি করিলেন, শোকের মর্ম্মন্তুদ যাতনা—প্রিয়বিরহে সহস্র অতীত স্মৃতির নিদারুণ দংশনের জ্বালা। বিশাল ভবনে আশ্রিত প্রতিপালিত আত্মীয় অনাত্মীয়দের সংখ্যা হয় না, কিন্তু কে দিবে সান্ত্বনা! সাধ্বী সুলোচনা যে তাঁহার অঞ্চলখানি প্রসারিত করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিতেন, করুণাময়ী আশ্রয়দাত্রীর অকাল-বিয়োগে সকলেই আত্মহারা। দুই বৎসরের শিশু, সুলোচনার একমাত্র উপহার গোবিন্দকে বিশাল বক্ষোমধ্যে চাপিয়া হরিনারায়ণবাবু পত্নীশোক ভুলিতে প্রয়াস পাইলেন—পারিলেন না। পুত্র পিতার আদরে ভুলিল না অসংখ্য পরিচারিকা ও পরিজনরা শোকার্ত্ত শিশুকে লইয়া বিব্রত হইয়া

উঠিল, শিশু কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহে না, তাহার মুখে শুধু আকুল উচ্ছ্বাস—মা কাছে যাবো।

শোকাতুর পিতা স্তব্ধ হইয়া ভাবেন, তিনিও ত শৈশবে পিতৃহারা হইয়াছিলেন, যৌবনে মাকে হারাইয়াছিলেন, কিন্তু এমন ভাবে ত আত্মহারা হন নাই!

পৌরুষের অভিমান তৎক্ষণাৎ চল্লিশ বৎসরের উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাম্ভিক ভূস্বামীর চিত্তে তুলিল বিক্ষোভ! সাধারণ দশজনের মত তিনিও শোক-মথিত দেহখানি লইয়া লোকের মৌখিক সহানুভূতির ভিখারী হইবেন! যাহারা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস পায় না, এই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় করিবার অবকাশ পাইবে! এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শোকের আবর্ত্তকে সবলে রুদ্ধ করিয়া, তিনি প্রচণ্ড উৎসাহে জমিদারীর কাজে লিপ্ত হইলেন। সদ্যশোকাতুর হুজুরের এই আকস্মিক উদ্দাম কর্ম্মলিপ্সায় সেরেস্তায় শিহরণ উঠিল। পরিজন ও পরিচারিকাদের উপর কঠোর আদেশ হইল—ছেলের কান্না তিনি পছন্দ করেন না, অতএব সাবধান!

সকলেই কর্ত্তার সম্বন্ধে সচেতন থাকিত। জানিত, এখানে পাণ হইতে চূণটুকু খসিলেই মুস্কিল; খোকার কান্না যদি কোনও দিন হুজুরের কানে গিয়া বাজে, কাহারও নিস্তার থাকিবে না। কিন্তু খোকা কিছুতেই দু'দণ্ড চুপ করিয়া থাকে না। শেষে কান্না থামাইবার উপায় স্থির হইয়া গেল। এক পরিচারিকা কলিকাতার কোনও এক রাজপরিবারে কিছুদিন কাজ করিয়াছিল। রাজবাড়ীর রোরুদ্যমান শিশুদের সহজে শান্ত করিবার কৌশলটুকু শিক্ষা করিয়াই সে বাশুলীর বাবুদের বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল। তাহার ব্যবস্থায় সেই কৌশলটুকু এ ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়া গেল, পরিমাণ-মত মরফিয়া দুধের সহিত যোগ দিয়া শিশুকে সহজে ঘুম পাড়াইয়া দিল। অতঃপর শিশু সর্ব্বক্ষণই ঘুমায়, কর্ত্তার কানে কান্না তাহার পৌছায় না।

বাহিরে কর্ত্তা খুবই কঠিন, সকলেই ভাবে, কি সহ্য গুণ; অত বড়

শোকটায় একটু আহা উহু নাই! কিন্তু ভিতরটির কি অবস্থা, কে তাহার সন্ধান রাখিবে! প্রত্যূষে অশ্রুসিক্ত উপাধানটি উপলক্ষ করিয়া এই কঠিন পুরুষের মনোবৃত্তি নির্ণয় করিবার অবসর কেহ পাইত কি?

ছয়টি মাস এই ভাবে কাটিল। কঠিন পুরুষ বাহিরের সেরেস্তায় জমিদারী গদিতে বসিয়া কঠোরভাবে জমিদারী শাসন করেন, মধ্যাহ্নে ও নিশীথে নিজের সুসজ্জিত কক্ষের কোমল শয্যায় দেহখানি ঢালিয়া দিয়া স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর স্মৃতি লইয়া ভাবেন। কিন্তু ভাবনাটুকুরও পরিসমাপ্তি হইয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায়।

অষ্টকোটের রাজার কোপে ও কন্যাকুলের ধনকুবের মহাজনের ঋণের চাপে পড়িয়া পার্শ্ববর্তী পরগণার অন্যতম ব্রাহ্মণ ভূস্বামী রাজা রেবতীমোহন রায়চৌধুরী বাশুলীর গাঙ্গুলীবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। হরিনারায়ণবাবু প্রায় এগার লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দিয়া রাজাকে যেমন রক্ষা করিলেন, কৃতজ্ঞ রাজাও তেমনি তাঁহার এষ্টেট পরিচালনার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব তাঁহার রক্ষাকর্ত্তার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সূত্রে দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হইয়া উঠিল এবং একদিন সকলেই সবিস্ময়ে শুনিল, রাজা রেবতীমোহনের সপ্তদশী তরুণী কন্যা মাধুরী দেবী বাশুলীর গৃহিণী-শূন্য শুদ্ধান্তে রাণীর মর্যাদায় প্রবেশ করিতেছেন।

হরিনারায়ণবাবুর খেয়ালের অন্ত ছিল না সত্য, কিন্তু খেতাবের মোহ কোনও দিন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার অসংখ্য প্রজার তিনি প্রাণের রাজা—পরগণার সর্ব্বত্র তাঁহার আখ্যা—বাশুলীর রাজাবাবু। কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হইলে তিনি সেই সঙ্গে কলেক্টর বা কমিশনারকে লিখিয়া পাঠান—টাকার বিনিময়ে তাঁহাকে যেন কোনও খেতাব দিয়া লজ্জিত না করা হয়।

যে খেয়ালের বশে হরিনারায়ণবাবু বিবিধ অসাধ্যসাধন করিয়া থাকেন, রাজা রেবতীমোহনের বয়স্থা কন্যাকে এ ভাবে সহসা বিবাহ

করাও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খেয়ালের অন্তর্গত। অষ্টকোটের রাজা বংশমর্য্যাদায় হীন হইয়াও রাজা রেবতীমোহনের কন্যার পাণিপ্রার্থী হন এবং দুই সূত্রেই কন্যাকুলের ধনী মহাজন রাজা বাহাদুরকে বিব্রত করিয়া তুলেন। হরিনারায়ণবাবু রাজা রেবতীমোহনকে ঋণমুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু অষ্টকোটের চরিত্রহীন দুর্দ্ধর্ষ রাজা অক্টপাসের মত অষ্টপদ বিস্তার করিয়া রাজকন্যাকে আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। রাজা রেবতীমোহন ব্যয়বাহুল্যে রাজোচিত মর্য্যাদাটুকু রক্ষা করিতে যে পরিমাণে সচেতন ছিলেন, মামলাবাজী বা লাঠালাঠি ব্যাপারে সেই অনুপাতে ছিলেন উদাসীন। অষ্টকোটকে এ বিষয়ে বেপরোয়া দেখিয়া তিনি সভয়ে দ্বিতীয়বার হরিনারায়ণবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। অষ্টকোটের রাজাদের সহিত বাশুলীর বাবুদের বংশানুক্রমে একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল। সমস্ত শুনিয়া খেয়ালী জমিদারের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল; তলে তলে অষ্টকোটের যখন এই চেষ্টা চলিয়াছিল, তখন সকলকে চমৎকৃত করিয়া অসংখ্য লাঠিয়াল-পরিবেষ্টিত নবপরিণীতা রাজকন্যার শিবিকা একদা বাশুলীর প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

তাহার পর আরও বাইশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বাশুলীর প্রাসাদে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মাতৃহীন দুই বৎসরের শিশু গোবিন্দ এখন চব্বিশ বৎসরের যুবা। মাতৃবিয়োগের পর এই শিশু পিতার মনে যে সংশয় তুলিয়াছিল, আজও তাহাকে লইয়াই যত আশঙ্কা, যত সমস্যা ও উদ্বেগ।

অবশ্য পিতৃপুরুষদের আকৃতিগত সৌন্দর্য্য হইতে গোবিন্দকে বিধাতা-পুরুষ বঞ্চিত করেন নাই। তবে এই বয়সে এত বড় অভিজাত বংশের ছেলের চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা থাকা উচিত, গোবিন্দের দেহে তাহার অভাব দেখা যায়। দেহের রং খুব সুন্দর হইলেও কেমন যেন ফ্যাকাসে, মুখখানি যদিও বেশ ঘোরালো, কিন্তু কোমলতা বর্জ্জিত;

ত্বক রুক্ষ ও কর্কশ, এই বয়সেই রীতিমত পাকিয়া গিয়াছে। গোঁফের চুলগুলি পিঙ্গলবর্ণ, মাথার চুলেও তাহার আভা। এইগুলি যেমন তাহার আকৃতিগত ত্রুটি, তেমনই কয়েকটি বিশেষত্বও পৌরুষের দিক দিয়া প্রশংসনীয়। গোবিন্দের ছয় ফুট দীর্ঘ দেহযষ্টি, আজানুলম্বিত দুটি বাহু, অসাধারণ টিকোলো নাসিকা ও একযোড়া দীর্ঘায়ত চক্ষু সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইহা ত গেল আকৃতির কথা। কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়া তাহার ত্রুটি প্রচুর। মানসিক ব্যাধি ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় সে একবারেই অকর্ম্মণ্য। বাহিরের কাহারও সহিত তাহার মিশিবার অধিকার নাই, ক্ষমতাও নাই। বিষয়-সংক্রান্ত কোনও কার্য্যেই এ পর্য্যন্ত কর্ত্তার তরফ হইতে তাহার উপর ডাক পড়ে নাই। নামেই সে বাড়ীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, বিষয়বুদ্ধি ত দূরের কথা, আত্মসম্মান বজায় রাখিবার স্থানটুকুর পর্য্যন্ত তাহার অভাব। পরিচারক-পরিচারিকারা তাহাকে গ্রাহ্য করে না, আশ্রিত আত্মীয় পরিজনরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে। কেহ তাহাকে বিদ্রূপ করিলে তাহার মনে অভিমান আসে না, আদেশ কেহ অবহেলা করিলেও তাহার চক্ষুর ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠে না। সুতরাং এমন নির্ব্বিকার নিস্তেজ নগণ্য বংশধরকে লইয়া যে এই বংশের মালিকের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর কথা কি?

পক্ষান্তরে, কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র গোবিন্দের বৈমাত্রেয় ভাই—নিবারণ বয়সে প্রায় চারি বৎসরের কনিষ্ঠ হইয়াও যেন সকল বিষয়েই জ্যেষ্ঠকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া কৃতী পিতার ঠিক পাশটিতে গিয়াই দাঁড়াইয়াছে। প্রয়োজন পড়িলে, কর্ত্তা তাহাকে কত গুরুতর কাজেই নিয়োগ করেন—পিতার বহুগুণ পুত্রে বর্ত্তাইয়াছে; কি তাহার দাপট এই তরুণ বয়সেই; সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণ ভয়ে তটস্থ, বাড়ীর মধ্যে দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কাঁপিয়া

অস্থির হয় : পুত্রের প্রতাপ ও ঔদ্ধত্য পিতারও পরম প্রীতিপদ, প্রায়ই সমর্থন করিয়া বলেন—এই ত চাই, গোড়ায় দাপট দেখাতে পারলে তবেই শেষে নামের জোরে শাসন চলে।

জ্যেষ্ঠের প্রতি কর্ত্তার একান্ত উপেক্ষা ও কনিষ্ঠের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়া এষ্টেটের সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অদূর-ভবিষ্যতে কনিষ্ঠ নিবারণই তাহাদের ভাগ্যবিধাতা হইবে।

এই ধারণাটুকু মনে সুদৃঢ় হইবার মূলে যে কারণটুকু ছিল, তাহা এইরূপ :—

পুরুষানুক্রমে এই বংশের প্রচলিত পদ্ধতি—সম্পত্তি বিভক্ত হইবার উপায় নাই। বংশের জ্যেষ্ঠই এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইয়া সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন, কনিষ্ঠগণ নির্দ্ধারিত বৃত্তির অধিকারী থাকেন মাত্র। ঊর্দ্ধতন বহু পুরুষ ধরিয়া এই প্রাচীন বিধি অনুসারে বাগুলীর গাঙ্গুলীবংশ ও তাঁহার অধিকৃত বিপুল সম্পত্তি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ঐশ্বর্য্যসূত্রে এই গাঙ্গুলী পরিবারের যে পরিমাণ বাড়বাড়ন্ত, বংশবৃদ্ধির দিক দিয়া তাহার অভাব দেখা যায়। বিধাতাপুরুষ যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই বরাবর এই বংশে একটি করিয়া পুত্র যোগান দিয়াছেন। কেবল বর্ত্তমান বংশপতি হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর দুর্ব্বার দাপটেই যেন বিধাতার নিয়মভঙ্গ হইয়াছে। এ বংশে একমাত্র ইনিই দুই পক্ষে দুই পুত্র পাইয়াছেন এবং এই সূত্রে এই প্রথম উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে একটা সংশয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পাঁচ

শ্যামাপুরের নায়েবের পত্রে চণ্ডীর সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পাইয়াই হরিনারায়ণবাবু গৃহিণী মাধুরী দেবীকে কহিয়াছিলেন—চমৎকার একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি।

ইতিপূর্ব্বেই মাধুরী দেবী স্বামীকে উপদেশ দিয়াছিলেন, গোবিন্দের যে রকম মতিগতি ও বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব, তাতে কিছুতেই তার বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

স্ত্রীর কথায় হরিনারায়ণবাবু কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—কথাটা ভাববার মত বটে!

ইহার পরেই উঠে গোবিন্দকে রাখিয়া নিবারণের বিবাহের কথা। কর্ত্তা গৃহিণীর কথা শুনিয়া হেঁয়ালীর ভাষায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তাহাই তাঁহার প্রাণের কথা ভাবিয়া মাধুরী দেবী মনে মনে ইহাই সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদাটুকু লইয়াই গোবিন্দ বৃত্তিভোগী অবস্থায় তাহার নিঃসঙ্গ জীবনটা কাটাইয়া দিবে; স্বাস্থ্য, প্রকৃতি ও পরমায়ু সম্বন্ধে সন্দেহভাজন এই ছেলেটি যেমন সংসারধর্ম্মে লিপ্ত হইতে বিরত থাকিবে, তেমনই বাশুলীর রাজগদীর সংস্পর্শ হইতে দূরেই থাকিয়া যাইবে।

সুতরাং কর্ত্তা যে চমৎকার মেয়েটির প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন, সেটী নিজ-পুত্র নিবারণের সম্পর্কেই সাব্যস্ত করিয়া মাধুরী দেবী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন—শুধু দেখতে শুনতে চমৎকার হ'লে ত চলবে না, ঘরও চমৎকার হওয়া চাই।

কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন—কিন্তু শাস্ত্রকাররা লিখে গেছেন—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া ইহাতে মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন—সে শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেলো। রাজকন্যা না হলে নিবারণের মনে ধরবে না, আর আমারও এই ধনুর্ভঙ্গ পণ—সে ত তুমি জানই ; মেয়েটি কোথাকার শুনি ?

কর্তা গম্ভীরভাবেই কথাটার উপসংহার করেন—তা হ'লে আর শুনে কাজ নেই ! তোমার এই ধনুর্ভঙ্গ পণটির কথা আমার মনেই ছিল না ; যাই হোক, এর পর তোমার এ পণ মনে রেখেই আমি নিবারণের কনে খুঁজব।

দুই দিন পরেই কর্তা গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন—গোবিন্দের বিয়ের দিনস্থির ক'রে এলুম, আসছে সাতাশে শুভকাজ।

কর্তার কথাগুলি বজ্রধ্বনির মত গৃহিণীর কানে নির্ঘাত হইয়া বাজিল। গোবিন্দের বিবাহ। তিনি কি ভুল শুনিলেন! বিস্ময়কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল—কার বিয়ে বললে ?

সহধর্ম্মিণীর বিস্ময়াচ্ছন্ন মুখখানির উপর বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কর্তা উত্তর দিলেন—তোমার বড় ছেলের।

পরক্ষণে শুষ্ককণ্ঠে গৃহিণীর সশ্লেষ উক্তি—সত্যি! বড় ছেলের আইবুড়ো নামটাও তা হ'লে খণ্ডাবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছ বল! এটি আগেই প্রয়োজন বটে !

কোথায় গৃহিণীর ব্যথা, তাহা উপলব্ধি করিয়াই কথাপ্রসঙ্গে কর্তার প্রত্যুত্তর—এত দিন এটা প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি নি ; কিন্তু কন্যাটিকে দেখেই যেমনই মনে হ'ল, চমৎকার, তখনই তাকে নেবার কথাটা দিয়ে ফেলি। গরীবের মেয়ে, নিজের রূপগুণ যতই থাক্, বাপের নামডাক, খেতাব বা বড়মানুষীয়ানা কিছুই নেই। এ দিকে নিবারণের সম্বন্ধে তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ—যেমন তেমন ঘরের মেয়ে তোমার মনে ধরবে না—রাজকন্যা চাইই ; কাজেই নিজের মুখের কথাটুকু রাখবার জন্য গরীবের এই মেয়েটিকে গোবিন্দের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তার আইবুড়ো নাম খণ্ডাবার ব্যবস্থাই করা গিয়েছে।

অখণ্ড মনোযোগের সহিত স্বামীর কথাগুলি শুনিয়া মাধুরী দেবী এবার গম্ভীরভাবেই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—ভালই হয়েছে, জমিদারের জড়ভরত ছেলে, আর গরীবের ঘরের চমৎকার মেয়ে—দুয়ে মিলবে ভাল!

উৎসাহের স্বরে কর্ত্তা কহিলেন—ঠিক কথাই বলেছ তুমি, আমারও ঠিক এই মত; সেই জন্যই আমি অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের এই বেকাম গাধাবোটখানার সঙ্গে একটা তেজীয়ান ষ্টীম-লঞ্চ বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করেছি। এর ফল হয় ত ভালই হবে, এক দিন জেটিতে গিয়ে ভিড়লেও ভিড়তে পারে।

এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা উঠিবার অবকাশ পাইল না; কিন্তু যাহা উঠিল, বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কর্ত্তার শেষের কথাগুলি মধুমক্ষিকার হুলের মত মাধুরী দেবীর বক্ষে বিদ্ধ হইয়া দাহ উপস্থিত করিল। দীর্ঘ বাইশ বৎসর এই সুবৃহৎ সংসারটির উপর প্রভুত্বের শকটখানি কি তিনি ভুল পথে চালাইয়াছেন? স্বামীর অন্তররাজ্যের রহস্যদ্বার কি এত দিন তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়াই ছিল? চারিদিকের আটঘাট বাঁধিয়া প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে অতি সন্তর্পণে পুত্র নিবারণের প্রতিষ্ঠার যে পথটুকু তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কি সত্যই ব্যর্থ-প্রয়াস?

ছয়

নির্দ্দিষ্ট দিনটির শুভলগ্নেই এই রহস্যময় বিবাহের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কন্যাপক্ষ কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যে পরিমাণ ঘটার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই অনুপাতে ধনাঢ্য বরপক্ষের তরফ হইতে বিশেষ কিছু জাঁকজমকের পরিচয় পাওয়া গেল না। যাহারা ভাবিয়াছিল, খুব জমকালো মিছিল করিয়া যাত্রার দলের রাজার মত সাঁচ্চার পোষাক পরিয়া বর আসিয়া সভায় বসিবে, তাহারা যেন আকাশ হইতে পড়িল। পাল্কী হইতে নামাইয়া বরকে যখন সভায় বসান হইল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, বরের পরনে বেনারসী ধুতি, গায়ে তাহারই পিরাণ ও চাদর। বিশেষত্বের মধ্যে বেলফুলের গোড়ের সহিত পাল্লা দিয়া বড় বড় মুক্তাদিয়ে গাঁথা এক ছড়া দীর্ঘ মালা গলায় দুলিতেছিল। বরের চেহারা দেখিয়া যাহারা বলিল—বেশ, কিছুক্ষণ পরে তাহারাই আবার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বরপক্ষের অন্তরালে মত প্রকাশ করিল—বোধ হয় মাথায় ছিট্ আছে।

কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় এমনই এক অপূর্ব্ব ভাবে বরের চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল যে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহা বধূর অন্তরস্পর্শ করিল। বধূও ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে অন্তর্ভেদী উজ্জ্বল দৃষ্টিতেই বরের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইল, এই অপরিচিত মানুষটি যেন অতি পরিচিতের মতই সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার অন্তরের দ্বারটি উদ্ঘাটিত করিয়া কোনও কাম্য-বস্তুর সন্ধান করিতেছে। চণ্ডীর দীর্ঘায়ত চক্ষু দুটি পল্লবভারে ধীরে ধীরে অবনমিত হইল।

অন্দরের বর বাসরেও বাহিরের আসরের মত সকলের মনেই সংশয়

তুলিল। মুখে কথা নাই, তীক্ষ্ণ পরিহাস-বিদ্রূপে দৃক্‌পাত নাই, তরুণীদের লাস্যলীলায় তাহার মুখে হাসির কোন চিহ্নটিও কেহ দেখিল না। বাসর-সঙ্গিনীদের সকল প্রয়াসই যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, বরের হৃদয়-বর্ম্ম ভেদ করিতে পারিল না, তখন তাহারা বেণা-বনে মুক্তা ছড়ানো বিফল ভাবিয়া—মুক্ত অবগুণ্ঠন মাথায় তুলিয়া বাসর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া চণ্ডী এ পর্য্যন্ত বদ্ধদৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিয়াছিল। মেয়েরা সকলেই চলিয়া গেলে সে মুখখানি অবগুণ্ঠন মুক্ত করিতেই বরের সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির পর পরস্পরের পরিপূর্ণ দৃষ্টির এই পুনরায় সংযোগ।

বরই প্রথমে কথা কহিল, বালকের ন্যায় তরল কৌতূহলের স্বরে প্রশ্ন করিল—তোমার নাম বুঝি চণ্ডী ?

বরের মুখে বালকসুলভ ভঙ্গিতে এই প্রশ্ন শুনিয়া চণ্ডী মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া বিদ্রূপের স্বরে অসঙ্কোচে কহিল—হাঁ। তুমি বুঝি মনে মনে এই কটা কথা এতক্ষণ মুখস্থ করছিলে ?

দুই চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল করিয়া বর কহিল—বিয়ে করতে এসে বুঝি কেউ পড়া মুখস্থ করে !

বরের কথায় চণ্ডীর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—বরকে তা হ'লে কি করতে হয় ?

মুখের ভঙ্গির সহিত হাতের একটি অঙ্গুলী তুলিয়া বর উত্তর দিল—চুপটি ক'রে বাবু হয়ে বসে থাকতে হয়।

অনুরূপ কৌতুকভঙ্গিতে চণ্ডী কহিল—তাই বুঝি এতক্ষণ চুপটি ক'রে চোরটির মত বসেছিলে, সাত চড়েও কথা কও নি ?

বর কহিল—ওরা যে মেয়েমানুষ !

চণ্ডী কহিল—আর আমি বুঝি পুরুষমানুষ ?

বর এবার হাসিমুখে কহিল—উহুঁ, তুমি যে আমার বউ।

চণ্ডী নিরুত্তরে নিষ্পলকনয়নে কিছুক্ষণ তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই নির্ব্বোধটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তাহাকে কাহার পার্শ্বে আনিয়া বসাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পৃষ্ঠে কে যেন চাবুক মারিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার শ্বশুরের দেওয়া সোনার চাবুক আর সেই সঙ্গে তাঁহার কথা—আমার বাড়ীতে আছে একটা ভারি বেয়াড়া গাধা, সেটাকে সায়েস্তা করবে তুমি; সেই জন্যই এই চাবুক। চণ্ডীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

পরক্ষণে তাহার মনে পড়িল, রাজকন্যা বিদ্যাবতীর গল্প। পণ্ডিতদের চক্রান্তে মূর্খ কালিদাসের সহিত তাহার পরিণয়-রহস্য! কিন্তু রাজকন্যা মূর্খ স্বামীকে প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, আর সেই উপেক্ষিত মূর্খ কঠোর সাধনায় জয়পতাকাহস্তে বিদ্যামন্দিরের শিখরে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতা পত্নীর দর্প ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেই পরীক্ষা কি আজ তাহাদের সম্মুখেও উপস্থিত!

চণ্ডীকে নিরুত্তর দেখিয়া বর তাহার দন্ত পাটি বিকাশ করিয়া কহিল—দেখো, আজকে আমার ভারি আহ্লাদ হচ্ছে, সত্যি।

দুশ্ছেদ্য চিন্তাজাল যেন সবলে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চণ্ডী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কেন বল ত?

বর গভীর লজ্জায় হাত দুইখানি কচলাইতে কচলাইতে চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—এই তোমাকে বে ক'রে, তোমাকে দেখে, আর তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে—

চণ্ডী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—আমাকে তা হ'লে তোমার পছন্দ হয়েছে বল?

ধ্যেৎ! আমার লজ্জা করে।

আচ্ছা, ও কথা না হয় থাক্; তা হ'লে আমার কথাগুলো ত ভাল লাগছে?

হুঁ ; এমন ক'রে কেউ ত আমার সঙ্গে কথা কয় না !

কেন—বাবা ?

বাবা ত দেখলেই বকে।

দেখলেই বকেন বুঝি ? কিন্তু মা ?

মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু চোখ পাকিয়ে এমনি চাইবে, বাবা রে ! তোমার মত কি চায় ভেবেছ, সে চাউনি—

শুধুই রাগ ক'রে চান, আদর যত্ন করেন না মোটেই ?

কেন করবেন বল ত ? আমি যে মুখ্যু, মানুষ হয়েও গাধা, আমার ত গুণ কিছু নেই।

তুমি বুঝি পড়াশুনাও কিছু কর নি ?

নাঃ ! করব কোত্থেকে ? রোজ রোজ মাষ্টার আসত আমাকে পড়াতে, কিন্তু এমনই মজা, যে একদিন আসত, আর তার টিকিও দেখতে পেতুম না—

কেন ?

কি করবে এসে বল না ? আমার মাথায় নাকি গোবর পোরা, বলত, ওর কিচ্ছু হবে না। কিন্তু তোমাকে বলি, আমার ভারি ইচ্ছে করত পড়তে—

নিজেই কেন পড়তে না ?

পড়ব কি ক'রে ? খোকা রাজা ছুটে এসে বই কেড়ে নিয়ে যেত ; বলত, তুই পাগল, বই নিয়ে বসলে মাথা গুলিয়ে যাবে। আমার বাবাকে বলত, ওর কিচ্ছু হবে না।

খোকা রাজাটি তোমার কে

জান না ? আমার ছোট ভাই, ঐ যে নতুন মার কথা বললুম, তাঁর ছেলে। আমার নিজের মা ত নেই।

ও ! বুঝেছি। আচ্ছা, বাবাকে তুমি কিছু বলতে না ?

উহুঁ! খোকা রাজা তা হ'লে পিঠের চামড়া আস্ত রাখত না! এক একদিন যা মারে—

মারে! তুমি না তার বড় ভাই!

বড় ভাই হ'লে কি হয়—সেই যে রাজা হবে, তা বুঝি জান না?

সে কি? আর তুমি?

আমি যে বোকা, পাগল, জড়ভরত। তাই কেউ আমাকে ভালবাসে না, ভাল কথা বলে না, তাই না তোমাকে এত ভাল লাগছে তোমার কথা শুনে! সত্যি, তোমার কথা কি মিষ্টি, তুমি আমাকে ভালবাসবে ত?

চণ্ডীর বুকের ভিতর যে ঝড় বহিতেছিল, দুই হাতে তাহার গতি রুদ্ধ করিয়াই যেন সে বাষ্পার্দ্রকণ্ঠে কহিল—বাসব বই কি।

অসহায় শিশুর মত আবদারের স্বরে বর কহিল—ওদের মত মারবে না ত—নতুন মার মত চোখ দিয়ে বকবে না বল—এমনি ক'রে গল্প করবে আমার সঙ্গে?

কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া চণ্ডী কহিল—করব, তুমি যাতে সুখী হও তাই করব আমি।

বিপুল উল্লাসের আবেগে বর কহিল—সত্যি? বাঃ! তা হ'লে কি মজাই হবে। আমি কিচ্ছু করব না, শুধু তোমার কথা চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে শুনব।

চণ্ডী মুখে হাসি টানিয়া কহিল—তা শুনো, অনেক গল্প আমি জানি, তোমাকে সবই শোনাব, কিন্তু তোমাকেও আমার একটি কথা রাখতে হবে।

চণ্ডীর মুখের উপর চক্ষু দুইটি তুলিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে বর চাহিয়া রহিল।

চণ্ডী কহিল—তোমাকে মানুষের মত মানুষ হ'তে হবে।

বরের মুখে কথা নাই, দুই চক্ষুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি পার্শ্ববর্তিনী বধূর মুখেই নিবদ্ধ; সেই দৃষ্টি যেন প্রশ্ন করিতেছিল—সে আবার কি?

চণ্ডী তখন বিস্মিত বরকে রাজকন্যা বিদ্যাবতীর গল্পটি শুনাইয়া দিল। বর পরমাগ্রহে সে গল্প শুনিল। মূর্খ কালিদাস কঠিন সাধনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছিলেন শুনিয়া বর ব্যগ্র উল্লাসে কহিল—বাঃ! বাঃ! কি মজা! শুনে এমনি আহ্লাদ হচ্ছে আমার!

চণ্ডী স্বামীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তোমার ঐ রকম হতে ইচ্ছে করে না?

সহর্ষে বর কহিল—আমার! হ্যাঁ, হয়। কেউ যদি আমাকে শেখায়, আমার ভার নেয়, সত্যি, আমিও তা হ'লে মানুষ হ'তে পারি।

দৃঢ়স্বরে চণ্ডী কহিল—মানুষ তোমাকে হতেই হবে। আমি তোমার ভার নেব, এর জন্য আমি করব কঠোর সাধনা।

সাত

আসরে বর আসিয়া বসিলে তাহার সম্বন্ধে যে সকল অপ্রীতিকর কথা উঠে এবং বাসরে বরের মুখে একটি কথাও না শুনিয়া মেয়েদের দল যে সব কথা রটায়, সে সমস্ত চণ্ডীর বাবা মা ও পরিজনদের কানে যথাযথভাবেই উঠিয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত সংযোগ তাঁহাদিগকে যেমন আনন্দে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, বরের সম্বন্ধে নানা কণ্ঠের অপ্রিয় মন্তব্য তেমনি নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁহাদের মনের উল্লাস মুসড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু হরিনারায়ণবাবুকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কিম্বা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বরের সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার মত সাহসটুকু পর্য্যন্ত কাহারও দেখা যায় নাই।

বিবাহের পরদিন প্রত্যুষে পূজার দালানে পরিজনেরা সমবেত হইয়াছেন। বরের বিষয় লইয়াই তুমুল আলোচনা চলিয়াছে। বাসর হইতে যে সব তরুণী মুখ ভারী করিয়া ফিরিয়াছিল, বাসর-জাগরণের দক্ষিণা আদায়ের জন্য তাহারাও আসিয়া দল ভারি করিয়াছে। একজন মন্তব্য প্রকাশ করিল—এ যেন ঠিক সেই—ওঠ ছুঁড়ি, তোর বে—হ'ল! খোঁজ-খবর নেই, জিজ্ঞাসাবাদ নেই, অমনি হয়ে গেল পাকাপাকি কথা, হ'লই বা বড় লোক?

করালীবাবু রুক্ষস্বরে কহিলেন—এ সব কথা এখন কেন? তোমরা কি এই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী বাধাতে চাও? ভবিতব্যের বিধান কে কবে খণ্ডন করতে পেরেছে শুনি!

এই সময় প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া চণ্ডী ধীরে ধীরে দালানের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের মুখের কথা একেবারে থামিয়া গেল, প্রত্যেকের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি পড়িল চণ্ডীর মুখের উপর। কিন্তু সে মুখে বিষাদের কোনও চিহ্ন নাই, চিন্তার একটিও রেখা তাহার সেই দৃপ্ত মুখখানির উপর পড়িয়া এতটুকু বিকৃত করে নাই; এমন একটা অপরিসীম তৃপ্তি ও প্রসন্ন হাসির দীপ্তিতে চণ্ডীর মুখখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল—বিয়ের পরদিন যেটুকু কোনও মেয়ের মুখেই দেখিবার আশা করা যায় না।

মেয়ের প্রকৃতি পিতামাতার অবিদিত নয়; তাঁহারা উভয়েই চণ্ডীর মুখ দেখিয়া স্বোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। বুঝিলেন, বাসরে কোনও অনর্থ বাধে নাই, আর সকলে হাল ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলেও, তাঁহাদের মেয়ে জামাইকে যাচাই করিতে অবহেলা করে নাই; নিশ্চয়ই বর চণ্ডীর পছন্দ হইয়াছে, নতুবা কখনই সে হাসিমুখে এখানে আসিয়া দাঁড়াইত না।

তখন নানামুখে জিজ্ঞাসাবাদের বন্যা ছুটিল—বর কেমন হয়েছে?

কথাবার্ত্তা কইতে পারে কি না? বাসরে বসেও কি নেশা চালিয়েছে? তোর মুখে যে বড় এমন হাসি?—এমনই নানা প্রশ্ন, অপ্রিয় প্রসঙ্গ—নানা বয়সের প্রতিবেশিনী ও তরুণী বাসরসঙ্গিনীদের মুখে।

চণ্ডীর মুখে তখনও হাসি, রাগ বা বিরক্তির কোন চিহ্নই দেখা দিল না। সে হাসিমুখেই এক কথায় সকলের কথার উত্তর দিল—ভগবানকে বিশ্বাস ক'রে যে যা চায়, তিনি তাই তাকে দেন; আমার ত নালিশ করবার কিছুই নেই, তবে এ সব কথা কেন?

প্রশ্নকারিণীদের কৌতুকোজ্জ্বল মুখগুলি একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল; বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনীরা বিস্ময়ে নিজ নিজ মুখ বিকৃত করিয়া পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা মিত্র-গৃহিণী কৌতূহলী হইয়া কহিলেন—তবে যে এরা বলছিল, জামাই যেন একটি জন্তু, কারুর সঙ্গে কথাটা পর্য্যন্ত বলে নি—হাঁও নয়, হুঁও নয়—

কথাটায় মনে মনে আঘাত পাইলেও সে ভাব কাটাইয়া চণ্ডী একটু কঠিন হইয়া উত্তর দিল—হাঁ, ওরা তাঁকে বুনো জন্তু ভেবেই তাঁর সঙ্গে জন্তুর মত ব্যবহার করেছিল, কিন্তু তিনি মানুষ বলেই চুপ ক'রেছিলেন।

এক তরুণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—তুমি ধন্যি মেয়ে বাবা!

চণ্ডী হাসিয়া উত্তর দিল—আমিও ত চুপ করেই বসেছিলুম; নাচিও নি, বেহায়াপনাও করি নি কিছু; ঠোক্কর দিলে শুনব কেন?

আর একটি মেয়ে মুখখানি মচকাইয়া কহিল—বাসরে গিয়ে ব'সে ব'সে কেউ ইষ্টমন্তর জপ করে না।

চণ্ডী কহিল—তা ব'লে অমন হুল্লোড় কেউ করে না তোদের মত।

মিত্রগৃহিণী চণ্ডীর এই কথায় সায় দিয়া কহিলেন—তা মিছে নয়, তোমরা বাছা দিন দিন ভারী বেহায়া হয়ে উঠছ, এ কিন্তু ভাল নয়। সব বিষয়ে চণ্ডীর কাছে তোমাদের শিক্ষা করবার ঢের আছে। হাঁ রে চণ্ডী, জামায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কিছু হয়েছে তোর?

চণ্ডী কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়াই কহিল—কেন হবে না ?

এক বর্ষীয়সী অমনই গণ্ডে হাতখানি বিচিত্র ভঙ্গিতে রাখিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিলেন—বা—বা ! শোন মেয়ের কথা ! কালে কালে এ সব হ'ল কি ?

চণ্ডী ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে কহিল—বা—রে ! তোমরা বিয়ে দিতে পারলে, তাতে দোষ হ'ল না ; যত দোষ আমাদের ঐ নিয়ে কথা কইলেই ! বেশ ত !

মিত্রগৃহিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি কথা তোর সঙ্গে হ'ল, বল না শুনি ?

চণ্ডী কহিল—সে সব কথা এখন নাই বা শুনলে পিসীমা।

পিসীমা কহিলেন—নেশা-ভাঙের কথা শুনতে পেলি কিছু ?

পিসীমার কথায় চণ্ডীর মুখে ক্লেশের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া সহজ সুরেই উত্তর দিল, একথা আমাকে জিজ্ঞেসা না ক'রে, যাঁর ছেলে তাঁকেই জিজ্ঞেসা করা উচিত। তা হ'লে এখনই মীমাংসা হয়ে যায়।

আবার সকলের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন—প্রতিবেশিনীদের অধিকাংশেরই মনের আনন্দ পুনরায় বিষাদে রূপান্তরিত হইল। যাহারা প্রকৃতই এ বাড়ীর হিতার্থী, তাহাদের মনের আকাশ হইতে দুশ্চিন্তার একটা গভীর মেঘ সরিয়া গেল।

করালীবাবু কহিলেন—এই জন্যই আমি কোন কথা কই নি, কাউকে কোন প্রশ্ন করি নি। চণ্ডীর মুখে না শুনে আমি এ কথায় কোনও কথা কইব না, এই ছিল আমার সঙ্কল্প। চণ্ডীকে দেখেই আমি বুঝেছি, ও সব মিছে কথা, কোনও ভিত্তিই ওর নেই।

চণ্ডী মনে মনে তখন হাসিতেছিল। অল্পবয়সে বাপ-মা পরিজন ছাড়িয়া মেয়েদের পরের ঘরে যাইতে হয়। যে সব মেয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে

তাহারা বুদ্ধি খেলাইয়া হিসাব করিয়া কথা কয়। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীকে খাটো করিতে চায় না, বাপের বাড়ীর মর্য্যাদাটুকুও ছোট হইতে দেয় না। দাদামহাশয়ের কাছে ছেলেবেলা হইতেই চণ্ডী দুই কুলের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার শিক্ষাটুকু যেমন পাইয়াছিল, চির-প্রচলিত লজ্জা ও সঙ্কোচের মোহটুকু তেমনই কাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

বাসরসঙ্গিনীদের মনের ক্ষোভটুকুও কিছুক্ষণ পরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল—যখন চণ্ডীর শ্বশুরের নিকট হইতে বাসরে রাত্রি-জাগরণের জন্য একটি করিয়া মোহর মর্য্যাদাস্বরূপ তাহাদের প্রত্যেকের হাতে আসিয়া উঠিল। বহু বাসরে তাহারা রাত্রি-যাপন করিয়াছে, প্রচুর আনন্দ পাইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীর বিয়ের বাসরে যদিও তাহারা খুসী হইতে পারে নাই, কিন্তু বাসর-জাগরণের এমন উচ্চ দক্ষিণার কথা তাহারা কখনও শুনে নাই, তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে!

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে মায়ের হাতে মেয়ের কনকাঞ্জলি দিবার প্রথা। চণ্ডী এই প্রথার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিল। পিতলের একখানা থালায় চাল, সুপারি ও একটি টাকা রাখিয়া প্রথামত তাহাকে বলা হইল—মায়ের আঁচলে দিয়ে বল্, মা তোমার ঋণ শোধ ক'রে চললুম।

এ সময় সকল মেয়ের মনটি বিচ্ছেদের ব্যথায় আর্ত্ত হইয়া উঠে, চক্ষু দিয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটিতে থাকে। চণ্ডীরও দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তবে পল্লীগ্রামের সাধারণ মেয়েদের মত সে ক্রন্দনের প্রবল উচ্ছ্বাসে পরিজনদিগকে পর্য্যন্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, এ কথা কখনই বলা চলে না। মাতৃঋণ পরিশোধের কথা কয়টি তাহার কানে যেন তীক্ষ্ণ খোঁচার মত আঘাত দিল। সে উত্তর দিল—আমি ত ও-কথা বলতে পারবো না।

একাধিককণ্ঠে প্রতিবাদ উঠিল—ও মা, এ কি কথা রে চণ্ডী,

এ যে 'নেম কম্ম'—ঐ বলে মায়ের আঁচলে ঐ থালাশুদ্ধ সব দিতে হয়।

চণ্ডী উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল—মায়ের ঋণ কি কখনও শোধ হয় যে, এমন মিছে কথা বলব?

মায়ের ব্যথিত চিত্তটিও বুঝি মেয়ের কথায় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া তিনিই বিধান দিলেন—না, না, ও কথা তোকে বলতে হবে না—তুই শুধু বল্ যে—অন্নজলের ঋণ শোধ ক'রে চললুম।

চণ্ডী কহিল—এই একথালা চাল, গোটাকতক সুপারি আর একটি টাকাতেই তোমার অন্নজলের ঋণ শোধ হবে মা? তাও নিজে থেকেই ত দিচ্ছ আমাকে—তোমার হাতে দেবার জন্যে। না মা, আমি এ দিয়ে তোমার অন্নজলের ঋণ শোধ করতে পারবো না কিছুতেই।

তখন সকল বয়সের সমবেত সকল মেয়ের কণ্ঠগুলিই গভীর বিস্ময়ে কল্লোলিয়া উঠিল—ও মা, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা ত কখনও শুনি নি বাপু!

পূজার দালানের নীচেই প্রাঙ্গণটির উপর দুই বৈবাহিক এবং দুই পক্ষের ঘনিষ্ঠ মাতব্বররাও এই স্মরণীয় সন্ধিক্ষণটিতে সমবেত হইয়াছিলেন এবং হজুর বৈবাহিক যেন জোর করিয়াই সঙ্কোচের ব্যবধানটুকু আজ কাটাইয়া দিতেছিলেন। চণ্ডী তাহার আপত্তি অস্ফুটস্বরে ব্যক্ত করে নাই, সুতরাং প্রাঙ্গণে যাঁহারা অন্য কথার আলোচনায় উন্মনা ছিলেন, চণ্ডীর কথায় তাঁহারা প্রত্যেকেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। কথার আঘাতটি যথাস্থানে গিয়াই বাজিল। হরিনারায়ণবাবু উৎফুল্ল হইয়া উল্লাসের সুরে কহিলেন—খাসা কথা বলেছ মা তুমি, এই ত চাই! বরাবর যে ভুল হয়ে আসছে, সেইটেই যে চোখ বুজিয়ে চালিয়ে যেতে হবে, এমন কি কথা! ঠিকই ত, ঐ দিয়ে কি কখনও অন্নজলের ঋণ শোধ হ'তে পারে—তার 'ওপর কি না, যার শিল যার নোড়া, তাই দিয়ে তারই

দাঁতের গোড়া ভাঙ্গবার ব্যবস্থা! দাঁড়াও মা দাঁড়াও, এখনই এর উপায় আমি ক'রে দিচ্ছি; তুমি আমার মস্ত ভুল ধ'রে দিয়েছ মা—বাঃ! বাঃ!

বাড়ী শুদ্ধ সকলকে অবাক্ করিয়া দিয়া—বাহিরের ঘর হইতে জনৈক কর্ম্মচারিকে ডাকাইয়া হরিনারায়ণবাবু তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূর উপযুক্ত কনকাঞ্জলির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। করালীবাবু মিনতির ভঙ্গিতে বহু আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা টিকিল না। হরিনারায়ণবাবু হাসিয়া কহিলেন—মা চণ্ডীর মুখ দিয়ে যে যুক্তি আমরা শুনেছি বেহাই, তার খণ্ডন করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই। আর এ বিষয়ে আপনার আপত্তি বৃথা, এতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে? আপনি নিজের ইচ্ছায় আহ্লাদ ক'রে আপনার জামাতাকে রূপার থালায় ভ'রে এক রাশ টাকা সেই সঙ্গে আরও কত কি সামগ্রী যৌতুক দিয়েছেন, আমি ত প্রত্যাখ্যান করি নি কোনটি। তবে আমার বধূও যদি তার জননীর উদ্দেশে সত্যকার কনকাঞ্জলি দেয়, তা কেন গ্রাহ্য হবে না বলুন ত!

হরিনারায়ণবাবুর এমন যুক্তিযুক্ত কথার উপর কাহারও আর কথা তুলিবার সাহস হইল না। সুতরাং চণ্ডী শ্বশুর-দত্ত পাঁচ শত গিনি পূর্ণ থলিটি উজাড় করিয়া মায়ের উদ্দেশে রীতিমত কনকাঞ্জলি দিয়া কহিল—এখানকার অন্নজলের ঋণটুকুই শুধু শোধ ক'রে বিদায় নিচ্ছি মা।

সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর স্বর আর্ত্ত হইয়া উঠিল, দুই চক্ষুর উচ্ছ্বসিত অশ্রু বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত দুর্ব্বার হইয়া ছুটিল। সকলের চক্ষু তখন অশ্রুসিক্ত—কন্যার এ বিদায় দৃশ্য চিরদিনই সকল সংসারে সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী!

এ যে 'নেম কম্ম'—ঐ বলে মায়ের আঁচলে ঐ থালাশুদ্ধ সব দিতে হয়।

চণ্ডী উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল—মায়ের ঋণ কি কখনও শোধ হয় যে, এমন মিছে কথা বলব?

মায়ের ব্যথিত চিত্তটিও বুঝি মেয়ের কথায় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া তিনিই বিধান দিলেন—না, না, ও কথা তোকে বলতে হবে না—তুই শুধু বল্ যে—অন্নজলের ঋণ শোধ ক'রে চললুম।

চণ্ডী কহিল—এই একথালা চাল, গোটাকতক সুপারি আর একটি টাকাতেই তোমার অন্নজলের ঋণ শোধ হবে মা? তাও নিজে থেকেই ত দিচ্ছ আমাকে—তোমার হাতে দেবার জন্যে। না মা, আমি এ দিয়ে তোমার অন্নজলের ঋণ শোধ করতে পারবো না কিছুতেই।

তখন সকল বয়সের সমবেত সকল মেয়ের কণ্ঠগুলিই গভীর বিস্ময়ে কল্লোলিয়া উঠিল—ও মা, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা ত কখনও শুনি নি বাপু!

পূজার দালানের নীচেই প্রাঙ্গণটির উপর দুই বৈবাহিক এবং দুই পক্ষের ঘনিষ্ঠ মাতব্বররাও এই স্মরণীয় সন্ধিক্ষণটিতে সমবেত হইয়াছিলেন এবং হজুর বৈবাহিক যেন জোর করিয়াই সঙ্কোচের ব্যবধানটুকু আজ কাটাইয়া দিতেছিলেন। চণ্ডী তাহার আপত্তি অস্ফুটস্বরে ব্যক্ত করে নাই, সুতরাং প্রাঙ্গণে যাঁহারা অন্য কথার আলোচনায় উন্মনা ছিলেন, চণ্ডীর কথায় তাঁহারা প্রত্যেকেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। কথার আঘাতটি যথাস্থানে গিয়াই বাজিল। হরিনারায়ণবাবু উৎফুল্ল হইয়া উল্লাসের সুরে কহিলেন—খাসা কথা বলেছ মা তুমি, এই ত চাই! বরাবর যে ভুল হয়ে আসছে, সেইটেই যে চোখ বুজিয়ে চালিয়ে যেতে হবে, এমন কি কথা! ঠিকই ত, ঐ দিয়ে কি কখনও অন্নজলের ঋণ শোধ হ'তে পারে—তার 'ওপর কি না, যার শিল যার নোড়া, তাই দিয়ে তারই

দাঁতের গোড়া ভাঙ্গবার ব্যবস্থা! দাঁড়াও মা দাঁড়াও, এখনই এর উপায় আমি ক'রে দিচ্ছি; তুমি আমার মস্ত ভুল ধ'রে দিয়েছ মা— বাঃ! বাঃ!

বাড়ী শুদ্ধ সকলকে অবাক্ করিয়া দিয়া—বাহিরের ঘর হইতে জনৈক কর্ম্মচারিকে ডাকাইয়া হরিনারায়ণবাবু তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূর উপযুক্ত কনকাঞ্জলির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। করালীবাবু মিনতির ভঙ্গিতে বহু আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা টিকিল না। হরিনারায়ণবাবু হাসিয়া কহিলেন—মা চণ্ডীর মুখ দিয়ে যে যুক্তি আমরা শুনেছি বেহাই, তার খণ্ডন করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই। আর এ বিষয়ে আপনার আপত্তি বৃথা, এতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে? আপনি নিজের ইচ্ছায় আহ্লাদ ক'রে আপনার জামাতাকে রূপার থালায় ভ'রে এক রাশ টাকা সেই সঙ্গে আরও কত কি সামগ্রী যৌতুক দিয়েছেন, আমি ত প্রত্যাখ্যান করি নি কোনটি। তবে আমার বধূও যদি তার জননীর উদ্দেশে সত্যকার কনকাঞ্জলি দেয়, তা কেন গ্রাহ্য হবে না বলুন ত!

হরিনারায়ণবাবুর এমন যুক্তিযুক্ত কথার উপর কাহারও আর কথা তুলিবার সাহস হইল না। সুতরাং চণ্ডী শ্বশুর-দত্ত পাঁচ শত গিনি পূর্ণ থলিটি উজাড় করিয়া মায়ের উদ্দেশে রীতিমত কনকাঞ্জলি দিয়া কহিল—এখানকার অন্নজলের ঋণটুকুই শুধু শোধ ক'রে বিদায় নিচ্ছি মা।

সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর স্বর আর্ত্ত হইয়া উঠিল, দুই চক্ষুর উচ্ছ্বসিত অশ্রু বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত দুর্ব্বার হইয়া ছুটিল। সকলের চক্ষু তখন অশ্রুসিক্ত—কন্যার এ বিদায় দৃশ্য চিরদিনই সকল সংসারে সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী!

আট

পূজার দালানে যে সময় বিদায়-পর্ব্বের নিয়ম-কর্ম্ম চলিতেছিল, সে সময় বাড়ীর সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তাটির উপর এমন এক বিরাট মিছিল নানা জাতীয় বাদ্যভাণ্ডাদি ও যানবাহন সহ শ্রেণীবদ্ধ হইতেছিল, এ অঞ্চলে যাহা সত্যই অভূতপূর্ব্ব। বাজনা-বাদ্যের ঘটা না করিয়া বিনাড়ম্বরেই বিবাহ-বাড়ীতে বরাগমন হওয়ায় যাহারা বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, বিবাহের পরদিন বর-বিদায়ের সময় এই অপ্রত্যাশিত মিছিলের বাহার তাহাদিগকে শুধু যে চমৎকৃত করিয়া তুলিল, তাহা নহে, খেয়ালী জমিদারের উদ্দেশে এক বাক্যেই তাহাদিগকে সশ্রদ্ধ প্রশস্তি করিতে হইল—

"যা কিছু শুনেছি, যা কিছু বুঝেছি
তারো চেয়ে তুমি উপরে,
কামনা ভাবনা কল্পনা মোদের
পারে না ধরিতে তোমারে।"

কনকাঞ্জলি দিয়া সুসজ্জিতা বধূ বরের সহিত বাহিরে আসিতেই হরিনারায়ণবাবু বৈবাহিককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—পাকা দেখার দিনটিতে চণ্ডীমার কাছে বাক্‌বন্দী হয়ে আছি। তৈরী বিদ্যামন্দির দেখিয়ে যদি ওঁকে খুসী করতে পারি, তবেই না আমার নিষ্কৃতি। কাজেই এই সঙ্গেই এ বাড়ীর সকলকেই ওখানে পায়ের ধূলো দিতে হবে। মিছিলে এ জন্য পাল্কীর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কন্যাপক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলেও শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না। হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—আমরা ত আর কন্যাপক্ষকে সরাসরি বাগুলিতে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি না, তাঁদেরই কন্যার মন্দির-প্রতিষ্ঠা দেখে তাঁরা ফিরে আসবেন, এতে আর বাধা কি?

অগত্যা কোন বাধাই আর রহিল না। কন্যাপক্ষের পুরুষগণ সুসজ্জিত শকটে উঠিলেন, মহিলারা মূল্যবান কিংখাপের আস্তরণ-মণ্ডিত শিবিকার ভিতরে ঢুকিলেন। কেবল চণ্ডীর মা বাড়ীতে রহিয়া গেলেন। কন্যার হাতের কনকাঞ্জলি লইয়া কন্যার মা আর পিছনের দিকে না তাকাইয়াই চলিয়া যান, ইহাই প্রথা। পদ্ধতির কথা বুঝিয়া বৈবাহিক তাঁহাকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

এ দিকে যেমন বিবাহের সমারোহ চলিয়াছিল, বারোয়ারীতলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজনও তেমনি ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইতেছিল। বিবাহবাসর অপেক্ষা এইখানেই পল্লীবাসীদের আগ্রহ অধিক—একটি পক্ষের মধ্যেই পোড়ো জমির উপর একখানা ইমারত খাড়া করিয়া তোলা পল্লীঅঞ্চলে কতটা সম্ভবপর, হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী নির্দ্দিষ্ট দিনটির মধ্যে কি ভাবে তাহার পণ রক্ষা করিবেন, এই অদ্ভুত খেয়ালী মানুষটির যে সকল দুঃসাধ্য কার্য্য হেলায় সমাধা করিবার গল্প তাহারা এ পর্য্যন্ত শুধু কানেই শুনিয়াছে—এখন সত্যই তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটাইতে পারিবে কি না—এই সব কথাই প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া শ্যামাপুর গ্রামখানির সহিত চারিপার্শ্বের সন্নিহিত আরও দশখানি গ্রামের অধিবাসিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল। সকলেই বিপুল আগ্রহে আকাঙ্ক্ষিত দিনটির প্রতীক্ষা করিয়াছিল। বারোয়ারীতলার সুবিশাল প্রাঙ্গণের চারিদিকে সুউচ্চ কানাত দিয়া এমন সন্তর্পণে পরিবেষ্টন করা হইয়াছিল যে ভিতরের ইমারতের কাজ কি ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র আভাস পাইবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না—কাজেই জনসাধারণের কৌতূহল উচ্ছ্বসিত হইবারই কথা।

স্বদেশী ও বিদেশী বিবিধ বাদ্যের আবর্ত্তে সারা গ্রামখানি কাঁপাইয়া বিশাল মিছিল বারোয়ারীতলার সম্মুখে আসিতেই যুগপৎ কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং রঙ্গমঞ্চের যবনিকা যে ভাবে সহসা উপরে

উঠিয়া যায় সেইরূপ তৎপরতায় সেই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বের সু-উচ্চ কানাতগুলি একসঙ্গে খুলিয়া গেল। পরক্ষণে সুন্দর অঙ্গন-সমন্বিত বিচক্ষণ শিল্পীর পরিকল্পিত সদ্যঃসম্পন্ন মনোরম বিদ্যামন্দিরের নির্ম্মাণ-পারিপাট্য সকল কৌতূহলী চক্ষুকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

দুইটি সপ্তাহ পূর্ব্বেও যে পতিত জমিটির উপর পল্লীর গরু-বাছুর চরিয়া বেড়াইত, সেখানে আজ আরব্য রজনীর উপাখ্যানের মত এক আশ্চর্য্য অট্টালিকা যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অঙ্গনের সম্মুখেই বিদ্যামন্দিরের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী, তাহার দুইধারে দুইটি সুদীর্ঘ চাতাল অট্টালিকার উভয় প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সোপানশ্রেণীর উপরেই ভেলভেটের একখানি সুবৃহৎ পর্দ্দা দৃশ্যপটের মত পড়িয়া ছিল। কার্নিশের নিম্নেই বড় বড় হরফে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে—'মা চণ্ডীর বিদ্যামন্দির'।

দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া মিছিল থামিতেই হরিনারায়ণবাবু অগ্রবর্ত্তী হইয়া বর-বধূ ও কন্যাপক্ষীয়দের সহিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পর্দ্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৌতূহলী জনতায় বিশাল অঙ্গন তখন ভরিয়া গিয়াছে।

হরিনারায়ণবাবু বধূর দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিলেন—তোমার হাতের পরশ না পেলে এ পর্দ্দা ত উঠবে না মা, পর্দ্দাখানা তুলে তোমাকেই যে আগে প্রবেশ করতে হবে তোমার মন্দিরে।

চণ্ডীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া তখন যেন একটা অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ উঠিয়াছে। কোনও দিকে দৃকপাত না দিয়া সে তাহার হাতের কাজললতা-খানি প্রথমে কটিদেশে গুঁজিয়া রাখিল, তাহার পর সবল দুইখানি হাত দিয়া সেই বিশাল পর্দ্দাখানি গুটাইতে আরম্ভ করিল।

হরিনারায়ণবাবু হাসিয়া কহিলেন—মা আমার কিছুতেই পেছুতে চান না, নিজেই হাত লাগিয়েছেন কোনওদিকে দৃকপাত না করে।

ব্যাস্—মা, হয়েছে। তোমার স্পর্শটুকুই ছিল দরকার—এবার তুমি ছেড়ে দাও মা।

পুলির সাহায্যে পর্দ্দাখানি উপরে টানিয়া তুলিবার যথোচিত ব্যবস্থাই ছিল। পরক্ষণেই ক্ষিপ্রগতিতে সেখানি উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেই বিদ্যামন্দিরের সুসজ্জিত সুবৃহৎ হলঘরখানি সকলের চক্ষুর উপর প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইমারতের সংখ্যা এ অঞ্চলে নিতান্ত অল্প না হইলেও এই ধরণের প্রশস্ত দরদালানযুক্ত পরিচ্ছন্ন অট্টালিকা সম্পূর্ণ অভিনব। দালানখানি পত্র-পুষ্প ও নানাবিধ চিত্রপটে সুসজ্জিত, তাহার তিন দিকেই তিনখানি করিয়া বড় বড় ঘর, প্রত্যেক ঘরেই পালিস্ করা সারি সারি সুশ্রী বেঞ্চি, পুরোভাগে টেবিল ও শিক্ষয়িত্রীর কেদারা; দেওয়ালে কালো রঙের বোর্ড ও ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙ্গানো। হলে প্রবেশ করিতেই দুই পাশের দুইখানি ঘর অন্য প্রকারে সজ্জিত। একখানি ঘরে অফিসের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম; বড় বড় দুইটি আলমারীর মধ্যে খাতা কাগজ পেনসিল দোয়াত কালি কলম, নানা দেশের নানাবিধ মানচিত্র, রাশি রাশি শ্লেট, প্রাথমিক শিক্ষায় অপরিহার্য্য বিদ্যাসাগরের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, শুভঙ্করী, চাণক্য-শ্লোক, ঘরের এক পার্শ্বে অনেকগুলি চরকা প্রচুর তূলা প্রভৃতি। অপরপার্শ্বের ঘরখানির দরজা ও জানালা কয়টি বাদ দিয়া সর্ব্বস্থান আলমারীতে ভরা। তবে আলমারীগুলি ঘরের দেওয়াল-গুলি ভরাইয়া তুলিলেও তাহাদের গহ্বরগুলি তখনও পুস্তকে ভরিয়া উঠে নাই।

চণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়াই সকলে হলে প্রবেশ করিলেন। হরিনারায়ণবাবু ধীরে ধীরে বধূর অনুগমন করিতে করিতে কহিলেন—বুঝতেই পেরেছ মা, তোমার এই স্কুলটির নামকরণ হয়েছে—মা চণ্ডীর বিদ্যামন্দির। কেমন মা, ঠিক নাম হয় নি?

চণ্ডীর মুখখানি তখন পরিতৃপ্তির উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দেখ মা, মানুষ লোকের দৃষ্টিতে যতই হেয়, দুর্ব্বল বা অসহায় হোক না কেন, তার নামটি যদি হয় সবল আর নির্ম্মল, তা হ'লে সেখান থেকে যে প্রার্থনা ওঠে শ্রীভগবানের উদ্দেশে তা কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে না ; তাঁরই প্রেরণায় তখন উপযুক্ত লোক ছুটে আসে তার সেই কাজটুকু উদ্ধার ক'রে দিতে। নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে ত তুমি তাঁর দোরে প্রার্থনা পাঠাওনি মা, দেশের দুঃখমোচনের জন্য —দশের কল্যাণের কথা ভেবে কোমল হৃদয়টি তোমার দুলে উঠেছিল, দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল, ভগবান্ কি স্থির হয়ে থাকতে পারেন মা ! এই যে পাঠশালা-প্রতিষ্ঠা, এর মূলে তোমারই মনের গভীর সাধনা ; —তুমি যে মা স্বয়ংসিদ্ধা।

নয়

বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াই চণ্ডী নানা সূত্রে শুদ্ধান্তের সর্ব্বময়ী রাণী মাধুরী দেবীর চিত্তে দারুণ বিরাগ সৃষ্টি করিয়া বসিল।

বিবাহ-রাত্রিতে বাসরে নির্ব্বোধ স্বামীর মুখে তাহার জীবন-পদ্ধতি শুনিয়া চণ্ডী মনে মনে শ্বশুরালয়ে তাহার কর্ম্মপদ্ধতির একটা খসড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, প্রতিপক্ষদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্যামাপুরে আসিয়া অবধি বরাবরই সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে, এ জন্য কত নিন্দা কত অনুযোগই না তাহাকে শুনিতে হইয়াছে ; কিন্তু সে কোনও দিকেই দৃকপাত করে নাই। বাসরে স্বামীর মুখে যে কাহিনী সে শুনিয়াছে, তাহার সহিত কত বড় বিপদ, কত বিপ্লব, কত সব কলহের সম্ভাবনা যে জড়াইয়া

রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে চণ্ডীর বিলম্ব হয় নাই। স্বামীর যেখানে কোনও সম্মান নাই, কিছুমাত্র আদর নাই, কোনওরূপ প্রতিষ্ঠা নাই—দরিদ্রের কন্যা সে, সেই—স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া সেখানে চলিয়াছে ; কি ব্যবহার পাইবে, তাহার আত্মমর্য্যাদার উপরেও আঘাত আসিবে কি না, কে বলিতে পারে ! এই সব ভাবিয়াই চণ্ডী তাহার সঙ্কল্প আগে হইতেই স্থির করিয়া লইয়া বাশুলীর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিল।

কিন্তু প্রাসাদের ভিতর রাণী মাধুরী দেবীর প্রতাপের অন্ত ছিল না। প্রাসাদের কর্ত্তা তাঁহার অসংখ্য প্রজা ও সেরেস্তার কর্ম্মচারীদের মুখে 'হুজুর' সম্বোধন শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, রাজা আখ্যা তিনি পছন্দ করিতেন না। কিন্তু খেতাবধারী রাজার কন্যা মাধুরী দেবী স্বামীর এই ত্যাগটুকুকে খ্যাতিলাভের পথে একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, এবং স্বামীর এই ত্রুটিটুকুর পরিপূরণ করিতে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় নাই। সংসার-তরণীখানির হাল ধরিয়াই তিনি শুদ্ধান্তের সকলকে জানাইয়া দিলেন, বাপের বাড়ীতে তিনি ছিলেন রাজকন্যা—এখানে রাণী। সুতরাং এক কর্ত্তা ভিন্ন সকলের মুখেই গুঞ্জন উঠিল—রাণী-মা। মায়ের খ্যাতির অংশে পুত্রও বঞ্চিত হইল না, রাণীর ইচ্ছানুসারে পুত্র নিবারণ খোকা-রাজা আখ্যা পাইল।

গোবিন্দের বিবাহপ্রসঙ্গে রাণী প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার মনে এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, বধূ দরিদ্রের মেয়ে, এখানে আসিয়াই অবাক হইয়া যাইবে, ঐশ্বর্য্য তাহার দুই চক্ষু ঝলসিয়া দিবে ; এ রকম মেয়েকে দাসী বাঁদীর মত পদানত করিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না। সুতরাং মনের ভাব গোপন রাখিয়া গোবিন্দের বিবাহে মুখে তিনি খুবই উৎসাহ দিলেন, আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহার মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত গভীর মর্ম্মব্যথাটুকুও সকলকে শুনাইয়া দিলেন—ছেলেটা পাগল ব'লে, একটা যা তা ঘরের গরীবের মেয়ে আসছে তার বউ হয়ে ! মেয়েটারও

ঝকমারী, না পারবে ভরসা ক'রে মিশতে—পায়ে পায়ে জড়িয়ে মরবে; ছেলেটারও হবে নাকালের একশেষ। আশ্রিতা, আত্মীয়া, অনাত্মীয়া, পাচিকা, পরিচারিকা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা ও বয়সের মেয়েরাও রাণীর দেখাদেখি গরীবের এই মেয়েটির ভাগ্যের কথা ভাবিয়া একটি করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ভুল করে নাই।

কিন্তু প্রথম দর্শনেই বধূর কুণ্ঠাশূন্য প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানি মাধুরী দেবীর দৃঢ়চিত্তে সংশয়ের একটা নিবিড় রেখা টানিয়া দিল। নববধূসুলভ অপরিসীম লজ্জা ও আড়ষ্টতার প্রভাব কাটাইয়া সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই বধূ যখন প্রাসাদের সিংহদ্বারে চতুর্দ্দোলা হইতে নামিল, বাগুলী-প্রাসাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নানা নিদর্শনই সেখানে বিকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু রাণী নিষ্পলক-নয়নে দেখিলেন, দরিদ্রের এই মেয়েটির চক্ষু দুইটি চক্ষুচমৎকারী ঐশ্বর্য্যের কোনও দিকেই আকৃষ্ট নহে; বরং তাহার দৃষ্টিতে যেন দম্ভের একটা ভঙ্গি ও মুখে তাহারই আভাস পরিস্ফুট। অথচ তাহার দিক দিয়া শিষ্টাচারের কোনও অভাব দেখা গেল না। মাধুরী দেবী বধূর চরণ দুইখানির উপর প্রথা অনুযায়ী হরিদ্রা-বারি ঢালিবামাত্রই বধূ তৎক্ষণাৎ নত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় দিল, তাহার পর যুক্ত হাত দুইখানি ললাটে তুলিয়া স্মিত-বদনে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াই সম্মুখে আস্তৃত রক্তবর্ণ বনাতমণ্ডিত পথে বরের পার্শ্ব-বর্ত্তিনী হইয়া অসঙ্কোচে অগ্রসর হইল, কাহাকেও কোলে তুলিয়া লইবার অবসর দিল না। মাধুরী দেবীই শুধু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখিলেন, অন্যের অলক্ষ্যে অপূর্ব্ব কৌশলে বধূ তাহার জড়প্রকৃতি বরটির পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে চালনা করিতেছে। সেই মুহূর্ত্তেই স্তব্ধ বিস্ময়ে রাণী উপলব্ধি করিলেন—এ বংশের বধূর অধিকারটুকু পাইয়াই যেন এই অদ্ভুত মেয়েটি অতীতের যাহা কিছু সমস্ত মুছিয়া ফেলিয়া মহিমময়ী রাজ্ঞীর মতই পুরীর ভিতরে চলিয়াছে—রাজ্য তাহার বুঝিয়া লইতে! মাধুরী দেবীর মনে পড়িল,

বধূর বয়সে তিনিও ঠিক এইভাবে এই তেজোদৃপ্ত মনোবৃত্তি লইয়া এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

পরিজনদের উপর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলির ভার দিয়া নিজের মহল্লায় নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া মাধুরী দেবী শয্যার আশ্রয় লইলেন। পরিচারিকারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। উপাধানের উপর মুখখানি চাপিয়া বহুক্ষণ তিনি নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন। নিজের অজ্ঞাতে অবিরল অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত হইতে তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বসিলেন, অঞ্চলে চক্ষু দুটি মুছিয়া নিজের মনে কহিলেন—'ছি, ছি, এ আমার হ'ল কি? এক রত্তি একটা মেয়েকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভেবে আমি কেঁদে সারা হচ্ছি!' জোর করিয়া নিজের দেহখানিকে টানিয়া রাণী অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেখানে উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত বিশাল পুরীর সৌন্দর্য্য তাঁহার দুই চক্ষুর উপর যেন দুর্ভেদ্য ধূম্রজাল রচনা করিতেছিল। তখন তাঁহার কণ্ঠের অস্ফুট স্বর প্রশ্নের মত শুনাইল—দোষ কার? এ কি প্রকৃতির প্রতিশোধ?

অস্থিরপদে সুদীর্ঘ অলিন্দে কিছুক্ষণ পদচারণার পর পুনরায় রাণী স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তকণ্ঠের পুনরুচ্ছ্বাস—দুর্জ্জয় পণের জন্যই না আমার এই পরাজয়! নিবারণের পাশেই ত আজ এই বধূটির দাঁড়াইবার কথা! তৎক্ষণাৎ কর্ত্তার মুখের কথা দৈববাণীর মত তাঁহার কানে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—গাধাবোটখানাকে টেনে নিয়ে যাবে বলেই এই ষ্টীমলঞ্চের ব্যবস্থা। রাণীর বুকখানি অমনই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি যেন কল্পনার দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছিলেন—এই তেজীয়ান্ ষ্টীমলঞ্চের সহায়তায় গাঙ্গুলী-পরিবারের অকর্ম্মণ্য গাধাবোটখানি ধীর-মন্থরগতিতে বাগুলীর রাজ-গদী লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে! শিহরিয়া দুই হাতের করপুটে মাধুরী দেবী নিজের ম্লান মুখখানি লুকাইলেন।

পরক্ষণে কানে বাজিল নিবারণের নিদারুণ তীক্ষ্নস্বর—মা! শুনেছ নতুন বৌএর আস্পর্দ্ধার কথা!

নিজের মর্ম্মব্যথা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চকিতভাবে মা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন, অপ্রতিহতপ্রভাব পুত্রের এমন ব্যথাতুর বিবর্ণ মুখ তিনি কোনও দিন দেখেন নাই। তাঁহার ওষ্ঠে কথা স্ফুরিত হইল না, কিন্তু দুই চক্ষুতে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল।

নিবারণ কহিল—দেখাশোনার সময় বাবা না-কি বউকে একগাছা চাবুক দিয়ে বলেছিলেন, এই দিয়ে একটা গাধাকে সায়েস্তা করতে হবে। খেলার আসরে বউ সবার সামনে বলেছে—সে গাধা আমি। আমাকেই সে খুঁজছিল।

মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে সকৌতুক হাসির ঝিলিক তুলিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন—আজকের দিনের কথা কি গায়ে মাখতে আছে পাগল! তুই হচ্ছিস্ দেওর, তাই ঠাট্টা করছে বউ।

নিবারণ কঠিনস্বরে কহিল—আমি ত আর ঠাট্টা বুঝি না। ওকে ঠাট্টা বলে না, দিব্যি ঝাঁঝিয়ে ও কথা বলেছে, তেজ দেখিয়েছে; আমিও তোমাকে ব'লে রাখছি মা, এ তেজ যদি না ভাঙ্গতে পারি—আমি খোকা-রাজা নই।

মাধুরী দেবী স্তব্ধ-বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিলেন, নিবারণকে ডাকিয়া ফিরাইতে বা প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

দশ

রাণীর নিকট নিবারণ বধূর বিরুদ্ধেই একতরফা অভিযোগ করিয়া গেল এবং অভিযুক্তের শাস্তির ব্যবস্থা সে যে নিজের হাতেই করিবে, সে কথা-টুকুও দম্ভের সহিত ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করিল না। কিন্তু সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে সে নিজেও যে কতখানি অপরাধী, সেকথা সে নিজেও যেমন চাপিয়া গেল, প্রত্যক্ষদর্শীর দলও তেমনই খোকা-রাজার অপরাধ সম্বন্ধে নিরুত্তরই রহিল। যাহাদের সাহস একটু বেশী ও উচিতবক্তা বলিয়া কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, তাহারা এ প্রসঙ্গে যে নির্ভীক এজাহার দিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—গোড়ার দিকে খোকা-রাজার কথাগুলো একটু মুখ-আল্‌গা-গোছের হয়েছিল। কিন্তু তা না হয় হ'ল; তা ব'লে কি টস্ দেখিয়ে অমন ক'রে কথা বলা বউ-মানুষের মুখে সাজে? হাজার হোক্, তুই ত বাছা গরীবের ঘরের মেয়ে, তার ওপর বিয়ের কনে, আর উনি হচ্ছেন ঘরের ছেলে—রাজপুত্তুর।

কিন্তু এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির প্রকৃত বিবরণ এইরূপ :—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় তরুণী-সমাজে চাঞ্চল্য উঠিল। বেশ বুঝা গেল, সে স্থলে এমন কোনও মাতব্বর ব্যক্তির আগমন হইতেছে, যাহার সম্বন্ধে অধিকাংশ মেয়ের মনে লজ্জার অন্ত নাই। বিভিন্ন কণ্ঠ হইতেই চাপা স্বরের অস্ফুট নির্দ্দেশ—খোকা-রাজা! খোকা-রাজা! এতক্ষণ যাহারা ঘোমটা খুলিয়া অসঙ্কোচেই আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল, আগন্তুকের নামেই তাহারা শশব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল।

বধূ এতক্ষণ অবনতমুখী হইয়া নির্দ্দেশমত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলিতে লিপ্ত ছিল। সাপের নাম শুনিলে মানুষ যে ভাবে চমকিত হইয়া উঠে, খোকা-

রাজা নামটি শুনিতেই বধূও ঠিক সেইরূপ সচকিত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিল। বিবাহ-বাসরে স্বামীর মুখের কথাগুলি তখনও সে ভুলে নাই—'খোকা-রাজা তা হ'লে পিঠের চামড়া আমার আস্ত রাখবে না, এক একদিন যা মারে!' সেই লোকটি আসিতেছে তাহারই সম্মুখে!

ভাবভঙ্গি, গতিবিধি ও সর্ব্বাঙ্গে আভিজাত্যের নানা নিদর্শন লইয়া সেই সুবৃহৎ হলটির ভিতর দেখা দিল খোকা-রাজা নিবারণ। তরুণীদের সঙ্কোচ-ভাব ও সহসা অবগুণ্ঠনবতী হইবার প্রয়াস তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। রুক্ষস্বরে সে কহিল—আমি কি বাঘ যে আমাকে দেখেই সবাই ভয়ে জড়সড়!

আরও কি বলিতে যাইতেছিল নিবারণ, কিন্তু ঠিক এই সময় নববধূর দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত হইল তাহার বিচিত্র চক্ষুযুগলের বিষম সংঘাত! বিচিত্র চক্ষু বলিবার অর্থ এই যে, নিবারণের দুই চক্ষুর তারকায় বিড়ালের চক্ষুর মত অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায় এবং ইহাই এই সুন্দর সুগঠিতদেহ তরুণ যুবকটির আকৃতিগত একটা বিষম খুঁত অথবা বিশেষত্ব।

তাহাদেরই তালুকের এক সাধারণ প্রজার মেয়ে এ বংশের বধূর মর্য্যাদা লইয়া আসিয়াছে—কিন্তু বংশের কলঙ্ক বিকৃতমস্তিষ্ক বড়-খোকার পার্শ্বে বধূটি কেমন খাপ খাইয়াছে, তাহা দেখিতেই সদম্ভ কৌতূহলে খোকা-রাজার এই মহিলা-মজলিসে আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আসিবামাত্রই এ ভাবে বধূর সহিত তাহার চোখোচোখি হইবে ও বধূ সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। বধূর সঙ্কোচশূন্য প্রখর দৃষ্টি, সুন্দর সপ্রতিভ মুখ ও সর্ব্বাঙ্গে অনবদ্য সুষমা নিবারণের মস্তিষ্কের ভিতর কেমন একটা জ্বালা ধরাইয়া দিল। ক্ষণকাল বধূর দিকে বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা

বিদ্রূপের সুরে সে কহিল—খাসা বউ ত বাগিয়েছে আমাদের গবা পাগলা—তবে এটা ঠিক বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালার মতই মানিয়েছে!

পরের বাড়ী, অপরিচিত স্থান, চারিধারে অনাত্মীয়ের সমাবেশ, নিজের অসহায় অবস্থা সেই মুহূর্ত্তেই চণ্ডী সমস্ত ভুলিয়া গেল; যে নিষ্ঠুর মানুষটির কদর্য্য চিত্র সে মানসপটে কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে চাক্ষুষ দেখিবার জন্যই তাহার চক্ষু দুইটি অবাধে বিস্ফারিত হইয়া উঠে। কিন্তু দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে সেই মানুষটি তাহাকেও অভদ্রের মত এরূপ আঘাত দিবে, এ ধারণা তাহার মনে আসে নাই। উত্তেজনায় চণ্ডীর সর্ব্বাঙ্গে শিরায় শিরায় তখন রক্ত উষ্ণ হইয়া ছুটিয়াছে, মনের ভিতরের সমস্ত জ্বালাটুকু তাহার দুইটি চক্ষুতে তখন দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; সেই প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়াই কিন্তু সে শিহরিয়া উঠিল। দেখিল, সে মুখ একেবারে নিষ্প্রভ, ছাইয়ের মত বিবর্ণ; সর্ব্বাঙ্গ তাহার থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। মুখে কোনও কথা নাই, কিন্তু দুইটি কাতর চক্ষুর আর্ত্ত দৃষ্টিতে একটা অব্যক্ত আতঙ্ক যেন ফুটিয়া উঠিতেছে!

স্বামীর সহিত চোখাচোখি হইতেই একটি মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া চণ্ডী তাহার উত্তেজনাদীপ্ত মুখখানি নত করিল, সেইসঙ্গে আস্তে আস্তে মাথার উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

বর-বধূর সান্নিধ্যেই বসিয়াছিল নিবারণের মাতুল-কন্যা মৃণালিনী। সপ্তদশী তরুণী, রূপও তাহার প্রচুর; বেথুনে পড়িয়া একটা পাশও করিয়াছে। সহরের অভিজাত ঘরের আদপ-কায়দা পদে পদে সে মানিয়া চলে। একে ত মৃণালিনী খেতাবধারী রাজার আদরিণী নাতনী, স্বামীও কেউকেটা নয়—নামজাদা ব্যারিষ্টারের ছেলে এবং নিজেও ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাতে পড়াশুনা করিতেছে! এ অবস্থায়

পল্লী অঞ্চলে মহিলা-সমাজে সর্ব্বক্ষণই মৃণালিনীর নাকটি উঁচু করিয়া থাকিবার কথা—যাহার তাহার সহিত সে বড় একটা কথা কহে না, নিজের মর্য্যাদা দম্ভের সহিত রক্ষা করিতে সে সর্ব্বদা সচেতন। রাণী মাধুরী দেবী এই স্পর্দ্ধিতা ভ্রাতৃকন্যাটিকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। তিনি বলেন—আভিজাত্যের অহঙ্কারটুকুই বড় ঘরের মেয়েদের একটা উঁচু রকমের সৌন্দর্য্য। বিলাত হইতে স্বামী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই সৌন্দর্য্যময়ী ভাইঝিটিকে রাণী সযত্নে নিজের কাছেই রাখিয়াছেন।

বধূকে সহসা অবগুণ্ঠন টানিতে দেখিয়া মৃণালিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—কথার এমনি খোঁচা দিলে দাদা যে, বউ একেবারে লজ্জাবতী লতা!

বধূর দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া নিবারণ কহিল—কোথায় ওঁকে দেব বাহবা—ওঁর সাহস দেখে, কিন্তু উনিও শেষে ওঁদের দলে ভিড়ে গেলেন—মেপে একটি হাত ঘোমটা, একবারে কলাবউ!

মৃণালিনী নিবারণের কথায় সায় দিয়া হাসিমুখে কহিল—তাই ত, এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা হ'ল!

সহর্ষে নিবারণ কহিল—ঠিক বলেছিস্ মিনা, অমন ক'রে চোখ মেলে দেখবার পর ও লজ্জা এখন আর খাটবে না, ওকে বাতিল করাই চাই; ঘোমটাখানা তুই খুলে দে আগে।

মৃণালিনী নিবারণের কথায় তাহার দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিতে বধূর হাতখানি তাহার কনুইটির উপর হেলিয়া পড়িল; পরমুহূর্ত্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ মৃণালিনীর সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, নিদারুণ যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ তুলিল—মা গো!

তাহার ফিটের ব্যামো ছিল, সকলেই ভাবিল, মৃণালিনীর ফিট হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তিনীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু একটু পরেই তাহার সে ভাব কাটিয়া গেল, সে প্রকৃতিস্থ হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূর দিকে সংশয়াতঙ্কদৃষ্টিতে চাহিল।

নিবারণ কহিল—কি হ'ল তোর মিনা, অমন ক'রে নেতিয়ে পড়লি যে!

মৃণালিনীর দেহখানি তখনও ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কণ্ঠের স্বরও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। মৃদুস্বরে সে উত্তর দিল—বউএর ঘোমটাখানি ধ'রে যেই তুলতে যাব, অমনি একটা ঝাঁকুনি পেলুম সর্ব্বাঙ্গে; কে যেন শিরাগুলো জোর ক'রে টানা-হেঁচড়া করতে লাগলো। ভাবলুম, ফিট বুঝি এলো, কিন্তু তা নয়। আমার মনে হয়, বউ কিছু কারসাজি করেছে।

নিবারণ ব্যঙ্গের স্বরে কহিল—তা মিছে নয়, শুনেছি কবরেজের মেয়ে, তুক-তাক হয় ত অনেক কিছুই জানে। কিন্তু তুই যে ভয়ে স'রে এলি, ঘোমটাখানা খুলে দিলি নি!

মৃণালিনী কহিল—আবার! আমার দ্বারা হচ্ছে না দাদা, ইচ্ছা হয় তুমি নিজে খুলে দাও।

নিবারণ স্বর তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল—ঘোমটাখানি নিজেই খুলবে, না আমাকেই খুলে দিতে হবে নিজের হাতে?

বধূ নির্ব্বাক, নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত নিশ্চল। শ্লেষের স্বরে নিবারণের পুনরায় প্রশ্ন—গোড়ায় তীরটি ছুঁড়ে তারপর হঠাৎ এমন বৈরাগ্য কেন শুনি?

মৃণালিনীও এবার ঝঙ্কার দিয়া কহিল—ঢং দেখে আর বাঁচি নে! দেওরকে দেখে এতই যদি লজ্জা, চোখের পর্দ্দা তুলে অমন ক'রে আগেই চেয়েছিলে কেন শুনি?

অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বধূর কণ্ঠস্বর এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—কেন অমন ক'রে চেয়েছিলুম তখন, তাই জানতে চান?

বধূর কথায় সকলেরই মনে গভীর বিস্ময়, বিপুল কৌতূহল।

বধূ দৃঢ়স্বরে কহিল—বাবা আমাকে দেখতে গিয়ে একটা চাবুক যৌতুক দিয়েছিলেন।

কাহারও মুখে কথা নাই, বধূর কথা শুনিতে সবাই উৎকর্ণ।

বধূ কহিল—বাবা বলেছিলেন, তাঁর বাড়ীতে একটা বেয়াড়া গাধা আছে, তাঁর দেওয়া চাবুক দিয়ে তাকে সায়েস্তা করতে হবে। সেই গাধাটাকে দেখবার জন্তেই আমি অমন ক'রে চেয়েছিলুম।

বধূর মুখের কথা শুনিয়া সকলেই একেবারে স্তব্ধ! অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া তরুণীরা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে দেখিতেছিল—নিবারণের সুন্দর মুখখানির উপর কে যেন এক ঝলক কালি ঢালিয়া দিয়াছে।

এগারো

গাঙ্গুলী-বংশের প্রথা, কুশণ্ডিকার পর গৃহিণী ও পুরবাসিনীগণ শঙ্খধ্বনি ও পূত গঙ্গাবারির ধারার সহিত সুসজ্জিতা বধূকে শুদ্ধান্তের কোষাগারে লইয়া যান। সেই কক্ষে এক অতিকায় লৌহময় সিন্দুকের মধ্যে দুর্লভ রত্নরাজি ও স্বর্ণময় মাঙ্গলিক দুষ্প্রাপ্য বহুবিধ সামগ্রী সুরক্ষিত। শুভক্ষণে কুলবধূর সম্মুখে সেই বিরাট সিন্দুকটির বিশাল ডালা উদ্ঘাটিত হইলে বধূকে শ্রদ্ধাসহকারে ভিতরের রত্নরাজি ও স্বর্ণময় দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে হয়।

কুশণ্ডিকা-অন্তে শুভ লগ্নে মাধুরী দেবী ও পুরমহিলাগণ রীতিমত শোভাযাত্রা করিয়াই নববধূ চণ্ডীকে লইয়া কোষাগারে বিশালকায় রুদ্ধ

সিন্দুকটির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পাশাপাশি কতিপয় সুদৃঢ় কীলকাবদ্ধ সুবৃহৎ তালায় মহাকায় সিন্দুকের ডালা রুদ্ধ ছিল।

কর্তার আদেশ মত বালক ভৃত্য দুর্গাদাস শৃঙ্খলাবদ্ধ চাবিগুচ্ছ আনিয়া তালাগুলি খুলিয়া দিল। অন্য সময় এই মহাসিন্দুক খুলিবার প্রয়োজন হইলে কর্তার খাস ভৃত্য পালোয়ান পঞ্চানন চাবির তাড়া লইয়া আসে এবং সেই-ই তালাগুলি খুলিয়া গুরুভার ডালা তুলিয়া ধরে।

দুর্গাদাস তালাগুলির চাবি খুলিয়া দিয়া, ডালার কীলক মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই মাধুরী দেবী বিরক্তির স্বরে প্রশ্ন করিলেন—পঞ্চা যে এল না, ডালা তুলবে কে?

দুর্গাদাস সবিনয়ে জানাইল—রাজাবাবু ব'লে দিলেন, পালোয়ান দিয়ে সিন্দুকের ডালা তোলবার দরকার হবে না!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রাণী কহিলেন—তা হ'লে তুই এই ডালা তোলবার মত লায়েক হয়েছিস্ বুঝি?

ভীতিপূর্ণ স্বরে বালক কহিল—আমি! আমার ক্ষ্যামতা কি, রাণী-মা—যে ঐ পেল্লয় ডালা তুলব! দু-হাতে চাড়া দিয়ে চারটি আঙ্গুলও উঁচু করতে পারব না ত, রাণী-মা!

কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করিয়া রাণী কহিলেন—তা হ'লে তোর রাজাবাবুকে গিয়ে বল্ যে, পালোয়ান দিয়ে ডালা তোলবার দরকার যদি না থাকে, তিনি নিজে এসেই ডালাখানা তুলে দিয়ে যান।

চণ্ডী স্থির হইয়া দুই পক্ষের কথাই শুনিতেছিল, ডালা তোলা সম্বন্ধে রাজাবাবুর প্রচ্ছন্ন মনোভাবটি বুঝিয়া সে মনে মনে হাসিল। কিন্তু নিজের মনোভাব গোপন করিয়া শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল—বাবা তো ভালো কথাই বলেচেন, মা, সিন্দুকের ডালা তুলতে মেয়েমহলে পালোয়ানের কি দরকার? আমরা তুলতে পারব না?

স্বামীর কথায় মাধুরী দেবীর মনটা অভিমানে ভরিয়া উঠিয়াছিল, বধূর যুক্তি শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, বড় বড় দুইটী চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া তিনি বধূর দিকে চাহিলেন মাত্র। বাক্য স্ফুরিত না হইলেও সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অর্থ দুর্ব্বোধ্য ছিল না।

সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির অর্থ কথায় ব্যক্ত করিল তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা মৃণালিনী। বিদ্রূপের সুরে সে বধূকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—কথা কইতে হয় বউদি, দশ জনের সামনে হিসাব ক'রে—আগ্-পাছ্ ভেবে! এ তোমার বাপের বাড়ীর আমকাঠের সিন্দুক নয় যে, গায়ের জোরে ডালা চাগিয়ে তুল্‌বে!—এ 'দু'মোণি' ডালাখানা আমাদের তুলতে হ'লে দু'টি বছর আদা-ছোলা খেয়ে ডন-বৈঠক কসতে হবে।

আরক্ত মুখখানিতে অপূর্ব্ব হাসির লহর তুলিয়া বধূ উত্তর দিল—তোমার কথাগুলি সবই সত্য, ঠাকুরঝি, কিন্তু আসল কথাই তুমি ভুলে গিয়েছ; সে কথাটি হচ্ছে এই—এ বংশের বধূর মর্য্যাদা নিয়ে এ ঘরে আসতে হ'লে এই কুলবস্তুটির ডালাখানি নিজের হাতে তোলবার যোগ্যতাটুকু তাকে আনতে হবে। বাবার নির্দ্দেশটুকু মাথায় নিয়ে তাঁরই আশীর্ব্বাদে—বাপের বাড়ীর এমোসিন্দুক-খোলা-হাতেই শ্বশুরবাড়ীর এই লোহার সিন্দুকটার ডালাখানা আমিই তুলে দিচ্ছি—পালোয়ান ডাকবার সত্যই কোনও দরকার হবে না।

দিব্যি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অগ্রসর হইয়া চণ্ডী সেই মহাসিন্দুকটির কীলকমুক্ত অতিকায় ডালাটি দুই হাতে তুলিয়া স্বচ্ছন্দে কক্ষের দেওয়ালের আশ্রয়ে হেলাইয়া রাখিল।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার গৃহিণী—শুদ্ধান্তের রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ়া-তরুণী-কিশোরী-নির্ব্বিশেষে প্রায় অর্দ্ধশত পুরমহিলা ও তাহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা পাচিকা ও পরিচারিকাগণ নববধূর কাণ্ড দেখিয়া অবাক-বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; সত্যই কি বধূ স্বহস্তে এই

বিশাল সিন্দুকটির গুরুভার ডালাটি তুলিল, কিম্বা এই বংশের কুলদেবী বধূর কোমল হাত দু'খানি আশ্রয় করিয়া তাহার মুখ রক্ষা করিলেন! মৃণালিনীর মুখখানি ছায়ের মত বিবর্ণ, রাণীর দৃপ্ত মুখে অতৃপ্তের কালিমা। বালক ভৃত্য দুর্গাদাস বধূর উদ্দেশে হেঁট হইয়া কক্ষতলে মাথা ঠুকিয়া কহিল—আপনাকে গড় করছি বউরাণী-মা, এমনটি কুত্থাও দেখি নাই।

চণ্ডী কাহারও স্তুতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া গৃহিণী মাধুরী দেবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—এখন কি করতে হবে, মা?

গৃহিণী এ পর্য্যন্ত নববধূকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া আসিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা অল্পই হইয়াছে, একান্ত প্রয়োজনসূত্রে যে দুই চারিটি কথা তিনি কহিয়াছেন এবং বধূ সেই কথার সূত্রে যে উত্তর দিয়াছে, তাহা তাঁহার ভাল লাগে নাই। এ কক্ষে চাবিসহ ভৃত্য দুর্গাদাসের আগমন, তাহার উক্তি, সেই প্রসঙ্গে বধূর আচরণ প্রত্যেকটিই যেন তাঁহাকে আঘাত দিবার জন্য ঘটিয়া গেল। সমস্ত রোষটুকু তাঁহার কর্ত্তার উপর গিয়া পড়িল। এই সময়ে বধূর প্রশ্ন যেন তাঁহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাবটুকু বদলাইবার জন্য হাসির ভান করিয়া কহিলেন—সেই কথাই ত ভাবছি অবাক হয়ে মা—আগে জানা থাকলে পাড়ার মেয়েদের নেমন্তন্ন ক'রে এ ঘরে এনে ঐ হাত দু'খানার শক্তিটুকু দেখাতুম।

চণ্ডী একটু হাসিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিল—এর জন্য ভাবনাই বা কেন মা, শুনেছি আজ রাতে হাজার মেয়ে আসবেন নেমন্তন্ন খেতে, আমাকে সে সময় ছেড়ে দেবেন তাঁদের পরিবেশন করতে, তাতেই তাঁরা এই হাত দু'খানার শক্তি দেখতে পাবেন; এর চেয়ে সেটা আরও ভালো দেখাবে, আর তাতে আপনাদের কাজেরও সাশ্রয় বড় কম হবে না, মা।

মাধুরী দেবীর মুখের হাসিটুকু ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল! গম্ভীর হইয়াই এবার তিনি কহিলেন—ভাল, এই ব্যবস্থাই না হয় তখন হবে। এখন ত এ ঘরের কাজটুকু সারা হোক।

অতঃপর তিনি সিন্দুকের অভ্যন্তরে রক্ষিত দুর্লভ রত্নরাজির উপর বধূর করস্পর্শে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যুগপৎ শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে গাঙ্গুলী-সংসারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মুখরিত হইয়া উঠিল।

বার

বিবাহ-বাসরে প্রথম আলাপনের পর এই বিচিত্র দম্পতি কথোপ-কথনের আর অবসর পায় নাই, সে অবসর আসিল ফুলশয্যার মধুময় নিশায়।

শুদ্ধান্তের যে অংশে গোবিন্দের মা থাকিতেন, সেই সুবৃহৎ মহলটি নববধূর জন্য সংস্কার করাইয়া কর্ত্তার নির্দ্দেশমত সাজানো হইয়াছিল। মাধুরী দেবী এ বাড়ীতে বধূরূপে পদার্পণ করিয়া অল্পকালই এই মহলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, স্বামীর চিত্ত হইতে লোকান্তরিতা পত্নীর স্মৃতিটুকু নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য নিজেই জেদ করিয়া শুদ্ধান্তের অপরাংশে আধুনিক পরিকল্পনায় তাঁহার বাসোপযোগী স্বতন্ত্র একটি মহল নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন।

অব্যবহৃত পরিত্যক্ত মহলটি দীর্ঘকাল পরে নূতন শ্রী, মনোরম সজ্জা ও প্রচুর দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া নবদম্পতির সম্বর্দ্ধনা করিতেছিল। নিজের মহলটির ব্যবস্থা দেখিয়া চণ্ডীর মন তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। শয়ন-ঘরে বিচিত্র পালঙ্কের উপর অপূর্ব্ব শয্যা, তাহার আস্তরণ ও উপাধানগুলি

পুষ্পময়। কক্ষতলে পারস্যদেশীয় মূল্যবান গালিচা আস্তৃত, কক্ষের দেয়ালে বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ মনোজ্ঞ আলেখ্য, দরজার সম্মুখেই দেওয়াল জুড়িয়া এক বিশাল তৈলচিত্র—অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী এক হাস্যাননা নারীর পরিপূর্ণ অবয়ব সেই চিত্রে প্রতিফলিত; কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া মনে হয়, চিত্রাঙ্কিতা নারীমূর্ত্তি মধুর হাস্যে অভ্যাগতদের সাদর আহ্বান করিতেছেন! নানাজাতীয় দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য পুষ্পসম্ভারে এই বৃহৎ শয়নমন্দিরটির অভ্যন্তর ও বাহিরের সুপ্রশস্ত দরদালান পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত; কক্ষতলে আস্তৃত গালিচার উপর ছোট ছোট ধাতুময় কারুকার্য্যখচিত আধারগুলি পুষ্পসম্ভারে পূর্ণ।

শয়নঘরের এক পার্শ্বে পুস্তকাগার, বড় বড় সুদৃশ্য আলমারি ভরা বিবিধ পুস্তক—মধ্যস্থলে টেবল, চারিপার্শ্বে কেদারা; ইহার পরেই বসিবার ঘর, সুন্দর কৌচ ও সোফায় সে ঘর সজ্জিত। অপর পার্শ্বে মনোহর প্রসাধন-কক্ষ, বিবিধ বিলাসসম্ভার কক্ষের বায়ুকে সুরভিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার পার্শ্বে-ই দম্পতির ভোজন-ঘর, অদূরে প্রশস্ত উন্মুক্ত ছাদ, চারিপার্শ্বে ফুলের টব, নিম্নে সুরম্য উদ্যান।

উপন্যাসের রাজান্তঃপুরিকাদের স্বতন্ত্র প্রাসাদ-কক্ষের যে কাহিনী এক সময় চণ্ডীর মনে কল্প-লোকের সৃষ্টি করিত, নিজের মহলে আসিয়া এই প্রথম সে অনুভব করিল যে, কল্পিত কাহিনীও সত্য হয়।

সুসজ্জিতা দম্পতির সহিত অনেকগুলি তরুণীরও ফুলশয্যার কক্ষে সমাগম হইয়াছিল। আচার অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইলেও ইহাদের স্থান-ত্যাগের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বধূর মুখখানি বিরক্তিতে বিকৃত হইয়া উঠিলেও ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই; বধূর অনেক কথাই ইহারা অবাক্ হইয়া শুনিয়াছে, কিন্তু বরের সহিত বধূ কি ভাবে কথা কহে, এ পর্য্যন্ত ইহাদের কেহই তাহা শুনে নাই, সুতরাং শুনিবার এই স্পৃহাটুকু মিটাইতে ইহারা যেন জোর করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছিল। মৃণালিনীই

এখন এ বাড়ীর সকল ক্ষেত্রেই অগ্রবর্ত্তিনী, সে নিজেই কথাটা খপ্ করিয়া পাড়িয়া ফেলিল, কহিল—এখন তোমরা দুটিতে গোটাকতক কথা কইলেই আমরা ছুটি পাই, আর উৎসবটাও মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়, বৌদিদি!

বধূ কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু এ বাড়ীতে যে মানুষটিকে কাহারও কথার পিঠে কোনও দিন একটি কথা কহিতেও কেহ দেখে নাই, সেই নিরীহ মানুষটি সহর্ষে বলিয়া উঠিল—তোমরা তা হ'লে কিচ্ছু জান না—বিয়ের রাতেই আমাদের ত কত কথা হয়ে গেছে, সে বুঝি গোটাকতক? ওরে বাবা! সে অনে-ক—সারারাত ধ'রে কত ভালো-ভালো গপ্পো—

গোবিন্দের কথার সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদের মুখে মুখে কৌতুকের হাসি যেন বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। মৃণালিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—বল কি গবা-দা, এত কথা হয়ে গেছে তোমার বাসরে, গপ্পো পর্য্যন্ত! ও—বাবা!

গোবিন্দের মুখ-চোখ তখন উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, গভীর উল্লাসের সুরে সে কহিল—সে গপ্পো যদি শোনো, একেবারে তাক্ লেগে যাবে। সব চেয়ে ভালো, সেই যে রাজকন্তে বিন্তেবতীর গপ্পোটা—কি মজার গপ্পো সেটা—ওঃ!

মৃণালিনী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল—কে গপ্পো বল্লে গবা-দা, বউ না তুমি?

গোবিন্দ সগর্ব্বে উত্তর দিল—ঐ যে—

এতক্ষণে বধূর সহিত গোবিন্দের চোখোচোখি হইল। বধূ অসহিষ্ণু-ভাবেই স্বামীর দিকে পুনঃপুনঃ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল, কিন্তু কথা কহিবার উৎসাহে বধূর মুখের দিকে চাহিবার অবসর তাহার ছিল না। চোখোচোখি হইতেই বধূর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সংঘাতে গোবিন্দের উৎসাহ

মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল, পরক্ষণেই স্বর নিম্ন ও আর্ত্ত করিয়া সে কহিল—ও বাবা, তুমিও আবার চোখ দিয়ে ধমকাচ্ছো!

গোবিন্দের কথায় তরুণীরা সকলেই হাসিয়া উঠিল, মৃণালিনী বধূর দিকে চাহিয়া কহিল—বৌদি বুঝি তা হ'লে বে'র রাতেই আমাদের গবাকান্ত ভাইটির বুদ্ধির স্প্রিংএ পাক-কতক দম খাইয়ে দিয়েছিলে?

বধূ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে কহিল—কি সূত্রে এত বড় আবিষ্কারটি ঠাকুরঝির বুদ্ধি ভরা মাথায় গজিয়ে উঠল শুনি!

কথাটায় মনে মনে আঘাত পাইলেও সে ভাব গোপন করিয়া সহজ সুরেই মৃণালিনী উত্তর দিল—কথা বলবার ধরণ দেখেই গো! যে লোক সাত চড়েও কথা কইত না, আজ সে ওপরপড়া হয়ে কথা কইতে আসে! এতে মনে হয় না কি, তোমার হাতের গুণে কিংবা স্পর্শের প্রভাবে এমনটি হয়েছে।

বধূ একটু হাসিয়া কহিল—তোমাদের ভাইটিকে তোমরাই যদি সাধ ক'রে মায়াকাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে থাকো, তারপর একটা শুভ-লগ্নে হঠাৎ সোণার কাঠির পরশ পেয়ে ঘুম তাঁর ভেঙ্গে যায়, সে দোষ ত আমার নয়, ঠাকুরঝি!

বধূর কথা এক মুহূর্ত্তে সকলকেই নির্ব্বাক করিয়া দিল; মৃণালিনী আসিয়াছিল তাহাকে খোঁটা দিয়া খাটো করিতে, কিন্তু নিজেই আঘাতের পর আঘাত পাইয়া ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এতগুলি মেয়ের সম্মুখে সে অপ্রতিভ হইয়া যাইবে! সুতরাং মুখের কথায় বিশেষ জোর দিয়াই সে এবার কহিল—দোষের কথা কেন হবে বৌদি, এ-ত খুব গৌরবেরই কথা গো! হবুকান্ত রাজার ছিল গবুকান্ত মন্ত্রী, এবার আমরাও পেলুম—গবাকান্ত ভাইটির পরশ-পাথর বউটি!

বধূ হাসিমুখে কহিল—কিন্তু এর পরে সত্যি সত্যিই যদি পুকুর চুরি হয়, তা হ'লে যেন দোষ দিয়ো না, ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝির মুখে এবার উত্তর যোগাইল না, উত্তর আসিল বাহির হইতে তাহারই উদ্দেশে—চুপ ক'রে রইলি কেন মিনা, বল্ না তুই—ও ভয় এখানে মোটেই নেই, কবরেজের মেয়েরা বড় জোর ওষুধ চুরি করতে পারে।

বাহিরের দিকে চাহিতেই সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নিবারণ! তরুণীদের অনেকেই শশব্যস্ত হইয়া অবগুণ্ঠন টানিল, মৃণালিনীর মলিন মুখখানি উৎসাহে উজ্জল হইয়া উঠিল। নিবারণের কথায় সায় দিয়া সে এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—দাদা ঠিক কথাই বলেছে, বউদি। জমিদারের মেয়ে যদি হ'তে, তা হ'লে তোমার মুখে পুকুর চুরির কথা সাজতো।

সকলকে চমকিত করিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বধূ কহিল—কথা হচ্ছিল ঠাকুরঝি আমাদের মধ্যে, এখানে বাপ-পিতামহকে টেনে আনবার কোনও দরকার ত ছিল না!

আরক্তমুখে মৃণালিনী নিবারণের মুখের দিকে চাহিতেই চকিতের মধ্যে তাহাদের চোখে চোখে কি কথা হইয়া গেল, পরক্ষণেই মৃণালিনী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কহিল—ছোট মুখে উঁচু কথা বললেই বংশের খোঁটা সকলেই দিয়ে থাকে। যার বাপ নাড়ী টিপে বড়ী বেচে খায়, তার মুখে বড় বড় কথা মানায় না।

ভ্রাতা ভগিনীর অশিষ্ট ব্যবহার ও রূঢ় কথায় বধূর দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, মৃণালিনীর মুখের উপর দুই চক্ষু তুলিয়া, মুখের কথায় বিশেষ জোর দিয়াই সে কহিল—আমার বাবা বৃত্তি হিসেবে ওষুধের বড়ী বেচে খান, এ কথা খুব সত্য, কিন্তু দেনার দায়ে মেয়ে বেচে বংশকে তিনি খাটো করেন নি কোন দিন! এ দিক্ দিয়ে প্রকাণ্ড শূন্য ঘড়ার চেয়ে ক্ষুদ্র পূর্ণ ঘটীর মর্য্যাদা অনেক বেশী।

নিজের কথাগুলি রূঢ় হইলেও বধূ যে তাহার উত্তরে এমন নিষ্ঠুর

আঘাত করিবে, তাহার মুখখানি নীচু করিয়া দিবে, মৃণালিনী এতটা ভাবে নাই। এ বাড়ীতে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই যে বধূ এ বংশের সকল তথ্যই জানিয়াছে, ইহাও সে জানিত না। বিবর্ণ মুখখানি তুলিয়া একান্ত অসহায়ের মত সে নিবারণের দিকে চাহিল।

নিবারণও আজ প্রস্তুত হইয়াই বধূর সহিত বোঝাপড়া করিতে আসিয়াছিল। তাহার পতৃবংশ ও পিতার বৃত্তির প্রসঙ্গ তুলিয়া অপ্রতিভ করিয়া দিবে এবং এই সূত্রে রূঢ় কথা শুনাইয়া সে-দিনের অপমানের প্রতিশোধ লইবে, ইহাই ছিল নিবারণের তরুণ চিত্তের উদ্দাম বাসনা। কিন্তু কথার সূত্রে বধূর পিতার প্রসঙ্গ উঠিতেই বধূ তাহার উত্তরে যে সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া বসিল, তাহার লক্ষ্যস্থল কে—মৃণালিনীর ন্যায় নিবারণেরও তাহা বুঝিতে বলম্ব হয় নাই। তবে মৃণালিনী নিরুপায়ের মত নিবারণের দিকে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিবারণ বধূর এই স্পর্দ্ধায় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চীৎকার তুলিয়া নির্ব্বোধের মত কহিল—কাকে ঠেস্ দিয়ে ছোটমুখে এত বড় কথা তুমি বললে, তা জান?

চণ্ডী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—আমি কাউকে ঠেস্ দিয়ে বা কারুর নাম নিয়ে এ কথা বলি নি; কথায় কথায় যারা উঁচু বংশ নিয়ে গলাবাজি করে, আমি তাদের জানাতে চেয়েছি—প্রদীপের নীচেই অন্ধকার বেশী, উঁচু বংশও অনেক সময় নীচু কাজ ক'রে লোক হাসায়, কাজেই বংশ নিয়ে বড়াই করা মস্ত ভুল!

চণ্ডীর কথাগুলি নিবারণকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিল, সে এবার দুই চক্ষু পাকাইয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল—তুমি এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করছ, কিন্তু এ চালাকী খাটবে না তোমার! আমি বলছি, তুমি আমার মাতামহকে ঠেস্ দিয়েই এ কথা বলেছ। বল নি তুমি—বল নি?

নিবারণের গর্জ্জনে ত্রস্ত হইয়া মেয়েরা বধূর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু

ভয়ের কোন চিহ্নই তাহার মুখে দেখা গেল না। পূর্ব্ববৎ অবিচলিত কণ্ঠে স্বর অপেক্ষাকৃত কঠিন করিয়া সে কহিল—আপনার মাতামহের নাম ধ'রে আমি কোনও কথা বলি নি, আপনিই তাঁর কথা তুললেন। এখন আমি বলছি, সত্যিই যদি তিনি এমন কাজ ক'রে থাকেন, তাঁর নাতি-নাতনীর সে জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত।

কি! তুমি আমার দাদামশায়ের কাজের বিচার করতে চাও?

আমার বাবার বৃত্তি নিয়ে খোঁটা দেবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে—আমি যদি এ কথা জিজ্ঞেসা করি?

তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের রাজাপ্রজা সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে চর্চ্চা করবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

তা হ'লে আমারও উত্তর শুনে রাখুন, মানুষের মতই আমি রাজার মুখোসপরা মানুষগুলোর অন্যায়ের প্রতিবাদ করব চিরদিন!

মৃণালিনী এই সময় সবেগে নিবারণের একখানি হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিল—চুপ কর দাদা, আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে কাজ নেই, এ মেয়ের সঙ্গে কথায় তুমি পারবে না।

নিবারণ তখন রাগে ফুলিতেছিল, এ দিকে উত্তর দিবার মত কথার পুঁজিও তাহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। আলোচ্য বিষয়ের মোড় ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে সে এবার ঝঙ্কার তুলিল—এ রকম আস্পর্দ্ধা সহ্য করা যায় না, সেদিনও তুমি আমাকে সকলের সামনে গাধা বলেছিলে!

চণ্ডী চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সেই কক্ষের সকলকে চমকিত করিয়া নিবারণের কথায় উত্তর দিল গোবিন্দ; ঘৃণায় মুখখানি বিকৃত করিয়া সে কহিল—কেন বলবে না গাধা? দাদাকে পাগল বললি, বউএর ঘোমটা খুলে দিতে গেলি, চেঁচিয়ে সবার কানে তালা ধরিয়ে দিলি—তুই গাধা নস্ ত কি?

দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া বধূ স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। নিবারণের

সহিত মৃণালিনীর আবার দৃষ্টি-বিনিময় হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ শ্লেষের স্বরে কহিল—গবা পাগলাও কপচাতে শিখেছে দেখছি—ম'রে যাই, ম'রে যাই! মুখের ভারী দৌড় যে—বে'র জল প'ড়ে অবধি পিঠে বেত পড়ে নি—তাই বুঝি এত ঝাঁঝ?

গোবিন্দের মুখ আজ খুলিয়া গিয়াছে। নিবারণের কথার পিঠে আজ সে অকুতোভয়ে উত্তর দিল—সাধে কি বউ তোকে গাধা বলেছে। এক ঘর মেয়েমানুষের ভিতর দাঁড়িয়ে তুই সকলকে শুনিয়ে বলছিস কি না—বড় ভাইকে মারিস্! তুই গাধা—গাধা; আমার ইচ্ছে করছে, কাগজের একটা গাধার টুপী বানিয়ে তোর মাথায় পরিয়ে দিই—বেশ মানায় তা হ'লে, আর আমরা সকলে পেছনে পেছনে হাত-তালি দিয়ে বলি—তুই গাধা, তুই গাধা—

চণ্ডী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এই সময় আবার চোখোচোখি হইতেই তাহার উৎসাহে সহসা বাধা পাইল, সে বুঝিল—নিজেও সে গাধার মত চেঁচাইয়া দোষ করিয়া ফেলিয়াছে; মনের উচ্ছ্বাস তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া মুখের কথাও বন্ধ করিল।

কিন্তু নিবারণের উৎসাহ তখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ পর্যন্ত সে জ্যেষ্ঠকে শাসন করিয়াই আসিয়াছে, আজ সে বধূর অঞ্চল ধরিয়া তাহাকে সকলের সমক্ষে হেয় করিয়া দিবে! তাহার দুই চক্ষু দৃপ্ত হইয়া উঠিল, বধূর উপর সঞ্চিত রোষটুকু গোবিন্দের উপর প্রয়োগ করিয়া সে তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—আজ তোর কান দুটো ধ'রে এই ঘরে ঘোড়-দৌড় করাব, রাস্কেল!

নিবারণের কথায় বধূর অন্তর যেন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, প্রকাশ্যে একটুখানি হাসিয়া সে কহিল—ঘোড়-দৌড়ের মাঠই আপনার যোগ্য স্থান; কিন্তু মনে রাখবেন, এটা ময়দান নয়, ভদ্র-ঘরের মেয়েরা এখানে আপনার আচরণে

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। রীতিমত সভ্যতা ও ভদ্রতা শিক্ষা ক'রে তবে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে হয়, এ বিবেচনাটুকুও আপনার নেই!

নিবারণ মারমুখী হইয়া হুঙ্কার দিয়া কহিল—কি বলব, তুমি কনে-বউ, মেয়েমানুষ, নইলে—

কণ্ঠের স্বরটুকু তরল করিয়া পরিহাসের সুরে বধূ কহিল—কি করতেন? কান ধ'রে ঘোড়-দৌড় করাতেন বোধ হয়? সেদিন আপনাকে উদ্দেশে গাধা বলেছিলুম, কিন্তু আজ আপনার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, গাধাটাকে ছোট করা হয়েছে।

মৃণালিনী এই সময়ে ক্রন্দনের সুরে চীৎকার তুলিয়া কহিল—দাদা, তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি ক'রে আঘাত সহ্য করবে? আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে দেব না, কিছুতেই না, তুমি চল—

নিবারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া কহিল—আমি বুঝতে পেরেছি, কার জোরে এত বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে ওর! কিন্তু আমি ব'লে যাচ্ছি, এ দর্প আমি ভাঙ্গবই—যে ওকে মাথায় তুলেছে, সেই-ই দু পায়ে থ্যাঁৎলাবে কালই। হাঁ, এখানে যাঁরা যাঁরা আছেন, মিনা, তুই তাঁদের নাম দিবি, সবাইকে সাক্ষী দিতে হবে বাবার কাছে।

কথাগুলি শেষ করিয়াই খরদৃষ্টিতে একবার বধূর দিকে চাহিয়া নিবারণ টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বধূ হাসি-মুখে দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিল—মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত! কিন্তু ভাইটিকে আগেই কেন এই উপদেশটুকু দাও নি, ঠাকুরঝি!

মৃণালিনী মুখখানি ভার করিয়া কহিল—মোল্লাকেও চেন নি, আর তার মসজিদের মারপ্যাঁচও দেখ নি, দেখবে শীগ্‌গীর; তখন চোখের জলে পায়ের আলতা পর্য্যন্ত ধুয়ে যাবে।

চণ্ডী সবেগে ছুটিয়া গিয়া মৃণালিনীর কাঁধটি এক হাতে ধরিয়া অপর হাতে তাহার মুখখানি চাপা দিয়া পরিহাস-ভঙ্গিতে কহিল—মুখ সামলে ঠাকুরঝি, মুখ সামলে! আজ আমাদের ফুলশয্যার রাত, হাসি ছাড়া অন্য কথা মুখে আনাও পাপ, অতএব সাবধান!

মৃণালিনীর সর্ব্বাঙ্গ তখন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে—না পারে ঘাড়টি নাড়িতে, মুখ দিয়া কথা বলিবারও সামর্থ্য নাই, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত নির্ব্বাক্‌দৃষ্টিতে সে বধূর দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই কাঁধ হইতে হাতখানি সরাইয়া বধূ তাহাকে মুক্তি দিল। তাহার পর সে তরুণীদের দিকে চাহিয়া কহিল—আপনারা ঠাকুরঝির সঙ্গে গিয়ে নামগুলো লিখিয়ে দিন, সাক্ষীর সমন যাবে আপনাদের কাছে।

তরুণীদের ভিতর হইতে একজন কহিল, আমরা ত এখন আপনারই কোটে, এই সময় ঘুসটুস দিয়ে হাত ক'রে ফেলুন, বৌদি।

বধূ কহিল—ঠাকুরপো আগেই আপনাদের সাক্ষী মেনে গেলেন শুনলেন না? আপনারা তাঁর তরফেই সাক্ষী দেবেন, আমার সাফাই সাক্ষী আছে।

এই সময় মৃণালিনী প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—বউ আমার গায়ে হাত দিয়েছে, মুখ চেপে ধরেছে, তোমরা তো দেখেছ, রাজাবাবুর কাছে একথা বলতে হবে তোমাদের।

তরুণী-সমাজে তখন চাঞ্চল্য দেখা গেল, কেহ কেহ বিরক্তির সুরে কহিল—কি ঝকমারিই করেছি বাবা ফুলশয্যের ঘরে এসে।

নানা কণ্ঠে গুঞ্জন তুলিয়া তরুণীদল মৃণালিনীর সহিত চলিয়া গেল। চণ্ডী এতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইল।

তের

সকলে চলিয়া গেলে ক্ষণকাল পরে বধূও বাহিরের দিকে গেল। এই মহলের প্রবেশদ্বারে দুই জন পরিচারিকা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বধূকে দেখিয়াই তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল—কি চাই, বউরাণী-মা?

বধূ কহিল—কিছু চাই না, তোমরা এখন ঘুমাতে যাও। তাহারা বিস্ময়ে জানিতে চাহিল—রাতে যদি দরকার পড়ে—আমাদের সারা রাত পালা ক'রে এখানে জেগে থাকবার কথা। একজন ঘুমোবে, একজন জাগবে।

বধূ জানাইল—কোনও প্রয়োজন নেই এ ভাবে তোমাদের রাত কাটাবার। দরকার পড়ে, আমি নিজেই তা সেরে নেব, আমি ত ঠুঁটো নই—তোমরা যাও।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাহারা চলিয়া গেল। বধূ স্বহস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। গোবিন্দ তখন পালঙ্কের উপর গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। বধূ আস্তে আস্তে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, পরিপূর্ণ শান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

গোবিন্দ এতক্ষণ মনে মনে বিচার করিতেছিল, সে যে আজ এত কথা কহিয়া ফেলিল, তাহা কি ভাল হইয়াছে, কিম্বা সে অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে! চণ্ডীর স্থির মূর্তি ও শান্ত দৃষ্টি দেখিয়া সাহস পাইয়া সে নিজের সংশয় ভঞ্জন করিতে ব্যগ্র হইল, আগ্রহের সহিত চণ্ডীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তুমিই বল না, কথা ব'লে আমি ভাল করেছি, না মন্দ করেছি?

বধূ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল—তুমি নিজে বুঝতে পারছ না, ভাল করেছ কি মন্দ করেছ ?

গোবিন্দ নিরুত্তরে চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ম্লান দৃষ্টি যেন প্রকাশ করিতেছিল—আমি যদি বুঝতে পারব, তা হ'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব কেন ?

বধূ স্বামীর মুখভঙ্গিটির দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—বাসরের কথা কে তোমাকে বলতে বলেছিল ? মেয়েগুলোর মুখে ঠাট্টা শুনেও তোমার হুঁস হয় নি !

ওহো ! তাই তুমি তক্ষুনি আমাকে চোখ দিয়ে ধমক দিয়েছিলে ! কিন্তু তুমি ত আমাকে বারণ ক'রে দাও নি—বাসরের কথা কাউকে বলতে নেই। তা হ'লে আমি কক্‌খনো বলতুম না। আর ত বল্‌ব না।

মনের কথা মুখে সব বলতে নেই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সব কথা হয়, অপর কাউকে শোনাতে নেই। আজ থেকে আমার সম্বন্ধে কোনও কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না, আমি তোমাকে যা যা বলব, সে সব মনের ভেতর ছিপি এঁটে রাখতে হবে, বুঝেছ ?

বুঝেছি—বুঝেছি—বউএর কথা কাউকে বলতে নেই, তা হ'লে মন্দ হয় ; আমি আর কাউকে কক্‌খনো বলব না।

বেশী কথা না বলাই ভাল ; যা বলবে, ভেবে চিন্তে বলবে ! তোমার একটি কথায় আজ আমি ভারি খুসী হয়েছি।

খুসী হয়েছ—সত্যি ? বাঃ—বাঃ ! কি মজা !

কিন্তু জিজ্ঞাসা ত করলে না—কোন্ কথাটা ?

বল না, বল না,—লক্ষ্মীটি ! বল না—

ঠাকুরপো গাধার কথা তুলতে, তুমি প্রথম যে জবাবটি দিয়েছিলে। বেশ বলেছিলে।

বলব না ! আমার তখন যা রাগ হয়েছিল !

তোমার মনে তা হ'লে রাগও হয় ?

আগে ত হ'ত না, কিন্তু এখন হয়, কেউ যদি তোমাকে কিছু বলে অমনি রাগ আসে। রাগের মাথায় আমি কি করতুম আজ জানি না, কিন্তু তুমি যে আবার ধমকে দিলে চোখ দুটো পাকিয়ে—

তুমি অভদ্রের মত ভারী বাড়াবাড়ি ক'রে ফেল্‌লে। মেয়েদের সামনে হাততালি দিয়ে অমন চেঁচালে যে নিন্দে হয়।

আচ্ছা, আমি আর কখনও মেয়েদের সামনে চেঁচিয়ে কথা বলব না।

আজ আমাদের ফুলশয্যা, তা জান ত ?

তা আর জানি না ? অত ঘটা, ঘরে এত ফুল—

আচ্ছা, ঐ বড় ছবিখানা বোধ হয় তোমার মায়ের ?

হাঁ, ঐ ত আমার মা।

তোমার ওঁকে মনে পড়ে ?

কি ক'রে পড়বে মনে ? আমি যে তখন ছোট্টটি ছিলুম, মা যখন স্বর্গে যান—

এ ঘরের আর সব ছবির গলাতেই আজ মালা চড়ানো হয়েছে, শুধু আমাদের মায়ের ছবিখানিই খালি দেখছি ; বলতে পার কেন ?

কি জানি ! হয় ত ভুলে গেছে।

কিন্তু আমাদের ত এই ভুলটুকু শুধরে নিতে হবে। ঘরে ত মালার অভাব দেখছি না, তুমি ওঠ এখনি, নিজের হাতে মায়ের গলায় মালা পরিয়ে দাও।

অভিভূতের মত গোবিন্দ পালঙ্ক হইতে উঠিল। কক্ষের বিভিন্ন আধারে প্রচুর মালা ছিল, চণ্ডী নিজে বাছিয়া কয়েক ছড়া গোড়ে স্বামীর হাতে দিল, পার্শ্বের ঘর হইতে নিজেই একখানা কেদারা আনিয়া ছবির সম্মুখে রাখিল, গোবিন্দ তাহার উপর দাঁড়াইয়া মায়ের আলেখ্যটির উপর মালাগুলি চড়াইয়া দিল।

কেদারাখানি সরাইয়া চণ্ডী স্বামীর হাত ধরিয়া সেই আলেখ্য-সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া কহিল—এসো, আমরা দু'জনে এই শুভরাতটিতে আগে আমাদের মায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি; ভক্তির সঙ্গে বলি, মা! আমাদের মনে বল দাও, তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা যেন সত্যকার মানুষ হ'তে পারি।

পুরোহিতের মন্ত্র শুনিয়া ব্রতী যে ভাবে তাহা আবৃত্তি করে, চণ্ডীর মুখের কথাগুলি সেই ভাবেই গোবিন্দ ভাবগদ্-গদস্বরে উচ্চারণ করিল। চণ্ডী কহিল—রোজই সকাল সন্ধ্যায় এই ভাবে আমরা এই মন্ত্র পড়ব, তারপর আমরা মানুষের মত মানুষ হবার কঠোর সাধনা করব।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসুনয়নে চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, শেষের কথাগুলি তাহার ঠিক বোধগম্য হয় নাই। চণ্ডী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল —আমার কথা বোধ হয় বুঝতে পার নি, কিন্তু মুখে বললে বুঝতে হয় ত পারবেও না; কাজের সঙ্গে সঙ্গে সব কথাই তুমি ক্রমে ক্রমে নিজেই বুঝতে পারবে। তখন হয় ত আমাকেও অনেক কথা তুমি বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু সেই বোঝাপড়ার গোড়াপত্তন হবে আজ এই শুভ রাতটিতে। আজ থেকেই আমাদের সাধনার পথে হাতে খড়ি। চল, আমরা পড়বার ঘরে যাই।

যেন তাহার মাথার উপর আর কেহ নাই, সেই-ই এই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, এমনই সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে অসঙ্কোচে চণ্ডী মন্ত্রমুগ্ধ স্বামীর হাতখানি ধরিয়া পড়িবার ঘরটির দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

এক

সেরেস্তার কাজ-কর্ম্ম চুকিয়া গেলেও খাস-কামরায় দেওয়ানজীর সহিত হুজুরের কথাবার্ত্তা তখনও শেষ হয় নাই। প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ার উপর দেহভার রক্ষা করিয়া হরিনারায়ণবাবু সুদীর্ঘ সটকায় সুগন্ধি তাম্রকূট সেবনের ফাঁকে ফাঁকে হাসিমুখে পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে মুখরোচক কথাগুলি উদ্গীরণ করিতেছিলেন, ফরাসের প্রান্তভাগে বসিয়া দেওয়ান রাধানাথ বাপুলি সেগুলি উপভোগ করিতে অখণ্ড মনোযোগ দিয়াছিলেন। এমন সময় মুখখানি বিষম গম্ভীর করিয়া নিবারণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মুখের কথা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া কর্ত্তা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নিবারণের মুখের দিকে চাহিলেন। নিবারণ নিত্যই নিয়মিতরূপে সেরেস্তায় হাজিরা দেয়, তাহার স্বতন্ত্র কামরায় বসিয়া আংশিক কার্য্যও সম্পন্ন করে। প্রত্যহ বিভিন্ন মহাল হইতে যে সকল অভিযোগ ও আবেদনপত্র সদরের সেরেস্তায় আসিয়া থাকে, নিবারণ সেগুলি পড়িয়া তাহাতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া দেয়; অতঃপর খোদ হুজুর দেওয়ানজীর সহযোগিতায় তাহাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন। এ দিন নিবারণ সেরেস্তায় তাহার কামরায় আসিয়া বসে নাই; তাহার অনুপস্থিতির সংবাদ হরিনারায়ণবাবুর অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং অসময়ে তাঁহার কামরায় নিবারণের উপস্থিতি ও তাহার গুরুগম্ভীর মুখভঙ্গি এই বিচক্ষণ ভূস্বামীর মুখে সংশয়ের রেখা

ফুটাইয়া তুলিল। ক্ষণকাল নিবারণের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন—এমন অসময়ে যে নেমে এলে, নিবারণ? শুনলুম সেরেস্তায়ও আজ বস নি, শরীর ভাল আছে ত?

নিবারণ তাহার স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষস্বরেই উত্তর দিল—আজ্ঞে হাঁ, শরীর আমার ভালই আছে, তবে মনটা মোটেই ভাল নেই; সেই জন্যই সকালের দিকে নীচে আর নামতে পারি নি, ওপরেই আপনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম, দেরী দেখে অগত্যা এখানেই এলুম।

এমনভাবে এক নিশ্বাসে নিবারণ কথাগুলি বলিয়া গেল, যেন এই কয়টি কথাই তাহার বক্তব্য বিষয়ের মুখবন্ধমাত্র, আসল কথাগুলি প্রচ্ছন্ন হইয়াই আছে এবং সেগুলি ব্যক্ত করিবার জন্যই এমন অসময়ে পিতার খাস-কামরায় তার আগমন।

বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই শিকারী তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারে। পুত্রের মুখভঙ্গি ও কথায় প্রচ্ছন্ন অভিমানের নির্দ্দেশ পাইয়াই তীক্ষ্ণদর্শী বর্ষীয়ান পিতার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, এমন অসময়ে কোনও প্রীতিকর প্রসঙ্গ লইয়া সে নীচে নামিয়া আসে নাই। পুত্রের প্রকৃতি পিতার অবিদিত ছিল না, সুতরাং মুখে কৌতূহলের কৃত্রিম ভাবটুকু প্রকাশ করিয়া কোমল স্বরে প্রশ্ন করিলেন—কোনও বিশেষ কথা তা হ'লে আছে বোধ হয়?

নিবারণ উত্তর দিল—আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা কহিলেন—দাঁড়িয়ে কেন তাহলে, ব'স—আর কথাগুলোও শীগ্‌গীর শেষ ক'রে ফেলো; বেলাও অনেক হয়েছে, অথচ ও-গুলো শোনবারও কৌতূহল হচ্ছে।

বক্রদৃষ্টিতে দেওয়ানজীর দিকে তাকাইয়া নিবারণ অপ্রসন্নভাবে কহিল—আমার কথা উপস্থিত আপনার সঙ্গে, আপনাকেই বলতে চাই!

নিবারণের কথার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী তাঁহার বপুখানি নাড়া দিয়া কুণ্ঠার সহিত কহিলেন—আমি তা হ'লে এখন উঠি, আপনাদের কথাবার্ত্তা চলুক।

হাত তুলিয়া বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—বিলক্ষণ! আমাদের আগেকার কথাই যে এখনও শেষ হয় নি বাপুলী, তুমি উঠবে কি রকম?

পরক্ষণে পুত্রের দিকে মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন—তুমি ত জান নিবারণ, আমার এষ্টেট বা ঘরের এমন কোনও কথা নেই, যা তোমার কাকাবাবুর সামনে বলা চলে না। বেলা আর বাড়িয়ো না, নিবারণ, কি বলবে, বল।

নিবারণের মুখখানি মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া উঠিল; প্রবীণ দেওয়ান রাধানাথ বাপুলীর সম্বন্ধে কোনও দিন সে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল না। পিতা তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখিলেও, পুত্রের বিদ্বিষ্ট মনে দ্বিধা উঠিত, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ যেখানে, এই কৃত্রিম বাধ্যবাধকতা বালির প্রাচীর বা তাসের বাড়ীর মত সেখানে অসার! সুতরাং কোনও দিনই দেওয়ান-কাকার উদ্দেশে নিবারণকে সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই এবং সেরেস্তার 'য়্যাডমিনষ্ট্রেসন' সম্বন্ধে দেওয়ানজীর সহিত তাহার নিজের অভিমত কখনও ঐক্যবদ্ধ হয় নাই। সেই দেওয়ানজীর সম্মুখে পিতার এইরূপ দৃঢ় নির্দ্দেশ পুত্রের চিত্তে যে বিষম আঘাত দিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু নিবারণ আজ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। যে প্রগল্‌ভা বধূটি অল্প কয়েক দিন মাত্র তাহাদের সংসারে আসিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে বিষম বিপ্লব বাধাইয়া দিয়াছে, তাহার নিজের ও তাহার মায়ের অপ্রতিহত শাসনশকটের গতিবিধির প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার সম্বন্ধে খেয়ালী পিতার প্রকৃত মনোবৃত্তি কিরূপ, তাহার পরিচয়টুকু বর্ষীয়ান্ পিতার বিশাল মনোরাজ্য আলোড়িত করিয়া আজ সে

উদ্ঘাটিত করিবেই। সুতরাং দেওয়ানজীর উপস্থিতি উপেক্ষা করিয়াই নিবারণ তাহার গুরুতর সমস্যাটুকুর নিষ্পত্তির দিকেই অগত্যা মনোনিবেশ করিল।

অতঃপর আর কোন ভূমিকা না করিয়াই সে কহিল—আমি একটা গুরুতর নালিশ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

নিবারণ যদি তর্জ্জনী তুলিয়া, শাণিত অস্ত্র দেখাইয়া বলিত—আপনাকে আমি খুন করতে এসেছি—তাহা হইলেও বোধ হয় কক্ষমধ্যে ফরাসে আসীন দুই বর্ষীয়ান্ পুরুষ এ ভাবে চমৎকৃত হইতেন না। —নিবারণের মুখে নালিশের কথা শুনিয়া উভয়ের মুখেই সুগভীর বিস্ময়ের রেখা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সত্যই, বিস্মিত হইবার কথাই বটে। এ পর্য্যন্ত কর্ত্তা বা দেওয়ানজী কেহ কোনও দিন কোনও কারণে এই বেপরোয়া দাম্ভিক ছেলেটিকে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দেখেন নাই। নিবারণের বিরুদ্ধে নানা সূত্রে নানা লোকের নিকট হইতে কর্ত্তার দরবারে অসংখ্য নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সে নিজে কোনও দিন নালিশ লইয়া আসে নাই। যে তাহার কোপে পড়িয়া বিরুদ্ধভাজন হইয়াছে, কর্ত্তার দিকে না তাকাইয়া নিজেই বিচার করিয়াছে, নিজের ইচ্ছামত দণ্ড দম্ভের সহিত দিয়াছে বরাবর, এমন কি, তাহার সম্বন্ধে দেওয়ানজীর আচরণ যদি কোনও দিন অপ্রীতিকর হইত, সে তাহার প্রতিবিধানে পিতার দ্বারস্থ না হইয়া নিজের অবজ্ঞার সুরে কহিত—মনে রাখবেন আপনি, সিংহের শাবক আমি; আমার মর্য্যাদা হিসেব ক'রে সর্ব্বদা কথা কইবেন! খেয়ালী কর্ত্তার কানে পুত্রের ঔদ্ধত্যের বিবরণ যথাযথভাবেই উঠিত, কিন্তু শাসনে তাঁহার ঔদাসীন্যই দেখা যাইত। শ্লেষের সুরে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিতেন—'ওর নামই যে নিবারণ, তাই কারুর বারণ মানতে চায় না।' পুত্রের সম্বন্ধে ন্যায়নিষ্ঠ নৃপপ্রতিম ভূস্বামীর এই দুর্ব্বলতাটুকু উপলক্ষ করিয়া কত গল্প কথাই প্রচারিত হইয়া

আসিতেছে ; কত বেনামা-পত্র পিতার করতলগত হইয়াছে, কিন্তু অনুচিত পুত্রবাৎসল্যের ত্রুটিটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াও তিনি উদ্দাম পুত্র নিবারণকে কোনও দিন বারণ বা শাসন করিতে কিছুমাত্র প্রয়াস পান নাই। এ সম্বন্ধে কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্যটুকু তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিহিত, তাহার তত্ত্ব শুধু তিনিই অবগত।

এমন যে দুর্জ্জয় নিবারণ, সেই-ই আজ এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নালিশের কথা নিবেদন করিতেছে! কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধবিস্ময়ে নিবারণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোনও কথা নাই ; মনের ভিতর শুধু স্মৃতিসাগর আলোড়ন করিয়া কে যেন জানাইতেছিল—এমন অঘটন তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বুঝি আর কোনও দিন ঘটে নাই ; পূর্ব্বের সূর্য্য যেন আজ পশ্চিমদিক ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—নিবারণ করিতেছে নালিশ! অথচ তিনি স্বকর্ণে শুনিতেছেন, চক্ষুর উপর তাহার পাণ্ডুর মুখখানি দেখিতেছেন, অবিশ্বাসের কিছু নাই।

ক্ষণকাল পরে আত্মসংবরণ করিয়া কর্ত্তা কহিলেন—তুমি এসেছ নালিশ নিয়ে আমার কাছে! তা হ'লে দুনিয়ার দরিয়ায় এই প্রথম তুমি হালে পানি পাও নি—তা, হ'লে আমাকে বুঝতে হবে—এ মামলাও সাধারণ নয়। ভাল, আসামী কে শুনি? কার বিরুদ্ধে তোমার এই নালিশ?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ততোধিক সুতীক্ষ্ণস্বরে নিবারণ কহিল—আপনি কি এখনও তা জান্‌তে পারেন নি, বুঝতে পারেন নি কিছু?

নিবারণের এই কয়টি কথা অগ্নিগর্ভ ভয়াবহ বোমার রন্ধ্রে যেন অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিল ; সমস্ত ঘরখানিকে ত্রস্ত-কম্পিত করিয়া স্থবির সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—চোবরাও বেয়াদব্! মনে রেখো, নালিশ করতে

এসেছ তুমি, চোখ রাঙ্গাচ্ছ কাকে? নীচু হয়ে হিসেব ক'রে এখন থেকে কথা বল্‌তে শেখ।

জীবনের পথে এত দূর অগ্রসর হইয়া এ পর্য্যন্ত পিতার নিকট এমন নির্ঘাত আঘাত নিবারণ কোনও দিন পায় নাই। কঠোরপ্রকৃতি পিতার মুখের উপর অসঙ্কোচে কথা কহিবার একমাত্র অধিকার সেই পাইয়াছিল, কথার পিঠে ইহা অপেক্ষা কঠিন কথা কতবারই সে পিতাকে শুনাইয়াছে, যাঁহারা সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, নিবারণের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার উদ্দেশে এই অশোভন কথা, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠে নাই, বরং হাসির আবর্ত্তে বিশাল গুম্ফ-জোড়াটি বিস্ফুরিত হইবার শোভাটুকুই তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিয়াছেন। যাঁহাদের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী তাঁহাদের অন্যতম; আজ তিনিও স্নেহধন্য পুত্রের প্রতি পিতার এই অপ্রত্যাশিত তীব্র আচরণে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ!

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিবারণ মনে মনে তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া কহিল—তা হ'লে আমার যা নালিশ, কাগজে কলমে লিখেই দরখাস্ত কর্‌ব।

দৃঢ়স্বরে কর্ত্তা জানাইলেন—না, তার কোনো দরকার নেই, তুমি যা বলতে এসেছ এখানে, ব'লে যাও।

নিবারণ কহিল—বেশ, তাই বলছি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমার কথা আপনার মনে আজ ধরবে না—

বাজে কথা বলবার কোনও আবশ্যক দেখছি না নিবারণ, তোমার যে নালিশ, সেইটিই আগে ব'লে ফেলো।

কারুর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, ছোট ঘরের একটা মেয়েকে কুলবধূর সম্মান দিয়ে—ছুঁচোর বিষ্ঠা আপনি পাহাড়ে তুলেছেন, তা জানেন?

এ তোমার নালিশ নয়, নিবারণ, আমার নিজের কার্য্যের অনধিকার চর্চ্চা—

কিন্তু আপনার কার্য্যের চর্চ্চা বরাবরই আমি এমনই তেজের সঙ্গেই করেছি।

সে তেজ তুমি হারিয়ে ফেলেছ, তাই অধিকারটুকুও স'রে দাঁড়াচ্ছে। তোমার যেটুকু নালিশ, তাই আমি শুনতে চাই। তোমার কাছে আমার কাজের কৈফিয়ৎ দেবার সময় এখনও আসে নি।

গোবিন্দর বৌয়ের বিরুদ্ধেই আমার নালিশ—

ব'লে যাও, আমি শুনছি।

সে সকলের সামনে আমার অপমান করেছে।

কি সূত্রে।

আপনি তাকে যখন আশীর্ব্বাদ করেন, তখন না কি একগাছা সোনার চাবুক তার হাতে দিয়ে তাকে বলেছিলেন—আমার বাড়ীতে একটা গাধা আছে, এই চাবুক দিয়ে তাকে সায়েস্তা করতে হবে—

তাতে তোমার গাত্রদাহের কারণ?

আমাকেই সেই গাধা সাব্যস্ত ক'রে নতুন বৌ আপনার দেওয়া সোনার চাবুকটি আমারই পিঠে হাঁকড়াবে বলেছে—তাই।

বৌমা বলেছে এ কথা?

এক ঘর মেয়ের সামনে, সাক্ষীর অভাব নেই।

কথাটি কি সূত্রে উঠেছিল, শুনি?

নতুন বৌ আমাকে দেখেই ঘোমটা দেয়, আমি তার মুখখানি দেখতে চাই, মীনাকে ঘোমটা খুলে দিতে বলেছিলুম—

তোমার এইটুকু ত্রুটিতেই তিনি অত বড় রূঢ় কথা তোমাকে বললেন?

বলেছে কি না, তাকেই আগে জিজ্ঞাসা করবেন; আপনি যে তাকে সোনার চাবুক দিয়েছেন, গাঙ্গুলী-বাড়ীর গাধাকে সায়েস্তা করতে

বলেছেন, এ সব কথা আগে ত শুনি নি ; বোধ হয় এ বাড়ীর কেউ শোনে নি—বৌএর মুখ থেকে প্রকাশ হবার আগে।

হুঁ ?—তার পর ? আর কিছু বলবার আছে ?

আমার দাদামশাইকেও নতুন বৌ অপমান করেছে।

কি বললে ?

আমার স্বর্গীয় মাতামহের কথা বলছি ; ফুলশয্যার রাতে এক ঘর মেয়ের সামনে বৌ তাঁর নামে এমন খোঁটা দিয়েছে, শুনলে আপনিও শিউরে উঠবেন।

কি বলেছেন ?

দেনার দায়ে তিনি না কি তাঁর মেয়েকে—আমার মাকে—বেচেছিলেন।

বৌমা এ কথা বলেছেন ? বৌমা ! চণ্ডী মা !

পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া পিতার হাতে দিয়া নিবারণ কহিল—যাঁরা সেখানে ছিলেন, এ কথা বৌকে বল্‌তে শুনেছেন, তাঁদের নাম এতে আছে। আমার কথাটা আপনি যাচিয়ে নিতে পারেন।

সাদা কাগজখানির উপর কালো কালিতে লেখা কতকগুলি নারীর নাম হরিনারায়ণবাবুর দৃষ্টিতে তখন যেন কুণ্ডলী-পাকানো একপাল সাপের মত প্রতীয়মান হইতেছিল ! তাঁহার মস্তিষ্কে তখন জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছে ; যে আদরিণী বধূর প্রতি তাঁহার অতি উচ্চ ধারণা, তাহার সম্বন্ধেই এমন গুরুতর অভিযোগ ; তাঁহারই শ্বশুরকে এমন ভাবে আক্রমণ করিতে সে সাহস পাইয়াছে। এ কি স্পর্দ্ধা তাহার !

কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিয়া হরিনারায়ণবাবু কহিলেন—আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার নিবারণ, তোমার নালিশ আমি নিয়েছি ; বিচারের ত্রুটি হবে না।

নিরুত্তরে পিতার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া নিবারণ ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কর্ত্তা কহিলেন—বাপুলী, শুনলে ত সব!

বাপুলী কর্ত্তার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন—আপনার কি মনে হয়?

কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া কর্ত্তা উত্তর দিলেন—নিবারণ মিথ্যা বলে নি, সোনার চাবুকের কথা এ বাড়ীতে আমরা দুজন ভিন্ন আর কেউ জানে না। এমন কি, রাণী পর্য্যন্ত না।

বিচলিত কণ্ঠে বাপুলী কহিলেন—তা হ'লে কি আপনার ধারণা, বউমা নিবারণকে—

উত্তেজিত কণ্ঠের দৃপ্ত স্বরে বাপুলীর কথায় বাধা দিয়া কর্ত্তা কহিলেন—হাঁ, তাকেই সোনার গাধা সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছে। আমার কথা সে ধরতে পারে নি, এইখানেই সে হেরেছে; সব মেয়েই যেখানে ধরা দেয়, এই অভাগীও ঠিক সেইখানেই হোঁচট খেয়েছে।

একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বল।

রাণী কিছু আপনাকে বলেছেন এ সম্বন্ধে?

কিছু না; কিন্তু না বল্‌লেও, নতুন বউ আসার পর থেকেই তিনি আশ্চর্য্যরকম গম্ভীর হয়েছেন; এখন আমার মনে হচ্ছে বাপুলী, তিনি সবই শুনেছেন; বধূর ব্যবহার তাঁর মনেও কঠিন আঘাত দিয়েছে।

কিন্তু আপনাকে ত বলেন নি কিছু!

তুমি কি পাগল হয়েছ বাপুলী, বলছ কি? রাণী এই এক ফোঁটা মেয়ের বিরুদ্ধে আমাকে লাগাবেন, নালিশ করবেন?

তাও ত বটে, আমি এটা ভাবি নি।

ভাববার সময় এখন এসেছে, বাপুলী ! এখন মনে হচ্ছে আমার বড় ঘরোয়ানা অবহেলা করবার নয় ; যারা করে, তারা ঠকে। আমিও বোধ হয় ঠকেছি, বাপুলী।

আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস, আপনি যে-ঘরে সওদা করেছেন, সে ঘর পয়সা ছাড়া আর সব দিক দিয়েই বড়, আপনি ঠকেন নি।

আমিও তাই ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন বুঝছি, ভুল করেছি। এই মেয়েটার একটা দিকই আমরা দেখেছিলুম, সেই উজ্জ্বল দিকটাতেই সে জয়পতাকা উড়িয়ে আমাদের মাত ক'রে দেয়—কিন্তু আর একটা দিক যে মেয়েদের আছে, আমরা সে দিকে মোটেই নজর দিই নি, আজ সেইটিই কদর্য্য হয়ে উঠেছে।

আপনার এ কথার অর্থ আমি ঠিক ধরতে পারছি না।

তুমি কি সত্যই এত বোকা ? কিম্বা বুঝতে পেরেও না-বোঝার ভান করছ ? আমার কথা কি জান—আমি এই মেয়েটাকে একটু অসাধারণই ভেবেছিলুম—এর মনের আর দেহের শক্তিটুকুর সন্ধান পেয়ে। সেই সঙ্গে এটুকুও আমি ভেবেছিলুম, শ্বশুরবাড়ীতে এসে সাধারণ মেয়ের পথে ও মেয়েটি পা বাড়াবে না, বাড়ীশুদ্ধ সকলকে আপনার ক'রে নেবে। কিন্তু এসেই ও দিয়েছে নিবারণকে এক আঘাত, তার কথাতেই তা বোঝা গেল। নিবারণের মাতামহের গলদটুকু ধরেই সেখানেও নির্ঘাত আঘাত দিয়েছে, রাণীর কথা অবশ্য জানি না, কিন্তু তিনিও যে রেহাই পেয়েছেন, তা মনে হয় না। ও এবাড়ীতে এসেই আপনার পর ঠিক ক'রে নিয়েছে ; একটা অপদার্থ গাধা যে ওর স্বামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনও দুঃখই ওর মনের কোণেও দেখে নি, ঐশ্বর্য্য দেখে সব ভুলে গিয়েছে।

তা হ'লে আপনি এখন কি করবেন স্থির করেছেন ?

এখনও বুঝতে পার নি—নিবারণের ওপর হুমকি দেখেও ? এঁচোড়ে পাকা একটা মেয়ে যে এমন ক'রে আমাকে ঠকিয়ে দেবে, আমার সংসারে

একটা বিপ্লব বাধাবে, আমি কিছুতেই তা বরদাস্ত করতে পারব না ; শাস্তি তাকে নিতেই হবে, অপরাধ করলে আমার কাছে কারুর রেহাই নেই।

আর্দ্রকণ্ঠে বাপুলী কহিলেন—কিন্তু আমার একটি অনুরোধ, যদি দেখেন, সত্যই তিনি অপরাধিনী, তা হ'লে শাস্তির ব্যবস্থাটুকু করবার আগেই—

হাসিমুখে কর্ত্তা কহিলেন—যেন তোমাকে খবর দিই। ভাল, তাই হবে, তোমার সামনেই না হয় তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। যে দিন শ্যামাপুরে তাঁকে পুরস্কার দিই, সে দিনও তুমি যখন উপস্থিত ছিলে, শাস্তি যখন দেওয়া হবে—তোমার সেখানে থাকাটাও উচিত হবে।

কথাটা নিঃশেষ করিয়াই কর্ত্তা উঠিয়া পড়িলেন। ভৃত্যগণ বাহিরে প্রতীক্ষায় ছিল, শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।

দুই

ফুলশয্যার শুভ রাত্রিটিকে সাক্ষ্য করিয়া পড়িবার নিভৃত ঘরখানির মধ্যে নবদম্পতির যে সাধনার সূত্রপাত হয়, উভয়ের অদম্য উৎসাহে তাহা ক্রমশঃ গভীর হইয়া উঠিতেছিল। অপূর্ব্ব এই দম্পতির সাধনা। লক্ষ্য ইহাদের মোক্ষলাভ নয়—সত্যকার মানুষ হওয়া। আর এই সিদ্ধিটুকু আয়ত্ত করিবার মন্ত্র—একাগ্রচিত্তে বিদ্যাদেবীর আরাধনা! আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা, বিলাস-হাস্য, রঙ্গরস প্রভৃতি তরুণ বয়সের এই অপরিহার্য্য উদ্দাম স্পৃহাগুলি সত্যকার মানুষ হইবার সাধনায় কঠোর সংযমী সাধক-সাধিকার গভীর নিষ্ঠায় রূপান্তরিত হইয়া এই অপূর্ব্ব তরুণ-

তরুণীর তুইটি হৃদয় যুগপৎ চিত্তশুদ্ধি ও বিবেকবুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই অপূর্ব্ব সাধনার পথে ইষ্টলাভের অর্চ্চনায় বধূকেই স্বামীর পৌরোহিত্য করিতে হইয়াছে ; পূজার পদ্ধতি, মন্ত্রের নির্দ্দেশ, প্রয়োগ-তৎপরতা প্রতি পদেই স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলে, কোনও বিষয়েই তাহাকে খাটো হইতে দেয় না।

লাহোরে বিদ্যা-সাধনায় চণ্ডী তাহার বহুদর্শী অধ্যাপক দাদামহাশয়ের নিকট যে ভাবে দীক্ষা পাইয়াছিল, সেই মন্ত্রেই গোবিন্দও দীক্ষিত হইয়াছে। সে এখন বুঝিয়াছে—দেবী সরস্বতীকে তুষ্ট করিয়া বিদ্বান্ হইতে হইলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইবে, একমনে লেখাপড়া শিখিয়া বিশ্বসংসারের সকল সন্ধান জানিতে হইবে। মা-সরস্বতীর পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার এই লেখা আর পড়া, এবং অতি শীঘ্র তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার মন্ত্র—একাগ্র মন। তিনি ফুলচন্দন অপেক্ষা এইগুলিই অধিক পছন্দ করেন। মূর্খ কালিদাস বনে বসিয়া একমনে লেখাপড়া শিখিয়াই তাঁহার বরপুত্র হইয়াছিলেন। সুতরাং গোবিন্দের মন আশায় ভরিয়া গিয়াছিল, উৎসাহে নাচিয়া উঠিয়াছিল। মা সরস্বতীকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে বিদ্বান্ হইবার এমন সহজ উপায় আর কেহ ত তাহাকে কোনও দিন বলিয়া দেয় নাই! তুই চক্ষু মুদিত করিয়া, আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়া মনে মনে কোনও মন্ত্র জপ করিতে হইবে না, কিম্বা হাত তুলিয়া দীর্ঘবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে না—বই লইয়া বসিয়া একমনে সদাসর্ব্বদা পড়াশুনা ও খাতায় কালি-কলম দিয়া বইয়ের কথা লেখা ; সব বই পড়িতে শিখিলে, ভালো করিয়া ছাপার মত লিখিতে পারিলে—মা সরস্বতী সদয় হইবেন, সম্মুখে আসিয়া দেখা দিবেন, বর দিয়া আমাকেও কলিদাসের মত পণ্ডিত করিয়া দিবেন! কি মজা!

তেজোময় মন্ত্রের অপূর্ব্ব প্রভাবে গোবিন্দের মস্তিষ্কের জড়তা কোথায়

সরিয়া গিয়াছে, সিদ্ধিলাভের উল্লাসে নিবিড় একাগ্রতায় দুর্লভ প্রতিভা ধীরে ধীরে সেই স্থানটুকুর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

এই তরুণ সাধক-সাধিকার সৌভাগ্যসূত্রে পরিপূর্ণ তিনটি মাসের মধ্যে ইহাদের সাধনামন্দিরে কোনওরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। দূরদর্শিনী বধূ আট ঘাট বাঁধিয়াই যেন এই কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়াছিল।

বাসরে স্বামীর সহিত পরিচয়সূত্রে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রকৃতির পরিচয়টুকু পাইয়াই বুদ্ধিমতী বধূ নিজের উপস্থিত-বুদ্ধির প্রভাবে প্রতিকারের উপায় স্থির করিয়া লইয়াছিল। অল্পবয়সেই বয়সের অনুপাতে সুপ্রচুর বিদ্যা সে অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল—নিজের সহজাত অসাধারণ প্রতিভা ও তৎসহ তাহার আদর্শ-শিক্ষক দাদামহাশয়ের উদ্ভাবিত অভিনব শিক্ষাব্যবস্থার সহায়তায়। শিক্ষা-সংক্রান্ত সেই অপূর্ব্ব ব্যবস্থাপত্রগুলি ইষ্টকবচের মতই সে লাহোর হইতে সঙ্গে করিয়া শ্যামাপুরে আনিয়াছিল। এখানেও সেই অমূল্য পুঁথিগুলি তাহার সঙ্গে আসিয়াছে এবং যাহাদের প্রসাদে এই বয়সেই সে বিশ্ব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের জ্ঞাতব্য বহু তথ্যরাজির সন্ধান পাইয়াছে, তাহার অজ্ঞ স্বামীকে বিজ্ঞ করিয়া তাহার সম্মুখেও সেই রহস্যময় ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবার সুযোগ-টুকুর প্রতীক্ষা করিতেছে।

চণ্ডীর প্রতিক্ষণেই মনে পড়ে, লাহোরে তাহার সম্মুখে যখন এই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন তাহার নিয়ামক ছিলেন তাহার শিক্ষা-গুরু দাদা-মহাশয় স্বয়ং। আর এখানে? তরুণী বধূ প্রকারান্তরে রহস্যান্বেষী স্বামীর বিদ্যাসাধনায় শিক্ষয়িত্রী হইলেও, সে সেই গৌরবের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সহপাঠিনীরূপে স্বামীর সহিত আবার নূতন করিয়া সাধনায় বসিয়াছে। সহসা দেখিলেই মনে হয়, দুই তরুণ-তরুণী পরমোৎসাহে একাগ্র সাধনায় বিদ্যা অর্জ্জন-প্রয়াসী, একই পর্য্যায়ের

ছাত্র-ছাত্রী উভয়েই :—তবে অপেক্ষাকৃত পারদর্শিনী বলিয়া ছাত্রীটিই সর্ব্বতোভাবে তাহার সহপাঠীকে সহায়তা করিয়া চলিয়াছে।

নিভৃত কক্ষে ইহাদের এই অভূতপূর্ব্ব বিদ্যাসাধনার বারতা কক্ষের বাহিরে গাঙ্গুলী পরিবারের জন-প্রাণীও জ্ঞাত নহে। পরিচারিকাদের বিদায় দিয়া নিজ মহল্লার দ্বার রুদ্ধ করিয়া বধূ স্বামীর সহিত অহোরাত্রির অধিকাংশ সময়টুকু এই সাধনায় অতিবাহিত করে। স্বামী-স্ত্রীর রুদ্ধ কক্ষে এই ভাবে অবস্থিতি সম্বন্ধে বাহিরে কত কল্পিত উপাখ্যানই পল্লবিত হইয়া উঠে ; কিন্তু স্বামিসর্ব্বস্ব বধূর বাহ্য-জগতের আর কোনও দিকেই যেন কিছুমাত্র লক্ষ্যই নাই ; তাহার ধ্যান-ধারণা চিন্তা-কল্পনা সমস্তই স্বামীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিপার্শ্বে সর্ব্বক্ষণই ঘুরিতেছে ; স্বামীর মুক্তির জন্য এই তেজস্বিনী তরুণীর সর্ব্বস্ব পণ—স্বামীর জড়ত্ব দূর করিয়া তাহাকে সে দেবত্বের পর্য্যায়ে তুলিবেই ! অদৃশ্য মনোজগতে ও পরিদৃশ্যমান বাস্তব জগতের সর্ব্বত্রই সে দেখিতে পায়, যেন তাহার স্বামীই একমাত্র সকল স্থান অধিকার করিয়া মানবদেবতার প্রতীকরূপে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছেন !

লোকচক্ষুর অগোচরে এই সাধক সাধিকার বিদ্যাসাধনা অবাধে শত অহোরাত্র অতিক্রম করিবার অবকাশ পাইয়াছিল। ইহাদের সাধনার প্রভাবেই যেন বধূর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ এই শত অহোরাত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোনও বিঘ্ন উপস্থিত করে নাই।

শত অহোরাত্রের পরবর্ত্তী মধ্যাহ্নে সহসা বাহিরের রুদ্ধ কক্ষদ্বারে উপর্য্যুপরি আঘাত—তাহার রূঢ় নির্ঘাত পাঠাগারের নীরব গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ করিয়া দিল। লিখিবার ছোট টেবিলখানির দুই পার্শ্বে মুখোমুখী বসিয়া উভয়েই তখন নিজ নিজ খাতায় লিখিত একই নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের সমাধানে ব্যস্ত। দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাতের শব্দে বিরক্ত হইয়া চণ্ডী হাতের খাতা ছাড়িয়া উঠিল, কিন্তু গোবিন্দের গভীর অভিনিবেশের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম

দেখা গেল না। দ্বারে অবিরাম আঘাত এবং তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সম্মুখবর্তিনী সহপাঠিনীর প্রস্থান, কোনটিই তাহার কর্ণ ও চক্ষুকে চমকিত করিল না, টেবিলের উপর ন্যস্ত খাতাখানির উপর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার চিত্তটী এমনভাবে নিবদ্ধ, যেন আর কিছুই তাহার লক্ষ্য করিবার নাই; যে সাধনায় সে লিপ্ত হইয়াছে, তাহা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যেন সে সম্পূর্ণ অচেতন।

এই মহল্লায় যে দুই জন পরিচারিকার পর্য্যায়ক্রমে বরাবর উপস্থিত থাকিবার কথা, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়া গেলেই চণ্ডী তাহাদের বিদায় দিয়া বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; বেলা পড়িলেই বৈকালিক পাট-ঝাট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই চণ্ডী পুনরায় দ্বার মুক্ত করিয়া রাখে। মধ্যের এই সুদীর্ঘ সময়টুকু নিরুপদ্রবেই তাহাদের লেখাপড়ায় অতিবাহিত হয়। আজ মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পরেই বহির্দ্বারের আঘাতে মনে মনে অতিমাত্রার বিরক্ত হইয়া চণ্ডী নিতান্ত অপ্রসন্নভাবেই দরজা খুলিয়া দিল।

কিন্তু মুক্ত দ্বারের সম্মুখে এমন অসময়ে এক অপ্রত্যাশিতের আকস্মিক উপস্থিতি চণ্ডীর মুখের বিরক্তির রেখাগুলি বিস্ময়ে পরিণত করিয়া দিল। সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, পরিচারিকাদের কেহ নহে, মৃণালিনী বা পুরবাসিনী কোনও তরুণী দ্বারে আঘাত দিয়া তাহার মনে বিরক্তির সঞ্চার করে নাই, গৃহস্বামী স্বয়ং তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

চণ্ডীর কণ্ঠ হইতে স্বাভাবিক গতিতেই অনুচ্চ স্বরে নির্গত হইল,—বাবা!

কিন্তু বাবার মুখ হইতে স্বাভাবিক ভাবে ইহার ঠিক প্রতি-উত্তর আসিল না, এবং চক্ষুর অপ্রসন্ন ভঙ্গিটুকুও চণ্ডীর দৃষ্টি এড়াইল না। নিজের বিস্ফারিত দৃষ্টিকে সহসা তীক্ষ্ণ করিয়া সে দেবতুল্য শ্বশুরের সঙ্কুচিত মুখের উপর স্থাপন করিল।

বধূর এই সঙ্কোচশূন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আজ কর্ত্তার বুকে সূচের মতই বিঁধিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে মনের ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অন্য দিক দিয়া তিনি মনের অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন; রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন—দিন-দুপুরে এ দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছো কেন, বৌমা! দাসীগুলো গেল কোথায়?

সহজ স্বরে বধূ উত্তর দিল—আমি তাদের ছুটী দিয়েছি, বাবা!

বধূর এই সোজা কথায় কর্ত্তার চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রশ্ন হইল—ছুটী দিয়েছ! কেন?

অতি সাধারণ বিষয়ে অসাধারণ শ্বশুরের এই ভাবে কৈফিয়ৎ চাহিবার ভঙ্গি বধূকে ব্যথা দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহজাত আত্মসম্মানজ্ঞানটুকুও সচেতন হইয়া উঠিল; কিন্তু আজ সে ধৈর্য্য হারাইল না, তৎক্ষণাৎ বেশ গুছাইয়া কণ্ঠস্বরকে যতটা সম্ভব কোমল করিয়া উত্তর দিল—সব সময় ত ওদের এখানে কাজ থাকে না, শুধুই প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোয়; আর এ দরজাটা খোলা থাকলে সবাই এখানে এসে জোটে, জ্বালাতন করে; সেই জন্যই দুপুরবেলায় ওদের ছুটী দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে রাখি।

তুচ্ছ কথার এই উত্তরই যথেষ্ট এবং এইখানেই প্রশ্নকর্ত্তার তুষ্ট হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তিনি আজ এই প্রগল্‌ভা বধূটির উপর চিত্তের অসন্তুষ্টির সমস্ত অস্ত্রগুলিই প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক আঘাতে তাহাকে আহত করিবার সঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছেন। বিচারের সূচনা হইতেই যে বিচারকের মনে আসামীকে শাস্তি দিবার অমোঘ ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন থাকে, সেখানে আসামীর সকল যুক্তিই ভাসিয়া যায়। সুতরাং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার পরও বধূকে সবিস্ময়ে শ্বশুরের রূঢ় মন্তব্য শুনিতে হইল—আমি এর কোনও প্রয়োজন দেখি না; তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছ বৌমা, গেরস্তর সংসারে তুমি ঘর-বসত করতে আস নি, আর পাড়ায় দশ জনের মাঝে এমন একখানা ঘর পাও নি—নিজের আব্রু বাঁচাবার জন্য যেখানে দিন দুপুরেও দরজা বন্ধ না ক'রে উপায় নেই! যেখানে এসেছ, সব বিষয়েই

সেখানকার আদব-কায়দা, রীতি-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে, বুঝেছ!

আভিজাত্যের এই খোঁচাটুকুও বধূ নীরবে সহ্য করিল; সে দরিদ্রের কন্যা, ধনাঢ্যের গৃহে বধূ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু এই প্রসঙ্গে দরিদ্রের গৃহস্থাশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিবার কি সার্থকতা, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার প্রলোভনটুকু অতি কষ্টেই সে দমন করিয়া লইল বটে, কিন্তু একটা উত্তেজনার শিহরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গের শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহের সহিত ক্ষিপ্র বেগেই বহিতেছিল।

বক্র কটাক্ষে বধূর নত মুখখানির দিকে চাহিয়া কর্ত্তা পুনরায় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—তা ছাড়া, নতুন বউ তুমি; মেয়ে-মহলের সবাই আসবেই ত এখানে; এই সূত্রে আলাপ পরিচয় হবে, ঘনিষ্ঠতা জন্মাবে, তুমিও অনেক কিছু জানতে শিখতে পারবে। কিন্তু তোমার সবটাতেই বিপরীত কাণ্ড! কারুর সঙ্গে মিশতে চাও না, সর্ব্বক্ষণ নিজের মহল্লায় দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাক ছুটিতে! তোমার মুখের সামনে কেউ এগুতে সাহস পায় না, শেষে আমাকেই আসতে হয়েছে এখানে। আর এসেই ত দেখতে পাচ্ছি, যা যা শুনেছি, সে সবই সত্যি।

শ্বশুরের এই তীব্রোক্তিও বধূ মুখখানি নীচু করিয়া নিরুত্তরে শুনিল।

কর্ত্তার উৎসাহ আরও প্রখর হইয়া উঠিল, বধূর দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া উচ্ছ্বাসের সুরে এবার কহিলেন—জানো, কত বড় উচ্চ ধারণাই আমি তোমার সম্বন্ধে মনে পোষণ করেছিলুম, বৌমা!

বৌমা অবশ্য কথা কয়টি কানে শুনিলেন, কিন্তু চোখ তুলিয়া চাহিলেন না; শ্বশুরের মনের ধারণাটুকু জানিতে কোনও আগ্রহই তাহার দেখা গেল না। চক্ষুর দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীব্র ও কণ্ঠের স্বর তীক্ষ্ণ করিয়া কর্ত্তাই তাহা ব্যক্ত করিলেন—সেখানে তোমাকে দেখে, তোমার কথাবার্ত্তা শুনে, তোমার ব্যবহারে যে পরিচয় তোমার বাহিরের দিক দিয়ে পেয়ে আমি

মুগ্ধ হয়েছিলুম, এখানে তোমার ভেতরটারও সন্ধান আমরা পাব, আর তাই দেখে এ বাড়ীর সবাই আমার মতই মুগ্ধ হয়ে যাবে, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু এখানে এসেই তোমার প্রকৃতির এ দিকটা যে ভাবে দেখিয়েছ, তাতে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই অবাক্। আর তাতে আমার মুখ-খানাও একেবারে নীচু হয়ে গিয়েছে।

আয়ত দুইটি চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি শ্বশুরের মুখের উপর তুলিয়া বধূ ধীরভাবে কহিল—আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, বাবা, এখানকার অনেক কথাই আপনি আমাকে বলবেন, আর বোধ হয়, আমার কাছ থেকে তার উত্তরও শুনতে চাইবেন। কিন্তু এ ভাবে এখানে আপনার দাঁড়িয়ে থাকা ত ভাল দেখাচ্ছে না, আপনি ঘরে চলুন বাবা, সেখানে ব'সে—

অধৈর্য্যভাবে বধূর কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—না, তার কোনও দরকার নেই, এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি—

তা হয় না বাবা, আপনাকে বসতেই হবে!—কথার সঙ্গে সঙ্গে বধূ অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত দালানের অপর প্রান্তে রক্ষিত সুবৃহৎ আরাম-কেদারাখানি অবলীলাক্রমে দুই হাতে তুলিয়া আনিয়া শ্বশুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া দিল; তাহার পর মিনতির সুরে কহিল—ঘরে না যেতে চান, এইখানেই আপনি বসুন। যখন আমার বিচার করতেই এসেছেন, তখন দাঁড়িয়ে থেকে ওকাজ ত হ'তে পারে না বাবা, আর তা ভালও দেখায় না।

আসন-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিস্ময়টুকু গোপন করিয়া মুখে গাম্ভীর্য্য আনিয়া কর্ত্তা কহিলেন—তুমি তা হ'লে নিজেই বুঝতে পেরেছ বউমা, যে, আমি আজ এখানে এসেছি, তোমার বিচার করতেই!

মৃদুকণ্ঠে অথচ বেশ সপ্রতিভভাবেই বধূ কহিল, আপনার আসবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, আপনার দরবারে ডাক আমার

পড়বেই। তবে আপনি নিজেই এমন অসময়ে আসবেন, সেটুকু অবশ্য ভাবতে পারি নি, বাবা!

খোদ কর্ত্তার সম্মুখে বিচারের কথা উঠিলেই বিচার-প্রার্থী অতি বড় সাহসীর বুকখানিও ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু সেই জবরদস্ত বিচারক বক্রনয়নে লক্ষ্য করিলেন, বধূর মুখে কোনওরূপ আশঙ্কা বা দুশ্চিন্তার একটি রেখাও পড়ে নাই! বিচারকের কণ্ঠের দৃঢ় স্বর ইচ্ছা সত্বেও বিচ্ছিন্ন বিদ্রূপের স্বরে নির্গত হইল—তুমি তা হ'লে আগে থেকেই সব জেনে তৈরী হয়েই আছ বল! যে জেগে ঘুমোয়, তাকে সহজে কেউ জাগাতে পারে না; তেমনি বিচার হবে জেনেও যে দোষ করে, আর তার জন্য আগে থাকতেই আট-ঘাট বেঁধে রাখে, তাকে বড় বড় কৌঁসুলীরাও জেরায় হারাতে পারে না।

কথোপকথনের সময় কথার পিঠে যে ভাবে অন্যে কথা বলে, সেই ভাবেই বধূ বেশ সহজ কণ্ঠে কহিল—তাদের যে ঐ পেশা বাবা, কি ক'রে ওদের হারাবে বলুন; ওরা ভাঙ্গবে, তবুও মচকাবে না!—আবার এমন অনেকেরও আজকাল ডাক পড়ে শোনা যায়, কি দোষ তাদের, তাই তারা জানে না; কিন্তু তাতেও বিচার তাদের আটকায় না, শাস্তি হয় নির্ঘাত।

কোন্ সূত্রে নিজের দুর্ব্বলতাটুকুর সুযোগ লইয়া বধূ তাঁহার মুখের উপর এমন বেপরোয়া ভাবে প্রত্যুত্তর দিতে সাহস পাইল, মনে মনে ক্ষণকাল সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াই বিচারক বুঝিলেন, এখানে উপস্থিত হইয়াই কণ্ঠের পর্দ্দা যে ভাবে তিনি চড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা চরমে উঠিয়া পুনরায় নামিয়া গিয়াছে, বুদ্ধিমতী বধূ এই সুযোগটুকু গ্রহণ করিতে অবহেলা করে নাই। মুহূর্ত্তে মুখের ভঙ্গি, মনের ভাব ও কণ্ঠের স্বর উগ্র করিয়া কর্ত্তা কহিলেন—তোমার বিরুদ্ধে একটার পর একটা ক'রে কতগুলো নালিশ এসেছে, তা তুমি জান?

বধূ হাসিমুখে উত্তর দিল—আমি ত বাইরের কোনো খবরই রাখি না, আপনি ত এখানে এসেই তা জেনেছেন, বাবা!

দুই চক্ষু পাকাইয়া কর্ত্তা কহিলেন—এটাও তোমার বিপক্ষে অন্যতম অভিযোগ!

বধূর মুখের হাসিটুকু মিলাইয়া গেল, শ্বশুরের মুখ হইতে স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু সঙ্গে সঙ্গে নামাইয়া লইল, কিন্তু কথার কোনও উত্তর সে দিল না।

কঠিন স্বরে কর্ত্তা পুনরায় কহিলেন—আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার হাতে সোণার চাবুকটি আমার দিয়েছিলুম—

আনত দুইটি চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু সহসা তীক্ষ্ণ করিয়া বধূ শ্বশুরের মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, সে দৃষ্টিতে প্রশ্ন যেন প্রকটিত!

কর্ত্তা কহিলেন—বাইরের দিক দিয়ে তোমাকে যতটুকু চিনেছিলুম তাতে খুবই ভরসা ছিল আমার, আমি যে গাধাটার কথা বলেছিলুম তোমাকে, তুমি তাকে চিনতে পারবে, হয় ত তাকে টিট্ করেও নেবে। কিন্তু তুমি আমার ইসারার দিক দিয়েও যাও নি!

নিরুত্তরে বধূর পুনরায় সেই মর্ম্মভেদী দৃষ্টি! অপ্রসন্ন মুখখানি বিকৃত করিয়া কর্ত্তা কহিলেন—এখানে এসেই তুমি তোমার দেওর নিবারণকেই সেই গাধা সাব্যস্ত ক'রে বসেছ। শুধু তাই নয়, সকলের সামনেই তুমি এ কথা দম্ভ ক'রে প্রকাশ করেছ। কর নি তুমি? প্রতিবাদ করবার সাহস তোমার আছে?

বধূর সুন্দর মুখখানি সেই মুহূর্ত্তে আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু শ্বশুরের কথায় কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সজোরে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—মুখে যে কথা আমি বলেছি, তা গোপন করবার অভ্যাস আমার কোনও কালেই নেই, বাবা!

তা হ'লে তোমার দেওর নিবারণকে তুমি সকলের সামনে গাধা বলেছ, এ কথা আমার কাছেও স্বীকার করছ?

হাঁ, বাবা! আমি একদিন তাঁকে গাধা বলেছি, আর একদিন এ কথাও তাঁকে জানিয়েছি যে, তাঁর যে আচরণ, তাতে তাঁকে গাধা ব'লে গাধাকেই ছোট করা হয়েছে।

বটে! কিন্তু শেষের এ কথাটা নিবারণ বলে নি।

বোধ হয়, বলা আবশ্যক মনে করেন নি, কিম্বা ভুলে গিয়েছেন; কিন্তু আমি বলেছি।

কিন্তু আমি তোমাকে স্পর্দ্ধা দেখাবার এতটা অধিকার এখানে দিইনি, বৌমা! এ পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে কেউ নিবারণের মুখের দিকে চোখ পাকিয়ে চাইতে সাহস করে নি—আমার সেরেস্তার সবাই, এমন কি, দেওয়ানজী পর্য্যন্ত নিবারণকে ভয় করে।

আপনিও বোধ হয় জানেন না বাবা, ছেলেবেলা থেকে আমিও কাউকে ভয় করতে শিখি নি।

এ কথা জোর গলায় বলতে পারে কারা জান? যারা জীবনে কারুর তোয়াক্কা রাখে না—

শুধু তাই নয় বাবা—যারা জীবনে কোন দিন অন্যায়ের ধার দিয়ে যায় না আর সত্যময় ভগবানের ওপর বিশ্বাস হারায় না!

তুমি এ কথা আজ বলতে পারছ বৌমা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায়? অথচ তুমি নিজে জান, আমি জানি, একটা আধটা নয়, এক ডজনের কাছাকাছি অন্যায় তুমি করেছ!

আমি অন্যায় করেছি?

নিশ্চয়—একটু আগে তুমিই স্বীকার করেছ!

আমি যা করেছি, সেটা স্বীকার করাকেই কি আপনি অন্যায় ব'লে সাব্যস্ত করছেন?

তুমি আমাকে আজ ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা দিতে চাও—এ চমৎকার!

তা হ'লে, এ কথার ওপর আমার আর কোনও কথা নেই, বাব

কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনি এসেছেন বিচারক হয়ে ন্যায় অন্যায় স্থির করতে।

ঠিক কথাই বলেছ তুমি—বিচার আমি করব, তোমার প্রত্যেক অপরাধের—প্রত্যেক অন্যায় আস্পর্দ্ধার—

তাই করুন, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ, সে-গুলোর ভিত্তি কোথায়, তাও আপনার দেখা কর্ত্তব্য।

ভাল, তোমার কাছেই নূতন ক'রে আজ কর্ত্তব্য না হয় শিক্ষাই করব। কিন্তু এই ভাবে কথার জোরে তুমি যে আমাকে ঠকিয়ে জিতে যাবে, তা মনে ক'র না—

কথার জোরে কোন দিন আমি আপনাকে ঠকাই নি, বাবা!

ঠকাও নি? আলবৎ ঠকিয়েছ তুমি; শুধু কথায়, মুখের কথায় আর লোক-দেখানো দৈহিক কায়দায়!

বাবা!

অমন ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলে যে? অস্বীকার করতে চাও আমার কথা?—কাল হয়েছিল, সেই দুরন্ত গোরুর শিং ধ'রে তাকে দাবানো, আমি চমকে উঠে তখনি সোণার চোখে দেখেছিলুম তোমাকে; তারপর স্কুল-বাড়ী তৈরী ক'রে দেবার প্রার্থনা—শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম—উজোড় ক'রে দিলুম সব! তখন ভুলেও ভাবি নি, গায়ের জোর আর মুখের তোড়ই মেয়েদের সর্ব্বস্ব নয়, তাদের ভেতরটাও দেখবার—সেইটুকু দেখি নি বলেই আজ এই বিভ্রাট বেধেছে, আমাকে এমন ক'রে ঠকতে হয়েছে!

ঠকতে হয়েছে—আপনাকে? আমি আপনাকে ঠকিয়েছি, এই আপনার তা হ'লে দৃঢ়বিশ্বাস, বাবা?

হাঁ, হাঁ—এই আমার দৃঢ়বিশ্বাস। তোমার প্রকৃতির একটা দিক দেখিয়ে তুমি আমাকে মাতিয়ে দিয়েছিলে, আর এখানে এসে আর একটা

দিক দিয়ে বিষ ছড়িয়ে তুমি আমাকে তাতিয়ে তুলেছ! নতুন বৌ তুমি, তোমার ব্যবহারে লোক হাসছে, কাউকে তুমি গ্রাহ্য কর না, কোনও দিকে তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই—নিবারণকে তুমি অপমান করেছ, মৃণালিনীর গায়ে পর্য্যন্ত হাত তুলেছ, আমার শ্বশুরের নামে পর্য্যন্ত তুমি আঘাত করেছ—এতই তোমার সাহস—এগুলো অন্যায় নয়? এখনও তুমি বলতে সাহস করবে, তুমি অপরাধিনী নও?

কথাগুলি নিঃশেষ করিয়া কর্ত্তা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্বশুরের প্রতি কথাটি তীরের মত বধূর অঙ্গে বিঁধিলেও, তাহার জ্বালা অসীম সহিষ্ণুতায় সহ্য করিয়া ধীর-স্বরে বধূ কহিল—তা হ'লে আমার বিরুদ্ধে নালিশ শুধু অন্যের নয় আপনার মনেও নালিশ উঠেছে, আর সেইটিই আরও গুরুতর। কিন্তু এখন আমি যদি বলি, আমারও একটা নালিশ আছে, আর সেটা অগ্রাহ্য করবার মতও নয়—এবং এক সঙ্গেই দুটো মামলারই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।

তোমারও নালিশ আছে নাকি?—কিসের নালিশ শুনি!

আমিও ঠকেছি যে বাবা, আর সেই সূত্রেই আমার এই নালিশ।

তুমি ঠকেছ? কেন তা হ'লে নালিশ কর নি আগেই?

তখন প্রয়োজন বুঝি নি। ঠকেছি মনে হলেই ক্ষতিটুকু আদায় করতে সবাই নালিশ করতে ছোটে, কিন্তু আমি সকলের চেয়ে বেশী ঠক্‌লেও নিজেই চেষ্টা ক'রে সে ক্ষতিটুকু পূরণ ক'রে নিতে পারব ভেবেই এত দিন নালিশ করি নি।

তবে এখন নালিশ করতে চাইছ কি অভিপ্রায়ে?

যিনি আমাকে ঠকিয়েছেন, তিনিই আমার নামে আজ নালিশ তুলেছেন, সেই জন্যই আমার নিজের নালিশের কথা তোলা; নতুবা আমি এ পর্য্যন্ত নালিশ কারুর কাছে করি নি।

কি বলছ তুমি বৌমা, হেঁয়ালী তোমার রাখ; আমি শুনতে

চাই, কে তোমাকে ঠকিয়েছে, কি সূত্রে কার বিরুদ্ধে নালিশ তোমার ?

বিক্ষুব্ধ চিত্তের সমস্ত জ্বালা কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত স্বরে যেন ঢালিয়া দিয়াই বধূ এক নিশ্বাসে উত্তর দিল—আপনার বিরুদ্ধে আপনার কাছেই এই নালিশ আমার ; আপনি নিজেই আমাকে ঠকিয়েছেন।

দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া চীৎকার তুলিয়া কর্তা কহিলেন—কি বললে তুমি বৌমা—আমি তোমাকে ঠকিয়েছি ?

ক্রোধের বিপুল আবেগে কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু দুই চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টির ধারা বধূর দিকে যেন বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

বধূ কিন্তু কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল—হাঁ, আমি প্রমাণ করব আমার কথা—আপনি ঠকিয়েছেন শুধু একা আমাকে নয়, তিন জনকে ;—আপনার স্বর্গীয়া স্ত্রীকে ঠকিয়েছেন, তাঁর ছেলেকে ঠকিয়েছেন, শেষে আমাকেও ঠকিয়েছেন !—সমস্ত প্রমাণ আমি আপনার চোখের ওপর তুলে ধরব—আপনাকেই বিচার ক'রে রায় দিতে হবে—সত্যই কে ঠকেছে, অন্যায় কোথায় !

তিন

যে গুরুতর অপরাধের অজুহাতে বিচারক আসামীর প্রতি দণ্ডবিধানে সমুৎসুক, আসামী কথার সূত্রে অপূর্ব্ব কৌশলে সেই অপরাধ বিচারকের উপর চাপাইয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিল—আপনিই বলুন, অপরাধ কার—অন্যায় কোথায় ?

এক্ষেত্রে উদ্ধত আসামীর স্পর্দ্ধা, সাহস ও ধৃষ্টতায় বিচারকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবারই কথা। কিন্তু বধূর তরফ হইতে এমন প্রচণ্ড আঘাত

পাইয়াও কোপনস্বভাব কর্ত্তার ধৈর্য্য-বোমা ফাটিয়া উঠিল না, দুই চক্ষু পাকাইয়া তর্জ্জন তুলিতেও শোনা গেল না; বরং তাঁহার মুখের পূর্ব্ব ভাবটুকু আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। বাহিরে যে জীবটির অপূর্ব্ব সাহস ও শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন, প্রতিপালকস্থানীয় হইয়াছেন, অন্যের সম্বন্ধে সে যতই উদ্ধত হউক, তাঁর নিকট মুখ নীচু করিয়াই থাকিবে, পীঠে চাবুক পড়িলেও তাহার ত চোখ পাকাইয়া চাহিবার কথা নহে! কিন্তু সেই জীবই আজ তাঁহাকে তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কঠিন ও রূঢ় হইতে দেখিয়া, সুকৌশলী আততায়ীর ক্ষিপ্রতায় তাঁহার চিত্তের ক্ষতস্থানটুকু লক্ষ্য করিয়া এমন ভাবে যে আক্রমণ করিয়া বসিবে, তাহা তিনি ধারণাও করেন নাই। সুতরাং দারুণ বিরক্তিজনিত রূঢ়তার ছায়াটুকু তৎক্ষণাৎ মুখেই মিলাইয়া গেল ও সেই স্থলে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়ের গভীর রেখা।

দুর্ম্মুখ শ্বশুর ও মুখরা বধূ উভয়েই ক্ষণকাল নীরব—কাহারও মুখে কথা নাই। কর্ত্তা এই নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিলেন, গম্ভীরভাবেই কহিলেন—খাসা! বাঃ! হাঁ, নিজের কথার খেইটুকু যদিও আমি হারিয়ে ফেলেছি তোমার মুখের কথার তোড়ে, বৌমা, তবুও তোমাকে বাহোবা না দিয়ে পারছি না!

যদিও কর্ত্তার মুখ দিয়া নরম সুরেই কথাগুলি বাহির হইল, কিন্তু বধূর কানে সেগুলি যেন বিদ্রূপের মতই শুনাইল; দুই চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া সে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল।

চোখোচোখি হইতেই শ্বশুর কথার সুর অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়া কহিলেন—একটা গল্প তা হলে বলি শোনো, তা হলেই আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারবে, বৌমা!—এক ভারী যোদ্ধা ছিল, তলোয়ার চালাতে তার মত ওস্তাদ সে অঞ্চলে আর দুটি ছিল না। এক দিন হঠাৎ খবর এল, আর এক যোদ্ধা এসে তার ভাইকে কেটে ফেলেছে। কথাটা

শুনেই তার মাথায় খুন চেপে উঠল—তলোয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে তখনই ছুটলো সেই ভ্রাতৃঘাতী দুষমনের সন্ধানে। খানিক দূর যেতেই ভায়ের দেহ তার চোখে পড়ল; সে স্তব্ধ হয়ে দেখলে, আততায়ী তার তলোয়ারের একটি চোটেই কাঁধ থেকে কোমর পর্য্যন্ত একেবারে পৈতে-কাটা ক'রে তাকে কেটেছে! দেখেই তার মাথায় খুন আর মনের রাগ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; বাহোবা দিয়ে ব'লে উঠলো সেই দুর্জ্জয় যোদ্ধা—'ক্যেয়া হাতকা সাফাই!'—এখন তোমার সম্বন্ধে আমার মনের অবস্থাও হয়েছে কতকটা এই রকমই, বুঝেছ?

বধূ শ্বশুরের এই মন্তব্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—কিন্তু আমার মনে হয়, বাবা, এটুকু সাময়িক মোহ ছাড়া আর কিছু নয়! একটু পরেই সেই যোদ্ধা নিশ্চয়ই তাঁর ভ্রাতৃঘাতিকে শাস্তি দিয়েছিলেন, আর এখানেও আমার মুখের দুটো কথায় এ মামলা অবশ্য ফেঁসে যায় নি, এর নিষ্পত্তি একটা হবেই।

কিন্তু মামলার মোড় ত তুমিই ফিরিয়ে দিয়েছ, বৌমা; তোমার বিরুদ্ধে যে নালিশ চলছিল, তুমি ত সে নালিশ আমার ওপরেই চালিয়ে দিলে!

অনেক নালিশের নিষ্পত্তি ত আপনাকে করতে হয়েছে, বাবা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে মামলার বাঁধুনীতে গলদ থাকে, শেষ পর্য্যন্ত তা ধোপে টে'কে না—ফাঁস হয়ে যাবেই; আর, এমন অনেক মামলার কথাও শোনা গিয়েছে, যেখানে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে জাত-সাপ বেরিয়ে প'ড়ে সমস্তই ওলটপালট ক'রে দিয়েছে!

কি রকম?

এই ধরুন, খুনী আসামীর বিচার চলেছে; সাক্ষীদের কথায় প্রমাণ হয়ে গেল, সেই খুন করেছে; হাকিমের মনেও সেই বিশ্বাস; ফাঁসীর হুকুম হয় আর কি! এমন সময়, যাকে খুন করা হয়েছে ব'লেই মামলা,

সেই মরা মানুষ সশরীরে আদালতে এসে হাজির! সবাই অবাক্, এক মিনিটেই মামলার গতি ঘুরে গেল।

বধূর কথাগুলি নিবিষ্টভাবেই শুনিয়া কর্ত্তা একটু শ্লেষের সুরেই প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু যে হাকিম ঐ মামলার বিচার করতে বসেছিল, এত বড় গলদটা পাল্টা নালিশের মত বোধ হয় তারই ঘাড়ে আসামী চাপিয়ে দেয় নি?

কি সূত্রে এই শ্লেষাত্মক প্রশ্ন, তাহা বুঝিতে বধূর বাধিল না, শ্বশুরের মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই সে সহজকণ্ঠে উত্তর দিল—হাকিমের ত কোন দোষ ছিল না; যা নিয়ে মামলা, তার সঙ্গে বিচারকের নিজের সম্বন্ধ যদি না থাকে, তাঁর বিরুদ্ধে কেনই বা নালিশ উঠবে বলুন! পাল্টা নালিশ অবশ্য উঠেছিল সেই লোকটার বিরুদ্ধে, যে খুনের এত্তেলা দিয়ে মামলার তদ্বির করেছিল। আর আপনি যা বললেন বাবা, একখানা বিলিতি কেতাবে তার কথাও পড়েছি।

বিস্ময়ের সুরে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—কি?

বধূ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—ও দেশের এক বড়লোকের ছেলে নাম ভাঁড়িয়ে কলেজের একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ করে, তারপর একটি বছর তার সঙ্গে ঘরকন্না ক'রে স'রে পড়ে। মেয়েটি তখন মনের দুঃখে পাপের পথেই এগিয়ে যায়। বিশ বছর পরে সেই মেয়েটিই এক খুনী মামলায় আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়; বিচারক তার সুচেহারা ও উচ্চশিক্ষার পরিচয় পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কাব তুমি কেন করলে? মেয়েটি তখন তার পূর্ব্বকথা সমস্তই প্রকাশ ক'রে বললে—আমার এই অধঃপতনের মূলে সেই প্রতারক; আপনিও ত বিচারক, আমার অপরাধের বিচার করতে বসেছেন, কিন্তু আমি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছি, সে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, তাকে ধরে এনে তারও বিচার করা কি আপনার কর্ত্তব্য নয়?

কৌতূহলের স্বরে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—বটে! সে ত আচ্ছা মেয়ে—তা হাকিম কি করলেন তারপর?

বধূ কহিল—সেই প্রতারকের নাম জানতে চাইলেন। মেয়েটি নাম তার বললে—কিন্তু সে নাম যে বাজে, তাও জানিয়ে দিলে। এইবার বিচারক সাধারণ চোখেই মেয়েটির দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমারও কি তখন এই নাম ছিল? সেই ঘটনার পর মেয়েটিও তার নাম পাল্‌টে ছিল, বিচারকের প্রশ্নে মাথা নেড়ে তার আসল নামটি শুনিয়ে দিলে। তখনই বিচারকের হাত থেকে কলম প'ড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—আমিই সেই প্রতারক, এর পরও যদি এই মামলার বিচার আমাকেই করতে হয়, তা হ'লে বিচারাসন কলঙ্কিত হবে।

বিস্ময়ের আবেগে কর্ত্তা কহিলেন—এমন! তারপর কি হ'ল তাদের?

বধূ কহিল—মেয়েটার ফাঁসী হ'ল না বটে, কিন্তু জেল হ'ল; আর জজ সাহেব যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে একটা মিশনে ঢুকে পড়লেন।

বধূর দিকে চাহিয়া এইবার কর্ত্তা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—তোমার দেখছি পড়াশুনাও বেশ আছে, বৌমা!

বধূ দৃষ্টি নত করিল, কোনও উত্তর দিল না।

ইংরেজিও তা হ'লে জান?

সহজ কণ্ঠে বধূ উত্তর দিল—আমার দাদামহাশয় অনেকগুলো ভাষাই জানতেন, ইংরেজিতেও তিনি পণ্ডিত ছিলেন। আমার যা কিছু শিক্ষা তাঁরই কাছে।

জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্তা কহিলেন—ইংরেজিতেও যে তুমি লায়েক হয়ে আছ, তা আমি ভাবি নি।

বধূর কানে শ্বশুরের এই কয়টি কথা যেন তীক্ষ্ণ হইয়াই বিঁধিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা না তুলিয়া, এই আলোচনার মোড় ফিরাইবার অভিপ্রায়েই সে কহিল—তা হ'লে এখন আমার ওপর আর কি হুকুম, বাবা ?

বধূর মুখের ঈষৎ ক্ষোভের রেখাটুকু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সহসা কঠিন স্বরে কর্ত্তা কহিলেন, আসল কাজের ত এখনও কিছু হয় নি, মাঝে থেকে কতকগুলো বাজে কথা তুলে সময়টা কাটিয়ে দিলে; ভেবেছিলে, ঐ সব নজীর দেখিয়ে তোমার মামলটা চাপা দেবে। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়—তোমার কথায় আমি ভুলি নি, তোমার ঐ সব কথায় আমি কান দিয়েছি ব'লে তুমি যদি ভেবে থাক বিচারের কথা আমি ভুলে গিয়েছি, সে তোমার মস্ত ভুল।

শ্বশুরের এই কথায় বধূর মুখে ক্লেশের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি তাহাতে বিদ্যুতের মত হাসির একটু তীক্ষ্ণ ঝিলিক তুলিয়া সে কহিল—এতক্ষণ পরে আমার সম্বন্ধে কি এই ধারণাটুকুই আপনি স্থির ক'রে নিয়েছেন, বাবা ?

হাঁ, যদি তাই করা হয়, সেটা কি অন্যায় হয়েছে তুমি বলতে চাও ?

এ ভাবে আপনার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করা আমার পক্ষে হয় ত অন্যায়, আমি শুধু বলতে চাই, আমার বিরুদ্ধে যে নালিশ আপনি শুনেছেন, আমি তা মেনে নিচ্ছি, আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন।

আর তুমি যে নালিশ তুলেছ আমার বিরুদ্ধে আমারই কাছে, তার কি হবে ?

আমি তা তুলে নিচ্ছি।

তা হয় না ; যে কথা আমার বিরুদ্ধে তুমি বলেছ, তোমাকে তা প্রমাণ করতেই হবে। না পার বাড়ীশুদ্ধ সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে তোমাকে বলতে হবে—তুমি অন্যায় করেছ, মিথ্যে বলেছ।

তা হ'লে প্রকারান্তরে আমাকেই মিথ্যা বলতে হয়, কিন্তু ঐ কাজটি আমাকে দিয়ে হবে না, বাবা। আমি যা-যা বলেছি, তার কোনটি যে মিছে নয়, আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন।

আমি জানি ?

হাঁ, জানেন আপনি।

বৌমা !

আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন, বাবা, কিন্তু আগেকার কথা সবই ভুলে গিয়েছেন ! দু'বছরের কোলের ছেলেটিকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমাদের মা—ঐ ঘরে দেবীর মত যাঁর ছবি এখনও জ্বল্-জ্বল্ করছে—স্বর্গে চলে যান !

হাঁ, স্বীকার করছি তোমার কথা ; আর, বাগুলীশুদ্ধ সবাই এ কথা জানে ! কিন্তু তাতে কি হয়েছে ?

মা এই অনুরোধটুকু যাবার সময় ক'রে যান, যেন তাঁর খোকার কোনও খোয়ার না হয়, তার ওপর বরাবর আপনার নজর থাকে, মা নেই ব'লে ছেলে যেন অনাদর না পায়। আপনি তাতে সায় দিয়েছিলেন।

সম্ভব ; কিন্তু এ কথা আজ তোলবার মানে ? আর, তুমিই বা এ সব কথা জান্‌লে কি ক'রে ?

কুলবধূর অধিকারটুকু দিয়ে এ বাড়ীতে আমাকে এনেছেন বলেই এসব কথা জানা আমার পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল বাবা, আর জান্‌তে পেরেছিলুম বলেই আপনার সামনে মুখ তুলে আজ বলতে সাহস পাচ্ছি, আমাদের মার মৃত্যুশয্যায় ব'সে আপনি যে তিনটি প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছিলেন, তার কোনটিই রাখতে পারেন নি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বধূর মুখের দিকে চাহিয়া শ্লেষের সুরে শ্বশুর কহিলেন—

অথচ দু'বছরের সেই মাতৃহীন শিশুটি আজ যৌবনের সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ; আর তারই হাতখানি ধ'রে তুমি এ বাড়ীর কুলবধূ হয়ে ঢোকবার অধিকারটুকু পেয়েছ !

শ্বশুরের এই রূঢ়-বিদ্রূপে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া তেজোদৃপ্ত স্বরে বধূ কহিল—ছেলেকে বড় ক'রে তুলেছেন, তারই গৌরব আপনি করছেন, বাবা। পরক্ষণে কি ভাবিয়া কণ্ঠের স্বর সহজ করিয়া বধূ কহিল—বিনা তদারকে বাগানের ভেতর দু'একটা এমন গাছও থাকে, আর দশটা গাছের আওতায় যারা বেড়ে ওঠে ; কিন্তু সে ভাবে তাদের বাড়াটা কি শ্রেয়স্কর, তাতে সার্থকতা কিছু আছে ?

বৃদ্ধ এবার নির্ব্বাক্ ! কি কথায় কোন্ কথা আসিয়া পড়িল ! স্তব্ধবিস্ময়ে তিনি বধূর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, এ কথার উত্তর তাঁহার মুখে তৎক্ষণাৎ যোগাইল না। শ্বশুরকে নিরুত্তর দেখিয়া বধূই পুনরায় কহিল—বয়সের দিক দিয়ে ছেলেকে শুধু বাড়তেই দিয়েছেন, কেন না, সেটা দাবিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু আর সব দিক দিয়েই তাকে ধরে-বেঁধে ছোট ক'রে রেখেছেন ! এত বড় আপনার জমিদারী, সমস্তই আপনার নখদর্পণে, কিন্তু বাড়ীর ভেতর থেকেও ঐ ছেলেটির দিকে আপনি দৃষ্টি দেবারও অবসর পান নি।

বিচলিত হইয়া এবার কর্ত্তা সজোরে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—তুমি এ সব কথা আমাকে বলতে সাহস পাচ্ছ, বৌমা ?

মুখের কথায় রীতিমত জোর দিয়াই বধূ কহিল—সত্য কথা বলতে ত সাহসের অভাব হয় না, বাবা ! আমি যে সব কথা বলছি, হয় ত আপনার ভাল লাগবে না, কিন্তু সব কথাই সত্য। মা-হারা ছেলের কান্না আপনি বরদাস্ত করতে পারেন নি, মাইনে করা দাসীদের কাছে তাকে সঁপে দিয়েছিলেন। তারা সহরের ফেরত, ছেলে শান্ত করবার ওষুধ জানত ! ছেলের কান্না আর কানে বাজে না, আপনি খুসী হলেন ; কিন্তু প্রহরে-

প্রহরে বিষ গিলিয়ে যে তারা ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখছিল, তার সন্ধান কোনও দিন নিয়েছিলেন বাবা ?

বিষ গিলিয়ে ঘুম পাড়াত !

হুধের সঙ্গে মরফিয়া খাওয়াত, ছেলে তাতে সহজে ঘুমিয়ে পড়ত, বায়না আর তুলত না ; এমনি ক'রে বছরের পর বছর দাসীদের আদর-যত্ন পেয়ে ছেলের মন দিন দিন মুসড়ে পড়ে, বাড়তে পারে নি !

বধূর এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথায় অতীতের স্মৃতি যেন কর্ত্তার মস্তিষ্কে তাল-গোল পাকাইয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল ; মনের বিক্ষোভ সবলে দমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ সব কি অদ্ভুত কথা তুমি বলছ, বৌমা, যা আর কেউ জানে না, আমি জানি না, তুমিই শুধু—

চিত্তের বিষম চাঞ্চল্যে কর্ত্তার মুখের কথা আর শেষ হইল না, বধূই সঙ্গে সঙ্গে কথার খেইটুকু ধরিয়া উত্তর দিল—শুধু আমি নই বাবা, যারা এ কাজ করেছিল, তাদের মধ্যে রাখালী চ'লে গেছে, ক্ষ্যামা ম'রে গেছে, বেঁচে আছে শুধু নিস্তারিণী ; পক্ষাঘাতে একটা অঙ্গ তার প'ড়ে গেছে, দিনও তার ফুরিয়ে এসেছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবেন।

বধূর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া কর্ত্তা কহিলেন—তুমি এখানে এসেই এত খবর নিয়েছ—অথচ এতগুলো বছরের ভেতর, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই কোন দিন শুনি নি !

বধূ এবার একটু হাসিয়া কহিল—আপনি যে এ সব কিছুই জানতেন না, সে কথা ঠিক ; কিন্তু এর জন্যে যে অপবাদ, আপনি তা থেকে ত রেহাই পেতে পারেন না, বাবা ! আপনার জমিদারীর হাজার হাজার প্রজার ঘরের সমস্ত খবরই আপনি রাখেন, সে দিকে আপনার কড়া নজর, তাতে সবাই ধন্য ধন্য করে, কিন্তু নিজের বাড়ীর ভেতর এত বড় অনাচার আপনি তার কোন খবরই সংগ্রহ করতে পারেন নি ! এই জন্যেই আমি

বলতে সাহস পেয়েছি বাবা, আপনার আচরণে ওঁরা ঠকেছেন! এখন আপনিই বলুন, আমার বলাটা কি অন্যায় হয়েছে?

কর্তা আড়-নয়নে বধূর উজ্জল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার স্পর্দ্ধার কথাগুলি সমস্তই শুনিলেন। পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে মনে মনে কি ভাবিলেন, মুখে গাম্ভীর্য্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া নির্গত হইল—ন্যায়-অন্যায় বিচার হবে পরে, তার আগে তোমার তূণের সব কটা তীরই ছোড়া ত হয়ে যাক্!

শ্বশুরের মুখের কথাগুলি, বলিবার ভঙ্গিতে তীরের মতই বধূর মর্ম্মে বিঁধিল; কিন্তু মুখে ক্লেশের ভাবটুকু প্রকাশ না করিয়া বধূ সামান্য একটু হাসিয়াই উত্তর দিল, আপনি গুরুজন, আদেশ যখন করেছেন, বাবা, তূণ আমি খালি করবই, কিন্তু এখনই কি তার প্রয়োজন হবে?

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর হইল—নিশ্চয়ই; এর নিষ্পত্তি আগে ক'রে তারপর অন্য কাজ; রেহাই কারুর নেই, তোমারও নয়, আমারও নয়।

বধূ শ্বশুরের কথার শেষাংশে সায় দিয়াই কহিল—ভগবানের রাজ্যে কাজের জবাবদিহি যে সবাইকেই করতে হয়, রেহাই পাবার যো কি! হিসেব ফেলে রাখলে, একদিন সমস্ত জড় হয়ে গোল বাধায়; কাজেই অনেকগুলো বছরের ফেলে-রাখা হিসেবের তলব যখন আজ পড়েছে, বাবা, সহজে রেহাই পাবার ত উপায় নেই; তবে ভয় হচ্ছে, পাছে এই সূত্রে মনে বেশী রকমের আঘাত পান।

বধূর কথাগুলি শ্বশুরকে যদিও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার কৌতূহলটুকুও তাহাকে ব্যগ্র করিতেছিল; কথা শেষ হইতেই তিনি মনের ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন—আমি পাছে আঘাত পাই, সেই জন্যই তোমার ভাবনাটা বুঝি এখন বড় হয়ে উঠেছে, বৌমা! এটা বুঝি পাঞ্জাবী সভ্যতার কায়দা?

গ্রীবা তুলিয়া বধূ রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল—একথা কেন বল্‌লেন, বাবা?

কথাটা বধূকে আঘাত দিয়াছে বুঝিতে পারিয়াই কর্তা গম্ভীর হইয়া কহিলেন—শুনেছি, ওরা একখানা হাত পায়ে আর একখানা হাত গলায় রেখে লোকের সঙ্গে কথা কয়, ভদ্রতা রক্ষা করে!

বধূ তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—সে হয় ত দেনা-পাওনার ব্যাপারে, যারা মহাজনী করে, তাদের সম্বন্ধে হয় ত এ কথা বলা চলে; কিন্তু দেনা-পাওনা নিয়ে ত আমাদের কথা হচ্ছে না, বাবা! আর মহাজন হয়েও ত আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কই নি!

কর্তা এবার সহসা উত্তেজিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—নিজের কথাতেই এবার ধরা প'ড়ে গিয়েছ তুমি! একটু আগেই হিসেবের কথা তোমার মুখেই শুনেছি; দেনা-পাওনা নিয়েই ত এই ঝঞ্ঝাট! মহাজন হয়েই ত তুমি আমার সামনে আজ দাঁড়িয়েছ, বৌমা—তোমার পাওনা আদায় করতে।

বধূ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সপ্রতিভ কণ্ঠেই কহিল—বেশ, আপনার কথাই আমি তা হ'লে মেনে নিচ্ছি বাবা; কিন্তু রাগ করবেন না, একটা কথা আমি জানতে চাইছি—যে দেনা আপনি এ পর্য্যন্ত করেছেন আমাদের কাছে, পরিশোধ করতে পারবেন?

বধূর এই প্রশ্নে স্তব্ধ হইয়া কর্তা কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার উৎসাহদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে কহিলেন—কি চাও?

উদ্দীপ্তকণ্ঠে বধূ এবার উচ্ছ্বাসের সুরে উত্তর দিল, এতে চাইবার কি আছে; যদি থাকত, আগেই চাইতুম, বধূর অধিকারটুকু যখন পেয়েছি—তার জোরেই; কিন্তু এখন চাওয়া বৃথা—কেন না, এ দেনা শোধ করবার সামর্থ্য আপনার নেই।

কণ্ঠস্বর অতিশয় কর্কশ করিয়া কর্ত্তা কহিয়া উঠিলেন—আমার সামর্থ্য নেই ?

বধূ তাহার কোমল কণ্ঠস্বরে বিশেষভাবে জোর দিয়া কহিল—না, বাবা, নেই।

স্বর অপেক্ষাকৃত কোমল ও মৃদু করিয়া কর্ত্তা কহিলেন—আমার মুখের ওপর জোর ক'রে তুমি এ কথা বলছ ?

শ্বশুরের এ কথার উত্তরে বধূ গাঢ়স্বরে প্রতি কথাটি সুস্পষ্ট করিয়া কহিল, আপনিই আমাকে বলালেন যে, বাবা। আমার কি দোষ বলুন ? বেশ, দেনার ফেরিস্তি আমি দেখাচ্ছি, শোধ করতে পারবেন ?—আপনার ত অর্থের অভাব নেই, ঐশ্বর্য্যও রাজার মতন, শক্তি-প্রতিপত্তি প্রচুর, তবুও আপনার উপযুক্ত ছেলের এ অবস্থা কেন ? শিক্ষা পায় নি, সহবত শেখান নি, বাহ্যজগতের সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশটুকুও তাকে দেন নি ; অথচ ছেলের অবস্থা চেপে রেখে শুধু জমিদারী-চাল চেলে তাকে আমার সরল বাবার কাছে চালিয়ে দিয়েছেন! আমার বাবা না জানলেও আমি ত জেনেছি, আমার কাছে আপনি কত বড় দেনা করেছেন, আপনিও মনে মনে জেনেছেন, আমাকে কি ভাবে ঠকিয়েছেন! এর ক্ষতি আপনি পূরণ করতে পারবেন, আপনার জমিদারী—সঞ্চিত সমস্ত টাকাকড়ি, আর শক্তি-প্রতিপত্তি দিয়ে ?

অধৈর্য্যভাবে কর্ত্তা উত্তর দিলেন—তুমি যে দেখছি আবল-তাবল যা' তা' বলে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলে, বৌমা! মেয়েমানুষের জিবের এতটা দৌড় ত ভাল নয়!

বধূর উৎসাহ তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, শ্বশুরের বাধায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্বাসের সুরেই কহিল—তা হ'লে একবার দয়া করে ঐ ঘরে চলুন, বাবা, আমাদের মায়ের ছবি সেখানে জ্বল্-জ্বল্ করছে, তাঁর মুখের দিকে যদি একটিবার চান, ঠিক এই প্রশ্নই আপনার মনের বন্ধ

দরজায় আঘাত দেবে ; আপনাকে মানতেই হবে, ছেলের সম্বন্ধে অবহেলা ক'রে আপনি সেই সাধ্বীর অন্তিম অনুরোধটুকু উপেক্ষা করেছেন, এখন আর কোনও প্রতিকার কর্‌তে পারেন না।

স্বর্গগতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর কথাপ্রসঙ্গে সহসা কর্ত্তা যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন, অতীতের বহু পুরাতন কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল, দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত ও কণ্ঠ যেন তাহার আবর্ত্তে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শ্বশুরের মুহ্যমান অবস্থা দেখিয়াও বধূ তাহার প্রহরণ সম্বরণ করিল না, কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়াই পুনরায় সে কহিল—আর আপনার ছেলেও যদি এ সম্বন্ধে আপনার কাছে অভিমান ক'রে বলে—

ছেলের কথা উঠিতেই স্তব্ধ নীরব মেঘের বুক চিরিয়া সরব অশনি যেন হুঙ্কার দিয়া উঠিল। বিকৃতমুখে তিক্তস্বরে কর্ত্তা কহিলেন—আমার ছেলে! অর্থাৎ তোমার স্বামী! কিন্তু তাঁরও অভিমান করবার এক্তিয়ার কিছু আছে না কি? আমরা ত জানি, ভগবান্ তাঁকে এ বংশের দুলাল ক'রে পাঠিয়েছেন—তাঁর মাথার ভেতর গোবর পুরে দিয়ে! এরই মধ্যে ঐ অসার পদার্থ টুকু বুঝি সার হয়ে উঠেছে তোমারই সংস্পর্শে?

স্বামীর সম্বন্ধে পূজনীয় শ্বশুরের মুখে এই রূঢ় মন্তব্য শুনিয়া বধূ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও মুখে বা কথায় তাহা প্রকাশ না করিয়া অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত বেশ সহজ কণ্ঠেই এর উত্তর দিল—ভগবান্ সত্যই যার ওপর বিরূপ হয়ে অসার ক'রে সংসারে পাঠান, মানুষ কি কখনও তাকে শোধরাতে পারে, বাবা? যে অন্ধ হয়ে জন্মায়, কিংবা কালা, বোবা বা বিকলাঙ্গ হয়ে দুনিয়ায় আসে, কেউ তাকে সারাতে পারে না। আমিও ত মানুষ, আমার শক্তি কতটুকু! হাঁ তবে এ কথা আমি অস্বীকার করব না বাবা, তাঁর ভুলটুকু আমি ধরিয়ে দিয়েছি; তাই তিনি আজ দেখতে পেয়েছেন, ভগবান্ তাঁর মাথার ভেতরে গোবর

পূরে দেন নি, বাড়ীর মাতব্বররাই তাঁর মাথার উপরে গোবরের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন।

কি রকম?

ভগবানপণ্ডিত দশচক্রে রাজার কাছে যে ভাবে ভূত সাব্যস্ত হয়েছিলেন, এঁরও অবস্থা অনেকটা সেই রকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাবা। গোড়াতেই আপনাকে বলেছি দাসীদের অত্যাচারের কথা, তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল স্বার্থ নিয়ে অত্যাচার।

স্বার্থ নিয়ে অত্যাচার! কাকে লক্ষ্য ক'রে এ কথা তুমি বললে শুনি?

আপনি কি মনে মনেও তা অনুমান করতে পারেন নি বাবা, যে, আমাকে আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে?

তা হ'লে তোমার নালিশ শুধু দাসীদের ওপর নয়, আরও ওপরে ছুটেছে? আস্পর্দ্ধা তোমার যে, আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও—বড় হয়ে উঠলেও খোকাকে চক্রান্ত ক'রে বেকাম করা হয়েছে!

বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা, কিন্তু কথার পিঠে কথা যখন উঠেছে, আর যে কথা আমি সত্য ব'লে জেনেছি, আমি কেন গোপন করব, বলুন!

ওঁকে বেকাম সাব্যস্ত ক'রে চক্রান্তকারীদের লাভ?

এ কথা জিজ্ঞাসা করাই যে বাহুল্য হচ্ছে, বাবা! আপনার জমিদারীর সাধারণ প্রজারাও জানে, ছেলে যদি বেকাম হয়, বড় হলেও সে জমিদারীর গদীর ওপর বসতে পারে না, তাকে ছোট ভায়েরই হাত-তোলা হয়ে থাকতে হয়!

বধূর এই নির্ভীক উক্তি শুনিয়া বৃদ্ধ আরাম-কেদারার হাতলটির উপর সবলে আঘাত করিয়া চীৎকার তুলিলেন—উঃ, কি সর্ব্বনাশ! তুমি আমার এষ্টেট তছনছ করতে এসেছ—গাঙ্গুলী-সংসার ভাঙ্গতে হাত তুলেছ!

বধূও সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—না বাবা, আমি আপনার ভুল-টুকুই শুধু ভেঙ্গে দিতে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছি।

বটে! কিন্তু ভুল শুধু আমি করি নি; খোকা যে জড়-প্রকৃতি নিয়েই জন্মেছে, মাথায় তার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, কস্মিন্‌কালেও সে মানুষ হবে না—বড় বড় বিদ্যাদিগ্‌গজরা তার ভার নিয়ে শেষে ঐ কথা ব'লে এলে দিয়ে গেছে।

যে কোনও কারণেই হোক, তাঁরাও ভুল করেছেন ওঁর সম্বন্ধে।

আমি বাবা, আমি ভুল করেছি; বছরের পর বছর মোটা মোটা মাইনে নিয়ে যারা তাকে নাড়াচাড়া করেছে, তারাও ভুল করেছে, আর ক'টা দিনের চেনা-শুনায় তুমিই শুধু তাকে চিনেছ?

বধূ নিরুত্তরে দৃষ্টি নত করিল, কিন্তু তাহার মুখে দৃঢ়তার রেখাগুলি আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল। বক্র দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা কহিলেন—তা হ'লে তুমি জোর করেই আমাকে বুঝাতে চাইছ যে, খোকার মাথার মধ্যে কোনও গোল নেই; আমরা তাকে যতটা অপদার্থ মনে ক'রে আসছি, সে তা নয়—এই ত?

বধূ সুস্পষ্টস্বরে উত্তর দিল—আমার কথা ত আগেই বলেছি, বাবা!

অনেক কথাই ত তুমি বলেছ, বৌমা! কিন্তু একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার সামঞ্জস্য যদি না হয়, কোন কথার উপরেই নির্ভর করা যায় না। প্রথমেই তুমি বলেছ, ঝুটো মাল আমি চালিয়ে তোমাকে ঠকিয়েছি!

মাল ঝুটো জেনেই ত আপনি চালিয়েছিলেন, বাবা। এখনও আপনার মনে দৃঢ় ধারণা, সে মাল ঝুটোই!

আমি না হয় এ কথা স্বীকার করছি; কিন্তু তোমার মুখেই পুনরায় শুনতে পাচ্ছি, সে মাল ঝুটো নয়, আসল। তোমার কোন্ কথাটি তা হ'লে প্রকৃত?

বধূ বুঝিল, বিচক্ষণ শ্বশুর তাহার কথার খুঁৎটুকু ধরিয়াই তাহাকে আঘাত করিতে যে অস্ত্র উদ্যত করিয়াছেন, তাহা অব্যর্থ। যে জন্ত শ্বশুরকে সে অনুযোগ করিতে সাহস পাইয়াছিল, তাহারই শেষের কথায় তাহা খণ্ডন হইয়া যায়। কিন্তু অসাধারণ উপস্থিত-বুদ্ধির প্রভাবে বধূ তৎক্ষণাৎ দুইটি কথার সামঞ্জস্য করিতে প্রস্তুত হইল, কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া বেশ সহজকণ্ঠেই সে উত্তর দিল—বিয়ের বাসরে সকলেই জেনেছিল, সোণা ব'লে আপনি পেতল চালিয়ে দিয়েছেন, বাবা। কিন্তু আমি তাদের সে ধারণা ঘুরিয়ে দিয়েছিলুম, নইলে সেখানেই একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড কিছু বেধে যেত।

বটে!

আমার দাদা মহাশয়ের আশীর্ব্বাদেই আমি বাসরেই জানতে পেরে-ছিলুম বাবা, আপনি আমাকে ঠকাবার চেষ্টা কর্‌লেও আমি ঠকি নি—আসল বস্তু তার মধ্যে আছে, এক দিন সোণা হবেই। তাই কোনও গোল আর বাধে নি, আমারও নালিশ করবার প্রয়োজন হয় নি। আপনি জানতেন, কি আমাকে দিয়েছেন; আমি জেনেছিলুম, কি ভেবে দিয়েছেন; কিন্তু আমি কি পেয়েছি, সে কথা ত আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নি কোনদিন, বাবা!

বদ্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া কর্ত্তা সহসা প্রশ্ন করিলেন—সেই সোণার চাবুকটা কি উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দিয়েছিলুম, মা?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বধূ উত্তর দিল—এখানেও সেই ভুল আপনি করেছিলেন বাবা, সেই জন্যই এ বাড়ীতে এসেই আমাকে স্বর্ণ-গর্দ্দভের সন্ধানে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল।

আর, সে সমস্যা তোমার সোজা ক'রে দিয়েছিল নিবারণ! কিন্তু মা, তুমিও ঐখানে মস্ত ভুল করেছ, নিবারণ স্বর্ণ-গর্দ্দভ নয়, স্বর্ণ-সিংহ।

হাসিমুখেই বধূ কহিল—সিংহের চামড়া প'রে একটা গর্দ্দভও কিছুকাল বনে রাজত্ব করেছিল, বাবা। কিন্তু বেশীদিন তার ধাপ্পাবাজী চাপা থাকে নি ;—এ গল্প আপনি অবশ্যই শুনেছেন !

সহসা অসহিষ্ণুভাবে রুক্ষস্বরে কর্ত্তা কহিয়া উঠিলেন—কিন্তু তোমার সেই সত্যিকার সিংহটি কোথায় ? এক ঘণ্টার ওপর ত আমাদের তক্রার চলেছে, বাইরের দরজায় আমি যদি পাহারা বসিয়ে না আসতুম, মহলসুদ্ধ সবাই এখানে ছুটে আসত। কিন্তু তাঁর সাড়াশব্দও কিছু নেই —নিজের গুহায় প'ড়ে ঘুমুচ্ছেন, কিম্বা ল্যাজ নাড়ছেন হয় ত ! আর, ও যদি নিবারণ হ'ত, তা' হ'লে—

শ্বশুরের কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই বধূ অসঙ্কোচে কহিল—নিবারণের সঙ্গে ওঁর পার্থক্য এইখানেই বাবা !

অতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে কর্ত্তা বধূর মুখের দিকে চাহিলেন। এই ভয়াবহ দৃষ্টির আঘাত সহ্য করিয়া তাঁহার মুখের কথার পুনরায় প্রতিবাদ তুলিবার মত সাহস কাহারও বড় একটা দেখা যায় নাই ; কিন্তু বধূ অকুতোভয়ে শ্বশুরের আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া সহজ ভঙ্গিতে কোমল কণ্ঠে কহিল—পরের মুখের কথা, আর নিজের মনের অনুমান, এদের ওপর এক তরফা জোর দিলে শেষকালে পস্তাতে হয় না, বাবা ?

ভ্রূকুটি করিয়া শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কথার মানে ? কাকে লক্ষ্য ক'রে কথাগুলো বলা হ'ল বৌমা ?

বধূ শ্বশুরের মুখের উপর অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উত্তর দিল—আমি খুব সোজা আর সত্য কথাই বলেছি, বাবা ! যে ভুল বরাবর হয়েছে, এখানেও ঠিক সেই ভুল হচ্ছে ; আপনি যখন বিচার করতেই এসেছেন, দলীল-দস্তাবেজ সবই যখন কাছে মজুত, তখন নিজের চোখে না দেখে ও-কথাগুলো বলা কি ঠিক হয়েছে ?

খুব জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কর্তা কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত রুদ্ধকণ্ঠ হইতে শুধু একটি অনুচ্চ স্বর নির্গত হইল,—হুঁ !

বধূ অপলক-নয়নে দেখিল, তাহাকে কোনওরূপ আহ্বান না করিয়াই তাহার শ্বশুর একাই অলিন্দের দরজা দিয়া তাহাদের পাঠাগারের দিকেই চলিয়াছেন !

চার

পড়িবার ঘরখানির ভিতর এতক্ষণ কতকগুলি জটিল আঁকের সমাধান লইয়া একাগ্রচিত্তে গোবিন্দের অপূর্ব্ব সাধনা চলিয়াছিল ! অন্য কোন দিকেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, বধূ যে বাহিরের দ্বারে আঘাতশব্দ শুনিয়া উঠিয়া গিয়াছে ও এতক্ষণ কক্ষে অনুপস্থিত রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অচেতন। টেবলের উপর প্রসারিত খাতাখানির পৃষ্ঠাতেই তাহার প্রাণশক্তি এমনভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, যেন খাতার বাহিরে আর কাহারও দিকে তাকাইবার বা খাতার আঁকগুলি সমাধা হইবার পূর্ব্বে অন্যদিকে মনকে চালাইবার তাহার নিজেরই কোন সামর্থ্য নাই।

সহসা পরিপূর্ণ উল্লাসে করতালি দিয়া গোবিন্দ কহিয়া উঠিল—ব্যস্ ! —রুল অফ থ্রী ফিনিস ! এবার কি দেবে ?

আনন্দোচ্ছ্বসিতমুখে জিজ্ঞাসুনয়নে সে বধূর আসনের দিকে চাহিয়া দেখিল, বধূ সেখানে নাই এবং মুখখানি রীতিমত গম্ভীর করিয়া যিনি সে স্থলে দাঁড়াইয়া আছেন, এ সময় এ গৃহে এ অবস্থায় সে তাঁহাকে এ ভাবে দেখিবার কোনরূপ প্রত্যাশাই করে নাই ! তাহার মুখের হাসি ও

মনের উল্লাস সেই মুহূর্তেই কোথায় তলাইয়া গেল, এই অবস্থাতেই তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি আজ সহসা সচেতন হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার অজ্ঞাতেই যেন কণ্ঠ হইতে অনুচ্চ স্বর শ্রদ্ধাবিস্ময়ের সুরে বাহির হইয়া আসিল—বাবা! আপনি!!

নিরুত্তর বিস্ময়বিমূঢ় পুত্রের আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধ একখানা চেয়ার টানিয়া আস্তে আস্তে বসিলেন। সুবৃহৎ টেবলখানির উপর অনেকগুলি খাতা ও নানাবিধ কেতাব কেতাদুরস্তভাবেই রাখা ছিল। এর পর কয়েকখানি বাঁধানো বই হাতে লইলেন, খুলিয়া দুই-চারিখানির পৃষ্ঠাও উল্টাইলেন, কিন্তু কোনও গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর যে খাতাখানি লইয়া গোবিন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গণিতের সাধনায় মগ্ন ছিল, সেইখানি তুলিয়া ইংরেজিতে লেখা অঙ্কগুলির উপর বিস্মিতদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ সব তোমার লেখা, খোকা?

খোকার মুখ হইতে মৃদুস্বরে উত্তর আসিল—হাঁ।

পুনরায় প্রশ্ন হইল—কি আঁক এগুলো?

গোবিন্দ কহিল—রুল অফ থ্রী; আজ শেষ হয়ে গেল!

খাতার পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে কৌতূহলের স্বরে পিতা জানিতে চাহিলেন—তেরিজের কত পরে এ আঁকটা?

পুত্রের মন পিতার প্রশ্নে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল; এমন ভাবে পিতা ত কখনও তাহার সহিত কথা কহেন নাই—আজ তিনি তাহার খাতার আঁক দেখিয়া তাহার কাছেই জানিতে চাহিতেছেন—তেরিজের কত পরে এ আঁক!

উৎসাহের সুরে গোবিন্দ কহিল—ওঃ! তেরিজের অনেক পরে, বাবা! তেরিজ ত য়্যাডিসন—সে ত গোড়ায়, তার পর সবট্রাকসন, তার পর মল্টিপ্লিকেশন, তার পর ডিভিসন, তার পর—

পরবর্ত্তী অঙ্কের নামগুলি বলিবার অবসর পুত্রকে না দিয়াই পিতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা, যে আঁক তুমি শেষ করেছ বললে, ওর বাঙ্গালা নামটা কি?

পুত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—ত্রৈরাশিক, বাবা!

মুখের ভাবটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া পিতা কহিলেন—ওঃ বুঝিছি; এ আঁক ত পাটীগণিতের প্রায় শেষের দিকেই! তুমি ত্রৈরাশিক করছ! বটে!

অধিকতর উৎসাহভরে পুত্র কহিল—শীগ্‌গীর আমি পাটীগণিত শেষ ক'রে ফেলব! তখন, কি মজা!

আনন্দবিহ্বল পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া পিতা কহিলেন—আমি ত শুনেছিলুম খোকা, তেরিজের কোটা তুমি পেরুতে পার নি, মাষ্টাররা হিমশিম খেয়ে এলে দিয়ে পালায়! অথচ, সেই তুমিই আজ ত্রৈরাশিক শেষ করেছ!

পিতার মুখের কথায় পুত্রের মুখখানি আপনিই হেঁট হইয়া পড়িল, সে মুখে যুগপৎ ব্যথা ও লজ্জার চিহ্ন প্রকাশ পাইল।

পুত্রের মুখভঙ্গি লক্ষ্য করিয়াই পিতা প্রশ্ন করিলেন—কবে থেকে আবার কেঁচে-গণ্ডুষ আরম্ভ করা হয়েছে?

আনত-দৃষ্টি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া পুত্র নীরব রহিল। পিতা প্রশ্নটি পুনরায় পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিলেন—আমার কথা কি বুঝতে পার নি খোকা? আমি জিজ্ঞাসা করছি, লেখাপড়ার পাট ত চুলোয় গিয়েছিল, আবার সুরু করা হ'ল কবে থেকে?

ফুলশয্যার রাত থেকে।

বটে! ভাল, ভাল; আচ্ছা, শেখাচ্ছেন কে?

গোবিন্দ আবার মাথা হেঁট করিল, সুন্দর মুখখানি তাহার পিতার এই প্রশ্নে সহসা লাল হইয়া উঠিল। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল বধূর

কথা ; সে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সব কথা হয়, তাহা কাহাকেও বলিতে নাই ! কে তাহাকে পুনরায় লেখাপড়ায় ব্রতী করিয়াছে, আঁক শিখাইতেছে—তাহা বলিতে হইলেই বধূর নাম তুলিবার কথা। কিন্তু তাহার যে নিষেধ ! সুতরাং গোবিন্দ এ প্রশ্ন শুনিয়া নিরুত্তরে মুখ হেঁট করিয়াই রহিল।

পিতা আড়-নয়নে তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন, পরক্ষণে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—এতকাল পরে হঠাৎ আঁকের উপর এ আগ্রহ কেন ?

পুত্র দুই চক্ষু তুলিয়া কম্পিতকণ্ঠে গাঢ়স্বরে উত্তর দিল—মানুষ হতে হ'লে আগেই যে আঁক শিখতে হয়, নইলে মাথা খোলে না।

পিতার পাকা মাথাটির ভিতরে কে যেন সহসা একটি সূঁচ ফুটাইয়া দিল ! মনের ভাব গোপন করিয়া এবার একটু শ্লেষের সুরেই তিনি কহিলেন—বড় বড় মাষ্টারগুলো যখন তোমাকে পাটীগণিতখানা গুলে খাওয়াতে উঠে প'ড়ে লেগেছিল, তখন তোমার মাথার ভেতর ও-কথাটা খেলে নি কেন ?

পুত্র বালকের ন্যায় কোমলকণ্ঠেই উত্তর দিল—ওঁরা ত কেউ আমাকে ও-কথাটা তখন বুঝিয়ে বলেন নি। খালি খালি বল্‌তেন, আমি গাধা, আমার মাথার ভেতরটা খালি গোবরে ভরা, আমার কিছুই হবে না।

তার পর কেউ বুঝি তোমাকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার মাথাটা খালি গোবরে ভরা নয়, চেষ্টা করলে তুমিও মানুষ হ'তে পার ?

পুত্র নিরুত্তরে ঘাড়টি নাড়িয়া পিতার মন্তব্যে সায় দিল। সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধে বধূর তীক্ষ্ণ কথাগুলি পিতার স্মৃতিপথে ভেরীর মত যেন ঝঙ্কার তুলিল—ভগবান তার মাথার ভেতরে গোবর পূরে দেন নি, মাতব্বররাই তার মাথার ওপর গোবরের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে !

অতঃপর নীরবেই তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘরখানির সকল অংশই তীক্ষ্ণ-

দৃষ্টিতে দেখিলেন। বুঝিলেন, সত্যকার পড়াশুনাই এই ঘরে চলিয়াছে। টেবলের উপর পাশা-পাশি যে সকল বই ও খাতা ব্যবহার্য্য হিসাবে পড়িয়া ছিল, তাহাদের ভিতর হইতে একখানি খাতা তুলিয়া পিতা তাহার পাতায় পাতায় পরিষ্কার ছাঁদের লেখা দেখিলেন, পরক্ষণে পুত্রের দিকে চহিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ লেখাও তোমার ?

মাথা নাড়িয়া পুত্র জানাইল, না।

কার হাতের এ সব লেখা ?

পুত্র নিরুত্তরে আবার মাথাটি হেঁট করিল। পিতা বক্রদৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ লেখা তা হ'লে বৌমার ?

পুত্রের চিবুকটি বার দুই নড়িয়া উঠিল এবং তাহাতেই বুঝিতে পারা গেল, পিতার অনুমান সত্য।

খাতাখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া পিতা একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা হ'লে কেবল আঁকের রাস্তা দিয়েই এখন তোমার ছুটোছুটি চলেছে ?

পুত্র দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—আঁক ত খালি নয়, পড়তেও যে হয় অনেক।

বটে! তা' পড়াটা কি ভাবে চলেছে তোমার ?

এই যে রুটিং দেখুন না।—কথার সঙ্গে সঙ্গে একখানি খাতার একটি পাতা খুলিয়া পিতার হাতে তুলিয়া দিল। একটু বড় ছাঁদের বাঙ্গালা অক্ষরে খাতার পূরা পৃষ্ঠাটি ব্যাপিয়া এই অপূর্ব্ব পড়ুয়ার অহোরাত্রের কর্ম্মধারা লেখা রহিয়াছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে পিতা পড়িতে আরম্ভ করিলেন :—

ভোর পাঁচটা হইতে সাড়ে ছয়টা	…প্রাতঃকৃত্যাদি ও ব্যায়াম
সাড়ে ছয়টা হইতে সাতটা	…মাতৃপূজা
সাতটা হইতে সাড়ে সাতটা	…গীতাপাঠ
সাড়ে সাতটা হইতে আটটা	…জলযোগ

আটটা হইতে দশটা ...ইংরেজী
দশটা হইতে বারোটা ...স্নানাহার ও বিশ্রাম
বারোটা হইতে তিনটা ...অঙ্ক
তিনটা হইতে পাঁচটা ...বাঙ্গালা সাহিত্য
পাঁচটা হইতে সাড়ে সাতটা ...জলযোগ, ব্যায়াম ও সায়াহ্নকৃত্যাদি
সাড়ে সাতটা হইতে আটটা ...মাতৃপূজা
আটটা হইতে দশটা ...সাময়িক পত্রিকা পাঠ ও বিবিধ আলোচনা
দশটা হইতে এগারটা ...ভোজন ও বিশ্রাম
এগারটা হইতে রাত্রি বারোটা ...শাস্ত্রপাঠ

পড়া শেষ হইলে খাতাখানি পুত্রের হাতে ফিরাইয়া দিয়া শুধু একটি বিষয়ে পিতা প্রশ্ন করিলেন—মাতৃপূজাটা ?

পুত্র কহিল—ও ঘরে মায়ের যে ছবি আছে, ঐ সময় তাতে ফুলের মালা পরিয়ে ধূপ-ধূনো গঙ্গাজল দিয়ে পূজো করি আর তাঁর কাছে এই ব'লে মানত করি—মা গো ! আমার মনের জড়তা ভেঙ্গে দাও, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরে ক'রে দিয়ে বিবেকের আলো দেখাও, সত্যের পথ ধ'রে আমি যেন সত্যকার মানুষ হতে পারি।

দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে পুত্র পিতার সমক্ষে মাতৃপূজার পদ্ধতি বালকসুলভ সরলতায় ব্যক্ত করিল।

অতি কষ্টে এবার পিতাকে আত্মসম্বরণ করিতে হইল, উদগ্র অশ্রুধারাকে সবলে রুদ্ধ করিতে দুই চক্ষু তাঁহার স্ফীত হইয়া উঠিল ; তাঁহার মনে হইল, বিবাহের দিনেও যুবক-পর্য্যায়ভুক্ত যে পুত্রের মনোবৃত্তি ছয় বৎসরের শিশুর অনুরূপ ছিল, আজ সে যেন সহসা কি এক অলৌকিক যাদুদণ্ডের স্পর্শের প্রভাবে ষোড়শবর্ষীয় অধ্যয়নশীল কিশোরের প্রশংসিত

মনস্বিতা অর্জ্জন করিয়া লইয়াছে ;—এখনও যে কয়টি বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে, এই ভাবে উচ্চ সাধনা চলিলে, তাহার তিরোধানও দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ নহে।

এই সময় পাঠাগারের ঘড়িতে তিনটা বাজিল—সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের ঘণ্টাঘরের ঘোষণাও তাহার সমর্থন করিল। পিতা সচকিত হইয়া জোর করিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিলেন—তোমার ত এখন পড়বার সময় এল, খোকা। বেশ, তুমি পড়া আরম্ভ কর ; আমি একবার ও-ঘরটা দেখে যাই।

কথা শেষ করিয়াই পিতা মধ্যের বড় ঘরখানির দিকে অগ্রসর হইলেন। সময়ের অপব্যয়ে পুত্র অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, এবার সে নিশ্চিন্ত হইয়া এ দিনের পাঠ্য বাঙ্গালা বইগুলি লইয়া বসিল।

পাঁচ

মধ্যের কক্ষে প্রবেশ করিতেই সহধর্ম্মিণীর সুবৃহৎ আলেখ্যখানির উপর হরিনারায়ণবাবুর দৃষ্টি পড়িল।

স্বর্গীয়া পত্নীর এই আলেখ্যখানি বহুবারই তিনি দেখিয়াছেন ; পত্নীর সহস্র স্মৃতিবিজড়িত এই কক্ষের এই স্থানটিতে দাঁড়াইয়া কত দিন অতীতের কত কথাই তিনি স্মরণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, প্রিয়-বিরহের গভীর অনুভূতি কত সুদীর্ঘ নিশ্বাসেই ব্যক্ত করিয়াছেন! কিন্তু আজ সেই পরিচিত কক্ষে, সেই আকাঙ্ক্ষিত আলেখ্য-সমীপে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন কোনও সুপবিত্র পূজা-মন্দিরে এক অপূর্ব্ব দেবী-প্রতিমার সংস্পর্শে আসিয়াছেন! যদিও এই কক্ষের এক পার্শ্বে

মহার্ঘ্য পালঙ্কে শুভ্র শয্যার নিদর্শন রহিয়াছে, তথাপি শুদ্ধাচারের শুচিতায় এখানকার প্রত্যেক বস্তুটিই যেন দেবতার নির্ম্মাল্যের মতই অনিন্দ্য ও অনবদ্য। অতীত জীবনের কত অহোরাত্রিই এই কক্ষে অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও দিনই ত তিনি এখানে সুপবিত্র দেবালয়ের শাশ্বত গাম্ভীর্য্য অনুভব করেন নাই! আর, গৃহের এই পবিত্র সুন্দর পরিস্থিতি গৃহপ্রাচীরে অধিষ্ঠিতা স্বর্গগতা গৃহিণীর প্রতিকৃতির উপরেও কি এক অনন্যপূর্ব্ব দ্যুতির বিকাশ করিয়া দিয়াছে! হরিনারায়ণবাবু দৃষ্টি প্রখর করিয়া দেখিলেন, আলেখ্যের অধিকারিণীর সীমন্তের যে অংশে সিন্দূর-রেখাটি একান্ত ক্ষীণকায় ছিল, তাহা যেন কোন সিদ্ধ হস্তের তুলিকায় স্থূলতর হইয়া জ্বল-জ্বল করিতেছে, শুধু এই পরিবর্ত্তনটুকুতেই তৈলচিত্রের মুখখানির শোভা ও সৌন্দর্য্যের কতখানি না উৎকর্ষ হইয়াছে! অথচ এই ত্রুটিটুকু ত এ পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষু দুটিকে পীড়া দেয় নাই। সীমন্তের এই সিন্দূর শোভা ও সুগন্ধ পুষ্পে নিপুণহস্তে রচিত অনুপমমালা চিত্রময়ীকে যেন প্রাণময়ী করিয়া তুলিয়াছে! অপলক-নয়নে তিনি সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি নত করিতেই আলেখ্যখানির পদ-প্রান্তে শ্বেতপ্রস্তরের এক আধারের উপর নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলির নিদর্শনও পাওয়া গেল; বুঝিলেন, চিত্রেশ্বরী দেবীর উদ্দেশে অর্ঘ ও পুষ্পসম্ভার শ্রদ্ধা সহকারে অর্পিত হইয়াছে; পুত্রের পড়াশুনার তালিকায় সকাল-সন্ধ্যায় মাতৃপূজার নির্দ্দেশ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষুর উপর ভাস্বর হইয়া উঠিল।

অতঃপর ধীরে ধীরে তিনি শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। শয্যাটিও যে নির্দ্দিষ্ট স্থানটি হইতে সরিয়া গিয়া কক্ষের প্রান্তদেশে ঋজু ঋজু দুইটি বাতায়নের মধ্যস্থলে আশ্রয় লইয়াছে, কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন নিকটে গিয়া দেখিলেন, শুধু স্থান নয়, তাহাতে আরও অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শয্যার যে দুইটি

সংযুক্ত আধার স্থূল গদ্দি ও সুকোমল প্রচুর তোষকে আস্তৃত হইয়া কক্ষের শোভা ও চক্ষুর তৃপ্তি বাড়াইয়া তুলিত, তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি আধারে পরিণত হইয়াছে, এবং গদী, তোষক প্রভৃতি সুকোমল আস্তরণের স্থলে স্থূল ও কর্কশ সতরঞ্চি আধারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। মখমলের মত কোমল শুভ্র আচ্ছাদন-বস্ত্র অন্তর্হিত হইয়া তাহাদের স্থল অধিকার করিয়াছে এক একখানি মৃগচর্ম্ম। মধ্যে মাত্র একটি হাত ব্যবধানে এই ভাবে দুইটি শয্যা সন্ন্যস্ত। বিস্ময়-কৌতূহলে হরিনারায়ণ-বাবু পাশা-পাশি দুইটি শয্যাই হাত দিয়া টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোনও পার্থক্যই কোনটির মধ্যে নাই; উভয় শয্যাই সুকঠিন ও শুচিতার প্রতীক। আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ভেলভেটের আস্তরণ-মণ্ডিত পলঙ্কের উপাধানগুলির কোনও নিদর্শনই কোনও শয্যাতে নাই, শুধু প্রত্যেক শয্যার প্রান্তদেশে মাথা রাখিবার মোটা রকমের একটি করিয়া উপাধান রহিয়াছে, শয্যার ন্যায় সেগুলিও কঠিন এবং তাহাদের আস্তরণ ভেলভেটের নহে; হাতে কাটা মোটা খদ্দরের ও সেগুলি গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত; মৃগচর্ম্মের আস্তরণের উপর গেরুয়া উপাধানগুলির সংস্থানে শয্যার সৌন্দর্য্য যে আরও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

আরও কিছুক্ষণ এই অপূর্ব্ব শয্যা দুইটির সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া হরিনারায়ণবাবু মনে মনে কি ভাবিলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে পুনরায় স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর আলেখ্যখানির সান্নিধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন—বৌমা!

আহ্বানধ্বনির অব্যবহিত পরেই বধূর সহজ কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল—ডাকছেন আমাকে, বাবা?

শ্বশুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারের দিকেই পড়িয়াছিল; দেখিলেন, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াই সপ্রতিভভাবে বধূ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মুখে তাহার বিরাগ, বিক্ষোভ, অভিমান অথবা সংশয়ের কোন চিহ্নই নাই।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দীর্ঘসময় ধরিয়া যাহার সহিত তাঁহার বিষম বাদানুবাদ চলিয়াছিল, নিজে আঘাত পাইলেও, ক্ষমতার উৎকর্ষে তিনি যাহাকে কঠোরভাবে কথার আঘাত দিতে কৃপণতা করেন নাই এবং কথার শেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহাকে উপেক্ষা করিয়াই তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত মেয়েটি এমন সহজ ভঙ্গিতে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসু দুইটি চক্ষু তুলিয়া দাঁড়াইল, যেন কোনও অপ্রিয় ঘটনাই ইতঃপূর্ব্বে ঘটে নাই, আহ্বান পাইয়া আজ এই মাত্রই যেন সে ব্যগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে।

মনের বিস্ময় মুখে প্রকাশ হইতে না দিয়াই বেশ গম্ভীরভাবে কর্ত্তা কহিলেন—ও-ঘরে তোমার দলিল-দস্তাবেজ সমস্তই দেখে এলুম, বৌমা।

বধূ পলকের জন্য শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করিল, কোনও উত্তর দিল না।

আড়-নয়নে বধূর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্বশুর কথার সুর একটু বক্র করিয়াই কহিলেন—কিন্তু এ-ঘরের কায়দাকানুন হঠাৎ এ ভাবে পাল্টানো হ'ল কেন, তা ত বুঝলুম না!

বধূ এবার চক্ষু তুলিয়া পুনরায় নিজের কণ্ঠকে শক্ত করিয়া আস্তে আস্তে উত্তর দিল—পাল্টাবার যে প্রয়োজন হয়েছিল, বাবা।

প্রয়োজন হয়েছিল। তার মানে?

মানে কি সত্যিই বুঝতে পারেন নি বাবা—ও-ঘরের দলীল-দস্তাবেজ সব দেখেও?

বধূর স্পষ্ট কথায় শ্বশুরের মুখখানি সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন হইয়া উঠিল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বধূর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে তিনি কহিলেন—এতক্ষণে তোমার মনের আসল উদ্দেশ্যটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, বৌমা।

জিজ্ঞাসুনয়নে বধূ শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল। শ্বশুর কহিলেন—

বিয়ের রাতে তোমার বাবাকে আভাসে জানিয়েছিলুম, আমাদের কুলপ্রথা—গাঙ্গুলী-বাড়ীতে মেয়ে বধূ হয়ে প্রবেশ করলে, সম্বৎসরের মধ্যে ফেরবার উপায় থাকে না। তোমার বাবা এ নিয়ম পাল্টাবার জন্য আপত্তি জানাতে, অনুরোধ করতে ত্রুটি করেন নি, কিন্তু আমার কথা নড়ে নি। এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার সেই কথাটা রদ করবার জন্যই তুমি এখানে বেপরোয়া হয়ে এই সব কাণ্ড বাধিয়েছ!

বধূর মুখে অতক্ষণে হাসির একটু ঝিলিক দেখা গেল, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল—এতে আমার লাভ কিছু খতিয়ে পেয়েছেন, বাবা?

অসহিষ্ণুভাবেই শ্বশুর উত্তর দিলেন—লাভ তোমার বাপের বাড়ী ফিরে যাওয়া! তারা তোমাকে দেখেই যেই অবাক্ হয়ে তাকাবে, তুমিও তেমনি দম্ভ ক'রে শুনিয়ে দেবে—এমন কাণ্ড সেখানে আরম্ভ ক'রে দিলুম যে, বুড়ো মুখের কথা পাল্টাতে পথ পেলে না।

কিন্তু বৃথা বড়াই ত আমি কোনও দিন করি নি, বাবা। আর আমি ও জিনিসটা ভালোও বাসি না; আপনি তা হ'লে আমার সম্বন্ধে ভুল বুঝেছেন।

ভুল বুঝিছি! সত্যি বলছ তুমি, বৌমা?

আমি যদি বলি, আপনার ঐ কথাটাই আমার পক্ষে ঠিক 'শাপে বর' হয়ে গিয়েছে, তা হ'লে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

মুখের কথার সুরটুকু পুনরায় নরম করিয়া শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন—কি রকম?

বধূর মুখে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া গেল, নিজের কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সুস্পষ্টস্বরে সে কহিল—বাসরে আপনার ছেলের পরিচয় পেয়েই আমি স্থির ক'রে নিয়েছিলুম, তাঁর মুক্তির জন্য সম্বৎসর ধ'রে এই তপস্যাই আমি এখানে করব।

সংশয়ের সুরে শ্বশুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—সম্বৎসর তোমার বাপের বাড়ীর পথ বন্ধ জেনেও ?

গাঢ়স্বরে বধূ উত্তর দিল—আমি ইচ্ছা ক'রে নিজেই সে পথ যে বন্ধ ক'রে এসেছি, বাবা !

তুমি বন্ধ ক'রে এসেছ, ইচ্ছা ক'রে ?

অশ্রুরুদ্ধ দুইটি স্ফীত চক্ষু শ্বশুরের মুখের উপর তুলিয়া বধূ কহিল—সেই জন্যই তখন কনকাঞ্জলির বায়না তুলতে হয়েছিল—আপনার দেওয়া মোহরের থালা মার আঁচলে ঢেলে দিয়ে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে শুধু একটি উদ্দেশ্যেই সমস্ত মন—সমস্ত লক্ষ্য আমার—

অন্তরের দুর্ব্বার উচ্ছ্বাসে বধূর কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হইল, পরের কথা কয়টি আর নির্গত হইল না।

শ্বশুর সহসা চমকিত হইয়া বিস্ময়ের সুরে কহিয়া উঠিলেন—ও, বটে ! মনে পড়েছে ! পরক্ষণে মুখের ভাব ও কথার সুর পাল্টাইয়া কহিলেন —হ্যাঁ, তোমার লক্ষ্যটুকুও এবার ধরা প'ড়ে গিয়েছে ! ধ'রে নিলুম না হয় তোমার কথাতেই বাপের বাড়ীর পথ বন্ধ হয়েছে ; কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতেও ত ক্রমশঃই আগড় বাঁধতে আরম্ভ করেছ ! কারুর তোয়াক্কা রাখতে চাও না, বাড়ীর বউ তুমি, অথচ কারুর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ নেই, ভালমন্দ কোনও দিকেই দৃষ্টি নেই, সমস্ত কর্ত্তব্য ছেঁটে ফেলে শুধু নিজের একটি লক্ষ্য বস্তু নিয়েই প'ড়ে আছ ! এ চমৎকার !

মুহূর্ত্তে বধূর মুখখানির উপর কে যেন কাঠিন্যের আবরণ পরাইয়া দিল, কণ্ঠ ও চক্ষুর দুর্ব্বলতা কোথায় পলকে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া তেজোদৃপ্ত স্বরে বধূ কহিল—এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন বাবা, এর আলোচনা অপ্রিয় হবে।

বধূর কথায় শ্বশুরের আপাদমস্তক ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, বধূ অ.স্ব অসীম স্পর্দ্ধায় আলোচনার ধারারও নির্দ্দেশ দিতে চায় ! বুঝিলেন,

এই প্রসঙ্গটিই বধূর পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং ইহাকেই অবলম্বন করিয়া তিনি বধূকে রীতিমত আঘাত দিতে উদ্যত হইলেন।

মুখের কথায় মনের ক্রোধটুকু ব্যক্ত করিয়া বিরক্তির সুরে তিনি কহিলেন—অন্যায়ের আলোচনা বরাবর অপ্রিয়ই হয়ে থাকে, বৌমা। এটা ঢাকবার চেষ্টা করাই মস্ত অন্যায়। আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর তোমাকে দিতেই হবে। তখনও তুমি জোর ক'রে বলেছ, তুমি কোন অন্যায় এ পর্য্যন্ত কর নি, একটি মিথ্যা কথাও কখনও বল নি।

বধূ মুখ হেঁট করিয়া নিরুত্তর রহিল, কিছুই বলিল না। কিন্তু তাহার এই নীরবতাই যেন প্রকাশ করিতেছিল—এখনও সে উহাতে সায় দিতেছে।

কর্ত্তা এবার স্বরের উপর বিশেষ জোর দিয়াই কহিলেন—আমি বলছি বৌমা, নববধূর কোনও কর্ত্তব্যই তুমি এ পর্য্যন্ত কর নি—বধূদের যেগুলো অবশ্য কর্ত্তব্য!

বধূ সেইভাবেই মুখখানি হেঁট করিয়া রহিল; শ্বশুরের কথায় কোনও প্রতিবাদ তুলিতে বা এ অভিযোগ অস্বীকার করিতে তাহাকে একটি কথাও বলিতে শুনা গেল না।

শ্বশুর এবার উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—বুঝিছি, তুমি 'না' বলতে পার না; তিনটে মাস পূরো হ'তে চললো, তুমি এ বাড়ীতে এসেছ, কিন্তু ব্যবহারে বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই জানিয়েছ, তুমি তাদের কাউকে চাও না, আর কারুর দিকে তোমার লক্ষ্যও নেই। অস্বীকার করবে তুমি এ কথা?

বধূ তথাপি নীরব, প্রস্তর-প্রতিমার মত একই ভাবে অপলক-নয়নে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্বশুর দৃঢ়স্বরে কহিলেন—এ কথাও তুমি মেনে নিচ্ছ তা হ'লে!

আমাকে আরও কঠিন হয়ে বলতে হচ্ছে বৌমা, কথাটা খুবই অপ্রিয়, কিন্তু সত্য—তোমার শাশুড়ী, দেবর, ননদ—এদের কারুর কোনও খবরই তুমি রাখ না, রাখা আবশ্যক মনে কর না, আর, আর, এ কথাও সত্য যে, আমার দিকে তোমার লক্ষ্য নেই!

বধূর মুখে কোনও পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না, এমন কি, পর পর এরূপ অভিযোগেও তাহার মুখে চিন্তা বা আশঙ্কার কোন ছায়াও পড়িল না।

শ্বশুর মুখের স্বর এবার কিঞ্চিৎ নরম ও বিকৃত করিয়া কহিলেন—এখন দুনিয়ার ভেতর তোমার শুধু একটি লক্ষ্য—স্বামী!

প্রস্তর-প্রতিমার এতক্ষণে যেন প্রাণের স্পন্দন আসিল; শাড়ীর অঞ্চলটি গলায় ঘুরাইয়া শ্বশুরের পদতলে হেঁট হইয়া গড় করিয়া ভাবগদগদ-স্বরে বধূ কহিল—আপনার এই অনুমানই আজ আমার পক্ষে পরম আশীর্ব্বাদ, বাবা!

একদৃষ্টে ক্ষণকাল বধূর দিকে তাকাইয়া শ্বশুর রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন—কিন্তু এইটিই নববধূর পক্ষে একমাত্র গৌরবের কথা নয়, বৌমা! সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী এঁরাও বধূ ছিলেন, এঁদেরও স্বামী ছিল, শ্বশুর ছিল, সংসার ছিল—

বধূ বিনয়নম্রস্বরে কহিল—কিন্তু কর্ত্তব্যের সমস্যা যখন এঁদের জীবনে ঝড় তুলেছিল, তখন স্বামীই যে শুধু এঁদেরও লক্ষ্য হয়েছিল, পুরাণেই ত সে পরিচয় পাওয়া যায়, বাবা!

বধূর এই প্রতিবাদে বিরক্ত হইয়া শ্বশুর কহিলেন—পুরাণের কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবার আমার ইচ্ছা নেই, অবসরও নেই; আর তোমার এ কথার সমর্থন এ যুগে কেউ করবে না। তোমার দপ্তরখানায় ত দেখে এলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত রয়েছে; ও বই পড়েছ নিশ্চয়; তিনিই ত বলেছেন গো—যে মেয়ে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না!

স্বামি-ভক্তি যেমন উচিত, লক্ষ্যও তেমনই সংসারের সব দিকে রাখা উচিত। যেমন মাছ ধরতে ব'সে ছিপের ফাতনার দিকে লক্ষ্য থাকলেও, আর সব দিকেও তার নজর থাকে।

শ্বশুরের কথাগুলি নিবিষ্ট-মনে শুনিয়া বধূ মুখখানি তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও কথা সংসারীদের সম্বন্ধে বলেছেন বাবা, সংসারের নানা কাজে লিপ্ত থেকেও তাঁরা যাতে ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন; কিন্তু ধ্রুব, প্রহ্লাদ বা শুকদেবের সম্বন্ধে এ কথা ত বলা চলে না?

শ্লেষের সুরে শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন—তবে কি ওদের পথেই বেরিয়ে পড়া তোমারও বাসনা, মা! সেই জন্যই কি সকলকে অবহেলা ক'রে একমুখী রুদ্রাক্ষ হয়ে উঠেছ?

বধূ এবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া কহিল—একমুখী না হ'লে কোনও উচ্চ সাধনাই যে সিদ্ধ হয় না, বাবা!

শ্বশুরের মুখে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন হইল—সাধনা?

বধূ দৃপ্তস্বরে উত্তর দিল—হাঁ বাবা, সাধনা; কিন্তু বাঙ্গালাদেশে আর কোনও বধূকে আমার মত এমন কঠিন সাধনা আরম্ভ করতে হয় নি! এমন কঠোর পরীক্ষাও আর কোনও দিন কোনও মেয়ের সামনে এসে বাধা তোলে নি; তাই বলি, বিয়ের রাতে যে বস্তু আমি পেয়েছি, তাঁকেই পরম বস্তু ক'রে তুলতে শুধু তাঁরই দিকে লক্ষ্য আমাকে রাখতে হয়েছে। মহাভারতে পড়েছি, অস্ত্র-সাধনায় অর্জ্জুন চরম পরীক্ষা দেবার দিনটিতে শুধু ভাসপাখীর মাথাটীর উপর লক্ষ্য রেখেছিলেন বলেই গুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁকেই তীর ছোঁড়বার অধিকার দেন, অর্জ্জুনও সিদ্ধিলাভ করেন। যাঁকে নিয়ে আমার সাধনা, লক্ষ্য যে শুধু তাঁরই দিকে; তাঁকে সিদ্ধ ক'রে না তোলা পর্য্যন্ত এ লক্ষ্য যে ফেরাতে পারব, সে ভরসা কিছুতেই যে করতে পারি না, বাবা!

মুখখানি গম্ভীর করিয়া কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের এই সাধনা কত কাল চলবে?

বধূ কহিল—আগেই ত বলেছি বাবা, সম্বৎসরের ব্রত নিয়েছি।

শ্বশুর কহিলেন—বুঝেছি, কিন্তু সময়টা যে আপাততঃ সংক্ষেপ করবার প্রয়োজন হয়েছে।

বধূ দুই চক্ষুর উপর প্রশ্ন তুলিয়া নীরবে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল।

শ্বশুর কহিলেন—তোমার বিরুদ্ধে যখন নালিশ উঠেছে, সেটা ত অত দিন ফেলে রাখতে পারি না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া বধূ কহিল—ঐ দিনগুলোর সঙ্গে আমার মামলার কি সম্বন্ধ, তা ত বুঝতে পারলুম না, বাবা! তবে কি বিচারের আগেই শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে?

ঠিক তাই নয়, বরং তোমাকে বাঁচাবারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখন মামলা উঠলে, যে ব্রত তোমরা আরম্ভ করেছ, তার ক্ষতি হ'তে পারে, লক্ষ্য অন্যদিকে পড়বারই সম্ভাবনা তাতে বেশী, সেই জন্যই তোমাকে ঐ কথাটা বলা হয়েছে। এখন আমার এই ইচ্ছা যে, আজ থেকে চারটি মাসের মধ্যেই যেন তোমার ব্রতটার উদ্‌যাপন হয়ে যায়।

বধূর মুখের স্বর অর্দ্ধস্ফুট হইয়া বাহির হইল—চারটি মাসের মধ্যে!

উৎসাহের সহিত কর্ত্তা মুখের কথার উপর জোর দিয়া কহিলেন—হাঁ, চারটি মাস মাত্র সময় দেওয়া যাচ্ছে; আসছে আশ্বিনের দেবীপক্ষের প্রথম দিনটিতেই ব্রত তোমাকে উদ্‌যাপন ক'রে নিতে হবে। তারপরে বিচার তোমার আরম্ভ হবে। এখন শুধু তদন্তই চলবে দু'পক্ষের নালিশের।

বধূ সংযতস্বরে কহিল—বিচারের জন্য আমার ভাবনা নয় বাবা, ভাবছি শুধু ব্রতপূর্ণ করবার দিন এত সংক্ষেপ হচ্ছে ব'লে।

শ্বশুর দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—তিনটে মাস ত ব্রতের কাজেই কাটিয়েছ

বৌমা, এখনও বাকি রইল চারটে মাস ; এই কি কম? মাত্র ক'টা দিনের মধ্যেই যদি একটা ইমারত তৈরী ক'রে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হ'তে পারে, এতগুলো মাস এখনও প'ড়ে রয়েছে, এর মধ্যে একটা মানুষ গ'ড়ে তোলা কেনই বা অসম্ভব হবে ?

শ্বশুরের কথার সঙ্গে সঙ্গেই বধূর মুখখানি এক অপরিসীম উৎসাহের আভায় যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দুই চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া বধূ শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—আপনার যদি আশীর্ব্বাদ থাকে, এই অসম্ভব তা হ'লে সম্ভব হবে, বাবা !

বধূর কথায় এবার শ্বশুরের মুখে হাসি দেখা দিল, তার মধ্যেই একটু গর্ব্বের সুরে তিনি কহিলেন—এখন তবে বলি, ভবিষ্যৎ ভেবেই তখন সোণার চাবুকটি তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলুম মা, সেইটির জোরেই এই অসম্ভবকে একদিন তুমি সম্ভব ক'রে তুলতে পারবে জেনেই !

বধূর মনে হইল, শ্বশুরের কথার সহিত তাঁহার দেওয়া সেই সোণার চাবুকটির একটি আঘাত সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। সর্ব্বাঙ্গে একটা অসহ্য জ্বালার অনুভূতি সে প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া, মুখের উপর ক্লেশের যে ভাবটুকু ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা সবলে গোপন করিয়া, মিনতির সুরেই কহিল—একটু অপেক্ষা করুন বাবা, আমি এখনি আসছি।

শ্বশুর তাঁহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলেন, বধূ ক্ষিপ্রপদে অপর পার্শ্বের সুসজ্জিত কক্ষটির ভিতর প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে সামান্য যে শব্দ পাওয়া গেল, তাহাতে তিনি অনুমান করিলেন, বধূ তাহার তোরঙ্গ খুলিয়া কোনও কিছু বাহির করিতেছে। তাঁহার যুগল ভ্রূ সহসা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বধূকে ফিরিতে দেখা গেল ; কিন্তু বধূর হাতের

বস্তুটির উপর শ্বশুরের উৎসুক চক্ষু পড়িতেই তিনি অস্বাভাবিক স্বরে কহিয়া উঠিলেন—আবার সেই সোণার চাবুক ?

বধূ অতিশয় সহজ সুরেই উত্তর দিল—হাঁ বাবা, যেমন আপনি দিয়েছিলেন, বাক্সেই তুলে রেখেছিলুম ; ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি এ পর্য্যন্ত, তাই আপনার জিনিস আপনাকে ফেরত দিচ্ছি।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বধূর দিকে চাহিয়া শ্বশুর সবিস্ময়ে কহিলেন—ফেরত দিচ্ছ ?

বধূর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটি ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল—দেওয়াকে যদি একান্তই সার্থক ক'রে তুলতে না পারা যায়, রেখে ত কোনও লাভ নেই, বাবা ! সেটা তখন বোঝা হয়েই দাঁড়ায়।

ম্লান দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া ভগ্নস্বরে শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন—তা হ'লে কি আমিই ভুল বুঝেছিলুম ?

বধূ সুসংযত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—আপনি যে এটি দেবার সময় ভাবতে পারেন নি বাবা, আসল যে বস্তুটি আমার জন্য তুলে রেখেছেন—সেটি মরচে পড়া লোহার, সোণার চাবুক দিয়ে ঘসে মেজে পিটে কস্মিন-কালেও তাকে সোণা ক'রে তোলা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন—স্পর্শ-মণির। সেইটি পাবার জন্যই যে একমুখী রুদ্রাক্ষ হয়ে এই সাধনা, বাবা !

নিষ্পলকনয়নে শ্বশুর বধূর দৃপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বধূ সেই অবসরে সোণার চাবুকটি শ্বশুরের পদতলে রাখিয়া কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া কহিল—আমি এর মান রাখতে পারি নি বাবা, সেজন্য মাপ চাইছি।

হেঁট হইয়া সেই স্বর্ণময় প্রহরণটি তুলিয়া বিবর্ণমুখে শ্বশুর বধূর দিকে চাহিয়া কহিলেন—সত্যই তুমি এর ভার বহন করতে অস্বীকার করছ, বৌমা ?

বধূ স্বচ্ছন্দে কহিল—হাঁ বাবা, এ জিনিসটি সত্যই আমার পক্ষে

দুর্ব্বহ। পরক্ষণেই বধূ কণ্ঠস্বর সহসা অস্বাভাবিকরূপে গাঢ় করিয়া কহিল—আর এটি দেখলেই আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরে।

নীরস স্বরে শ্বশুর কহিলেন—বটে! ভাল, তা হলে এটার ভার না হয় নিবারণের হাতেই দেব।

বধূর মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া এক নিশ্বাসে সে কহিয়া উঠিল—তাই দেবেন; কিন্তু আমাদের মায়ের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, কোথায় ওটার স্থান, নিজের মনেই হয় ত তার অনুভূতি পেতেন, বাবা!

কথার সঙ্গে সঙ্গে বধূ যেন জোর করিয়াই দেহটাকে টানিয়া লইয়া পার্শ্বের ঘরখানির ভিতরে সবেগে প্রবেশ করিল।

শেষের কথাটায় যে খোঁচা ছিল, শ্বশুরের বুকে তাহা রীতিমত আঘাত দিল; সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুর আর্ত্ত দৃষ্টি সহধর্ম্মিণীর আলেখ্যখানির উপর স্থাপন করিয়া উচ্ছ্বাসের স্বরে তিনি কহিলেন—যেখানে তুমি থাক না কেন, সবই ত জানছ, যে অবিচার করেছি তোমার উপরে, তারই প্রতিক্রিয়া এতদিনে সম্ভব হয়েছে; এখন তুমি যদি একটিবার নেমে এসে এই সোণার চাবুক নিজের হাতে নিয়ে—গাঙ্গুলি-বংশের এই অযোগ্য স্বর্ণগর্দ্দভকে শাস্তি দিতে পার, তবেই হয় তার সত্যকার প্রায়শ্চিত্ত!

তৃতীয় পর্ব্ব

বিস্তার

এক

বহির্ব্বাটীতে কর্ত্তার বিশাল খাস-কামরা যেমন সেরেস্তার সম্ভ্রম রক্ষা করিত, অন্তঃপুরে রাণীর মহলেও তাঁহার নিজস্ব কক্ষটি অন্তঃপুরিকাদের অহেতুক উল্লাস ও অনর্থক উচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া রাখিত।

প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা একটি সুদীর্ঘ কক্ষ; তাহার এক ধারে পাশাপাশি অনেকগুলি সোফা, আরাম-কেদারা; তাহার পরেই একখানি কারু-কার্য্যখচিত প্রকাণ্ড পালঙ্ক, তাহার উপর পালঙ্কের উপযুক্ত উচ্চাঙ্গের শয্যা আস্তৃত। অন্যদিকটি একেবারে শূন্য, শুধু কক্ষতলটি আগাগোড়া কার্পেট-মণ্ডিত; স্থানটি এই ভাবে খালি রাখিবার কারণ কর্ত্তা এখানে প্রায়ই অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে পদচারণা করিয়া থাকেন। কোনও কঠিন বিষয়ের মীমাংসা যখন তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করে, তখনই কর্ত্তাকে—সুদীর্ঘ হাত দুইখানি পীঠের দিকে আবদ্ধ করিয়া কক্ষের এই অংশটির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগতই পরিক্রমণ করিতে দেখা যায় এবং এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়, ইহাই তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস।

কিন্তু এ দিন যেন একান্ত অসহিষ্ণুভাবেই তিনি কক্ষের এই নির্দ্দিষ্ট অংশটির উপর পদচারণা করিতেছিলেন। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই ললাট তাঁহার কুঞ্চিত হইতেছিল, প্রশান্ত মুখখানির সর্ব্বত্রই চিন্তার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; এই কক্ষে এই ভাবে অবিরাম পরিক্রমণ তাঁহার

নূতন নয়, কিন্তু চক্ষু ও মুখের ভঙ্গি অন্তর্নিহিত ভাবের যে আভাস দিতেছিল, তাহা সত্যই অভিনব।

অলিন্দের দিকের দরজার পর্দা ঠেলিয়া মাধুরী দেবী বেশ গম্ভীরভাবেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তাও ঠিক এই সময় দ্বারের দিকেই মুখ ফিরাইয়াছিলেন ; সহসা চোখোচোখি হইতেই উভয়ের ভাবান্তর উভয়ের চোখেই ধরা পড়িয়া গেল।

কর্ত্তা আত্মসংবরণের উদ্দেশ্যে প্রথমেই তৎপর হইয়া কহিলেন—এত দেরী যে ? এক ঘণ্টার উপর হবে আমি তোমাকে ডেকেছি।

সহজকণ্ঠে রাণী কহিলেন—খবর আমি ঠিক সময়েই পেয়েছি, তবে দেরী ক'রে আসাটা আমার ইচ্ছাকৃতই।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কর্ত্তা রাণীর মুখের দিকে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অজ্ঞাতেই যেন কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হইয়া বাহির হইল—বটে !

রাণী সুস্পষ্ট স্বরে বিলম্ব করিবার কারণটুকু নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন—বউমার মহলে তিন ঘণ্টার উপর তক্‌রার চলবার পর ঘণ্টাখানেক নিরালায় বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল।

কথাটা কর্ত্তার কানে রসের আভাস না দিয়া বিরক্তির আঘাত দিল ; রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন—কি ক'রে এ খবর এরই মধ্যে তোমার কানে এসে পৌঁছাল ?

রাণী কহিলেন—তুমি যা মনে ক'রে এ কথা জিজ্ঞাসা করছ, তা ভুল ; তুমি নিজেই জানো, দরজায় পাহারা বসিয়ে গিয়েছিলে ; আর, এ বাড়ীর দাসী-বাঁদীদের কারুর ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে, তোমার হুকুমের এতটুকু নড়চড় করতে পারে।

দৃঢ়স্বরে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে তুমি ওকথা বললে কি সূত্রে শুনি।

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে রাণী উত্তর দিলেন—আমি যে এ বাড়ীর রাণী,

সমস্তই আমাকে জানতে হয়; মানুষ না বললেও, বাতাস আমার কানে কানে সব শুনিয়ে দিয়ে যায়।

দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্তা রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—ভালো ভালো, কথাটা যেন ভুলে যেয়ো না—এখনি যা বললে। এর পীঠে অনেক কথাই আমাকে তুলতে হবে, এখানেও ক'ঘণ্টা সময় কাটবে তা কে জানে!

কথার সঙ্গে সঙ্গে একখানা সোফার দিকে অগ্রসর হইয়া কর্তা কহিলেন—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি, ব'স।

রাণী কহিলেন—আমার বসবার দরকার হবে না, বসেই ছিলুম, তোমার বসাটাই প্রয়োজন হয়েছে, এক ঘণ্টা ধরেই দৌড়াদৌড়ি ক'রে যে কাহিল হয়ে পড়েছ, তা বুঝতে পারছি।

সোফার কোমল অঙ্কে দেহভার ন্যস্ত করিয়া কর্তা কহিলেন—এই একটি ঘণ্টা যে এখানে বিশ্রাম করি নি, এ কথা তা হ'লে স্বীকার করছ বল?

রাণী গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন—চাবুকের ঘা পিঠে পড়লে স্থির হয়ে কেউ যে বিশ্রাম করতে পারে না, গায়ের জ্বালায় ছুটোছুটি করে, এ কথা এখন স্বীকার না ক'রে পাচ্ছি না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কর্তা প্রশ্ন করিলেন—ও ভাবে এ কথা বলবার মানে?

রাণী মুখের কথায় একটু জোর দিয়াই কহিলেন—যে ভাবে নিশ্বাস ফেলে কথাটা তুমি বললে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, মানে তুমি বুঝতে পেরেচ। বেশী ক'রে বোঝাতে গেলেই গায়ের জ্বালাটুকু বাড়াবে বই ত নয়!

সন্দিগ্ধভাবে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কর্তা করিলেন—বউমার মহলে আমি গিয়েছিলুম জানা কথা, অনেকক্ষণ সেখানে থাকতে হয়েছিল

আমাকে সবাই জানে ; কিন্তু কি কথাবার্ত্তা আমাদের মধ্যে হয়েছে, ঘুণাক্ষরে কেউ তার একটি বর্ণও শুনেছে, আমার ত মনে হয় না ; তবে কি সূত্রে তুমি আমাকে খোঁটা দিলে যে—বউমার কথার ঘা বরদাস্ত করতে না পেরেই গায়ের জ্বালায় আমাকে অনেক ছুটোছুটি করতে হয়েছে ?

স্বামীর কথার শেষ দিকে তীব্রতার আভাস পাইয়া রাণী ক্ষণকাল তাঁহার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা কহিলেন—বউমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আট-ঘাঁট বেঁধেই গিয়েছিলে, কিন্তু ফেরবার সময় মুখ, চোখ, গলার স্বর এগুলোকে ত বাঁধতে পার নি, ওরাই যে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে, ঘা খেয়েই ফিরে এসেছ তুমি, গায়ে জ্বালা ধরেছে।

কথাটা কর্ত্তাকে রীতিমত আঘাত দিল, তিনিও প্রতি-আঘাত দিতে অবহেলা করিলেন না ; তীক্ষ্ন বিদ্রূপের সুরে কহিলেন—যার পাণ্ডু রোগ হয়, দুনিয়াশুদ্ধ সে পাণ্ডুবর্ণ দেখে ! কে জ্বল্‌ছে তা জানতে আমার বাকি নেই ; কিন্তু এটা হচ্ছে সমুদ্দুর, কিছুতেই তাতে না।

ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে একটু তীক্ষ্ন হাসির ঝিলিক তুলিয়া রাণী কহিলেন—কিন্তু নিষ্ফল গর্জ্জন করতেও ছাড়ে না।

কর্ত্তার মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল ; মনে মনে বুঝিলেন, এখানে প্রতিপক্ষ সমকক্ষের দাবী লইয়া প্রতি-উত্তর দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না ; সুতরাং সন্ধির প্রত্যাশায় তিনি নিজের কথার সুর নরম করিয়া কহিলেন—অনুমানের উপর জোর করে কিছু সাব্যস্ত করা ঠিক নয়, তাতে ঠকতে হয়।

রাণী এ কথায় সায় না দিয়া প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিলেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত যা কিছু সাব্যস্ত করা হয়েছে, সবই ত অনুমানের উপর নির্ভর করেই !

বিস্ময়ের সুরে কর্ত্তা কহিলেন, তাই কি ? এর নজীরও তা হ'লে নিশ্চয়ই আছে ?

রাণী কহিলেন—অনেক। প্রথম নজীরই ত আমি।

তুমি!

হাঁ; শুধু বংশরক্ষার অভিপ্রায়েই যে রাজকন্যাকে ধরে আনা হয় নি, সে তুমিও জান, আমিও জানি; এর পেছনে ছিল একটা উঁচুদরের অনুমান।

বটে!

এক ঢিলে দুটো পাখী শিকার করবার অনুমান করেই তুমি নেচে উঠেছিলে।

বল কি!

আরও স্পষ্ট করেই বলছি; তোমার অনুমান ছিল, মেবারের রাণা রাজসিংহের মত একটা কীর্ত্তি অর্জ্জন করা, আর আমার বাবা সরকার-ঘেঁসা ব'লে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া—ওর কোনও দাম নেই।

কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কর্ত্তা রাণীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া কহিলেন—এত কাল পরে এত বড় একটা তত্ত্ব তুমি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ! কিন্তু এর আগে ত কোন দিন এ সম্বন্ধে কোন কথাই আমাকে বল নি।

রাণী গাঢ়স্বরে কহিলেন—বলবার ত প্রয়োজন এ পর্য্যন্ত হয় নি। কথার পিঠে কথা উঠতেই আমাকে বলতে হ'ল যে, অনুমানের উপর নির্ভর করেই যত কিছু গুরুতর ব্যাপারেই তুমি মাথা দিয়েছ। একটা নজীর ত দেখালুম, আরও অনেক আছে।

কর্ত্তা কহিলেন—থাক, আর শুনিয়ে কাজ নেই। বাজে কথায় আমরা কাজের কথা থেকে তফাতে এসে পড়েছি। যে জন্য তোমাকে ডেকেছি, সে সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও হয় নি। কিন্তু তুমি বসবে না?

রাণী কহিলেন—না, বসলে তামার সঙ্গে কথায় আমি পেরে উঠব

না ; আমি বেশ বুঝতে পারছি, ও মহলে ঘা খেয়ে আমার উপরে তার শোধটা তুলবে বলেই তুমি তৈরী হয়ে এসেছ।

আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ কথাই তুমি টেনে আনছ!

ঐ কথা ছাড়া নতুন কোন কথা সত্যই কি তোমার বলবার আছে? আমার ত মনে হয় না।

তোমার মনের কি ধারণা, তাই শুনি!

এ বাড়ীতে এসে অবধি কাজের কোন কৈফিয়ৎই আমাকে দিতে হয় নি, তার তলবও আসে নি, প্রয়োজনও দেখা দেয় নি। সেই কৈফিয়ৎ আজ আমাকে দিতে হবে। আমার এই ধারণা কি অমূলক?

উচ্ছ্বাসের সুরে কর্তা কহিলেন—চমৎকার! কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, তারিফ করব কার? বৌমাও অসময়ে তাঁর মহল্লায় আমাকে দেখেই বলেছিলেন, আমি তাঁর বিচার করতে এসেছি। তুমিও আমার তলব পেয়েই সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছ—তোমার কাজের কৈফিয়ৎ নিতেই ডেকেছি।

স্বামীর এই উচ্ছ্বাসে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই সহজকণ্ঠে রাণী কহিলেন—আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। তোমার যা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে, তার কাজ আরম্ভ করতে পার, আমার পক্ষ থেকে কিছুমাত্র অবহেলা হবে না।

কর্তা কণ্ঠের স্বরটুকু কৃত্রিম সহানুভূতিতে গাঢ় করিয়া কহিলেন—তোমার যখন এত জেদ, তখন তোমার মুখ-রক্ষায় আমার পক্ষ থেকেও অবহেলা করা কিছুমাত্র উচিত নয়। হাঁ, ভাল কথা, গোড়াতেই যে কথাটা তুমি জোর ক'রে বলেছিলে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল—এ বাড়ীর তুমি রাণী, সবই তোমাকে জানতে হয়, বাতাস তোমার কানে কানে সব কথাই শুনিয়ে দিয়ে যায়;—এই কথাগুলিই ঠিক বলেছিলে না?

রাণী দুই চক্ষু মেলিয়া মুহূর্তের জন্য স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন,

পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন—এ সব কথা তোলবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না, মুখের কথা অস্বীকার করবার শিক্ষা কখনও পাই নি।

কর্ত্তা কহিলেন—তা আমি জানি, আর এ জন্য কতবার প্রশংসা করেছি, তুমিও তা জান। তবে ঐ কথাটা এক্ষেত্রে তোলা কতকটা সংস্কারের মতই; আদালতে হাকিমের সামনে অতি বড় সত্যবাদীকেও যেমন হলপ করতে হয়! হাঁ, এবার কাজের কথাই হোক। সত্যিই, চারদিকের অবস্থা এমনই তালগোল পাকিয়ে উঠেছে যে, কতকগুলো খবর না নিয়ে আমার আর নিষ্কৃতি নেই।

কথাগুলি শেষ করিয়াই কর্ত্তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু রাণীর নিকট হইতে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

কর্ত্তা পুনরায় কহিলেন—একটু আগেই তুমি আমার সম্বন্ধে বলেছ, রাজস্থানের রাজসিংহের মত বাহবা নেবার জন্যই আমি তোমাকে বিবাহ করেছি, আরও একটা অপবাদ চাপিয়েছ, সে কথা এখন থাক, প্রথমটার কথা তুলেই বলছি, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সবাই এ কথা বলবে যে, কাজটা ঠিক অন্যায় করি নি, আর ঐ কাজটুকু শেষ করতে ত্যাগ-স্বীকারও বড় অল্প করতে হয় নি। এখন এ সম্বন্ধে এইমাত্র বিচার্য্য যে, আমি তোমাকে অবহেলা করেছি কি না!

রাণী মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহিলেন—এ অভিযোগ ত আমি কোনও দিন করি নি, বরং আমি মুক্তকণ্ঠেই বলব, বিবাহের পর তুমি আমাকে যে মর্য্যাদা দিয়েছ, তা সামান্য নয়; তোমার সংসারে আমাকে সর্ব্বময়ী করেছ তুমি। যে অধিকার আমি পেয়েছি, আর সেই সূত্রে সংসারের সকলের ওপর এ পর্য্যন্ত যে ক্ষমতা চালিয়ে এসেছি, একটি দিনের জন্যও তুমি তাতে প্রতিবাদ তোল নি, কোন বাধাই দাও নি।

রাণীর কথাতেই নিজের বক্তব্য বিষয়ের সূত্রটুকু পাইয়াই কর্ত্তার মুখখানি

মুহূর্ত্তের জন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, উৎসাহের সুরে তৎক্ষণাৎ কহিলেন— বেশ! খুসী মনেই যে ভাবে তুমি ক্ষমতা পাওয়াটার কথা বললে, সে পাওয়া ক্ষমতাটুকুও তুমি ওজন ক'রে সবার ওপর চালিয়ে এসেছ—এ কথা জোর ক'রে বলতে পারবে?

স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত কঠোর প্রশ্নটি মুহূর্ত্তের জন্য যেন রাণীকে স্তব্ধ করিয়া দিল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি এই আঘাতটি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াই দৃপ্তকণ্ঠে কহিলেন—এ কথার উত্তর দেবার আগে আমি জানতে চাই, ক্ষমতা দেবার সময় সেটা প্রয়োগ করবার কোনও নির্দ্দেশ আমাকে দিয়েছিলে?

সেটা কেউ দেয় না।

দেয়। অন্যের কি কথা, শুনেছি, বড়লাটকে এ দেশে পাঠাবার আগে বিলেতের কর্ত্তারা ক্ষমতা চালানো সম্বন্ধে রীতিমত তালিম দিতে ভোলেন না। তোমার জমিদারীর কোনও মহালে যখন নতুন নায়েব বহাল করা হয়, তাকেও কি কোনও নির্দ্দেশ দাও না—কি ভাবে সে প্রজাপালন করবে, তার ক্ষমতার এক্তিয়ার কতখানি?

স্বীকার করলুম, তোমাকে কোনও নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নি; তুমি যেখানে সহধর্ম্মিণী, সংসারের গৃহিণী, সেখানে তোমার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিলুম। কিন্তু তোমারও ত কর্ত্তব্য তাতে যথেষ্ট ছিল!

নিশ্চয়ই। কর্ত্তব্য যদি অবেহলা হ'ত আমার পক্ষ থেকে, তা হ'লে গোড়াতেই ঝড় উঠত; এতগুলো বছর নিরুদ্বেগে কাটবার পর আজ হঠাৎ কৈফিয়তের তলব আসত না।

তা হ'লে কেন তুমি বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ যে, সংসারের সবার ওপরেই তুমি ওজন ক'রে তোমার ক্ষমতা চালাতে দ্বিধা কর নি।

অনর্থক মিথ্যা ব'লে ত কোনও লাভ নেই। নিক্তির ওজনে সব

কর্ত্তব্য পালন করা চলে না, বিধাতার সৃষ্টিতেও তারতম্যের অন্ত নেই, মানুষ সবাই সমান হয় না, চেহারায় স্বভাবে কত তফাতই দেখা যায়, একটা হাতের পাঁচটা আঙ্গুলই সমান নয় ; কাজেই কি ক'রে আমি বলতে পারি যে, সবার ওপরে ওজন করেই আমার ক্ষমতা চালিয়েছি।

এ কথার উত্তরে আমি যদি বলি, তা হ'লে তুমি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছ ; যারা চালাক, তারা তোমার তোষামোদ ক'রে তোমাকে ঠকিয়ে তাদের সুবিধে গুছিয়ে নিয়েছে, আর যারা বোকা, তোমার মন যোগাতে পারে নি, তারা বরাবরই অসুবিধে ভোগ করেছে, নিজেরা ঠকেছে ?

গুরুতর অভিযোগ। কর্ত্তা ভাবিয়াছিলেন, বোমা এবার সশব্দে বিদীর্ণ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে একটা কদর্য্য আবহাওয়ার আবর্ত্ত বহিবে। কিন্তু রাণীর ধৈর্য্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না, বা তাঁহার কণ্ঠস্বরে তীব্রতার কোনও আভাস পাওয়া গেল না। সহজ কণ্ঠেই তিনি স্বামীর এই কঠোর মন্তব্যের উত্তরে কহিলেন—সংসারের সকল ক্ষেত্রেই আবহমানকাল থেকে এই যোগাযোগ চ'লে আসছে। যারা চালাক তারা জেতে ; যারা বোকা তারা ঠকে। ইতিহাসেও এর নজীর আছে।

কর্ত্তা বিস্ময়ের সুরে কহিলেন—তুমি যে দেখছি মস্ত মস্ত কথা তুলে আমাদের কথাটাকে গুলিয়ে দিতে চলেছ !

রাণী মৃদু হাসিয়া কহিলেন—মস্ত বস্তু জলের ওপর জোর ক'রে পড়লেই জল গুলিয়ে ওঠে ; সত্যকে খাটো ক'রে আমি ত তোমার মন যোগাতে বসি নি, মনের মস্ত কথাটাই সাহস ক'রে খুলে বলেছি।

কর্ত্তা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—তা হ'লে এ বাড়ীতে যারাই তোমার সো হ'তে পারে নি, তুমি তাদের সকলকেই কোণঠাসা করে রেখেছ বল ?

রাণী সুস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলেন—আমার মত অবস্থায় যে কোনও মেয়ে পড়ত, এ কাজটুকু না করলে তার নিষ্কৃতিই ছিল না। এ বাড়ীতে

এসেই আমি দেখ্‌লুম, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আগেকার রাণীর নামেই পাগল, তাঁর তুলনায় আমি যে কত ছোট, তার প্রমাণ করতে তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। কাজেই আমারও প্রথম কাজ হল, আমার সেই স্বর্গীয়া সতীনটির স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলা আর আমি যে তার চেয়ে সব দিক দিয়ে বড়, সেটা সব দিক দিয়ে প্রমাণ করা। আমার হাতে যখন এত ক্ষমতা, আমার কর্ম্মক্ষেত্রে আমি যখন কর্ত্রী, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ কেন নষ্ট করব!

নিজের অজ্ঞাতেই কর্ত্তা যেন মনে মনে চমকিত হইয়া উঠিলেন। এতকাল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সহধর্ম্মিণীর সহিত এভাবে কোনও দিন তাঁহার কথোপকথন হয় নাই, এমন সুস্পষ্টভাবে রাণী কোনও দিন তাঁহার মনের কথাগুলি ব্যক্ত করেন নাই। কিছুক্ষণ বদ্ধ দৃষ্টিতে তিনি রাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর জোরে এক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—হুঁ! আচ্ছা, এবার একটা শক্ত কথাই আমাকে তুলতে হচ্ছে; খোকার সম্বন্ধেও কি তুমি ও ক্ষমতা বরাবর চালিয়ে এসেছ? সতীনের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছে ফেলতে যখন তুমি চেষ্টার ত্রুটি কর নি, সেই সতীনের ছেলেটিও কি তা হ'লে—

স্বর এখানে ভাবের উচ্ছ্বসিত আবর্ত্তে রুদ্ধ হইয়া গেল, স্ফীত দুইটি চক্ষু রাণীর মুখের দিকে তুলিয়া নিবিষ্টভাবে তিনি চাহিয়া রহিলেন, শীকরসিক্ত তারকা দুইটিই যেন অসমাপ্ত কথাগুলি ব্যক্ত করিয়া দিল।

রাণী অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন—খোকার কথা বলছ? কি সম্বন্ধে তোমার এই প্রশ্ন? তাকে আত্তি-যত্ন করবার, মানুষ ক'রে তোলবার, না আর কিছু?

কর্ত্তা অভিভূতের মত কহিলেন, আমি কথাটার খেই হারিয়ে ফেলছি ক্রমাগতই, কোন্ কথাটা আমি জানতে চাই, সেটা আমি না বলেই

তোমাকে জানাচ্ছি, তুমি তার সম্বন্ধে সবই যখন জান, তোমার যেটুকু বলবার আছে, তার সম্বন্ধে তাই বল।

রাণী কহিলেন—সংসারের ভার আমার ওপর যতটা বিশ্বাস ক'রে তুমি দিয়েছিলে, খোকার ভার ত সে ভাবে আমাকে দাও নি, বরং ওদিক দিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে তোমার আগেকার রাণীর দাসীদের হাতেই তাকে সমর্পণ করেছিলে।

হাঁ—এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। সপত্নীপুত্রের ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে যদি তুমি বেজার হও সেই জন্যই আমি তোমাকে অসুবিধায় ফেলি নি।

শুধু তাই কি? কিন্তু আমার মনে হয়, বিমাতার হাতে পড়ে পাছে খোকার অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কাতেই আমাকে অবহেলা করা হয়েছিল। আমিও ভেবেছিলুম, সেটা বিধাতারই আশীর্ব্বাদ। কেন না, খোকার ভার যদি আমাকেই দিতে, আর আমি প্রসন্ন হয়েই তাকে কোলে তুলতুম, তা হ'লে আজ সে জড়ভরতের মত অকর্ম্মণ্য হয়ে প'ড়ে থাকত না।

কিন্তু তবুও কি তার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে চাওয়াটা তোমার উচিত ছিল না?

না। প্রথম দিকে আমি অভিমান করেই তার দিকে চাই নি, তার পর নিবারণ আসতে তার দিকেই আমাকে পূরোপূরিই চাইতে হয়েছিল। বড় হতে সবাই যখন বললে, খোকা, একেবারে নীরেট, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, লেখাপড়া হবে না, আর নিবারণের সুখ্যেত তাদের মুখে ধরে না, তখন বোধ হয়, আমার মত খুসী আর কেউ হয় নি।

আর্ত্তস্বরে কর্ত্তা কহিলেন—তুমি শুনে খুব খুসী হয়েছিলে?

মৃদু স্বরে রাণী কহিলেন—অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছিলুম—এই কথাটা মিছে বানিয়ে বললে তুমি হয় ত খুসী হবে; কিন্তু আমি অকপটে সত্যই

বলছি। আর, কেনই বা খুসী হব না? আমি ত মানুষ, খুব বেশী যে লেখাপড়া শিখে তত্ত্বজ্ঞান পেয়েছি, তাও নয়, রক্ত-মাংসের শরীর আমার, ষোল আনা স্বার্থ নিয়ে সম্বন্ধ। সতীনের ছেলে যাচ্ছেতাই হ'লেই আমার ছেলের অদৃষ্ট যখন খুলে যাবে, বাশুলীর গদীতে সে-ই বসবার যোগ্যতা পাবে, মায়ের পক্ষে এর চেয়ে খুসীর কথা আর কি থাকতে পারে? তবে এ কথা স্বীকার করবই, গল্প-উপন্যাসের সৎমাদের মত ঐ কাঁটাটাকে ভাঙ্গবার বা তোলবার কোনও চেষ্টাই যেমন করি নি, তেমনই তাকে শাণাবারও কোনও যত্নই এ পর্য্যন্ত নিই নি, ভোঁতা হয়েই যাতে বরাবর প'ড়ে থাকে, সেইটুকুই ছিল আমার আগ্রহ। এতে আমাকে তোমরা স্বার্থপরই বল, বা এই নিয়ে যে কোনও অপবাদই আমার ওপর চাপাও আমি বরাবর জোর ক'রে ব'লে যাব—সন্তানের স্বার্থের দিকে চেয়ে আমি আমার কর্ত্তব্যই করেছি।

অসহিষ্ণুভাবে কর্ত্তা কহিলেন—আর যাকে বঞ্চিত করতে তুমি এই অনাচার করেছ, সেও কি তোমার সন্তান নয়?

রাণী কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়া কহিলেন—না! কাগজে, কেতাবে যেমন পড়া যায়—আমি মা, দেশময় আমার অসংখ্য সন্তান, এও ঠিক তাই! বাইরে থেকে শুনতেই ভাল, স্বার্থের সংস্রবে এলেই গোল বাধে। সন্তানের মমতা নিয়ে আজ তুলছ তুমি সমস্যা, কিন্তু গোড়ায় বিশ্বাস করতে পার নি, তখন ছিলুম আমি বিমাতা! ব্যবধানের প্রাচীর তুলেছিল কে? অথচ, নিজেও ছিলে দিব্যি নিশ্চেষ্ট, একেবারে নির্ব্বিকার! তারপর, নিজেই বরাবর নিবারণকে প্রাধান্য দিয়েছ, নিজেই স্বীকার করেছ কতবার—সেই গদীতে বসবে। অথচ—

বিকৃতকণ্ঠে কর্ত্তা কহিলেন—থামলে কেন, বল; তোমার কথাটা ত এখনও শেষ হয় নি।

রাণী উচ্ছ্বাসের সুরে কহিলেন—সে মত এখন বদলে গিয়েছে। যে

দিন কবরেজের মেয়েকে প্রথম দেখেছিলে, তার হাতের জোর দেখে নেচে উঠেছিলে এ বংশের বউ করতে, সে গরীবের মেয়ে ব'লে আমি রাজী হই নি—অমনি রোখ তোমার চেপে গেল, আর এত কাল পরে হঠাৎ খোকার জন্যে বুক অমনি টন্‌টন্ ক'রে উঠল! এখন নিবারণ হয়েছে যাচ্ছেতাই; দিনরাত স্বপ্ন দেখছ, বউ তোমার ইঞ্জিন হয়ে ঐ গাধাবোটখানাকে টেনে নিয়ে জমিদারী দরিয়ার কিনারায় ভিড়িয়ে দেবে! এই স্বপ্নে বিভোর হয়েই তুমি থাক, আর যে কৈফিয়ৎ আমি দিলুম, যদি আমার দোষ তাতে থাকে, শাস্তির ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দেই করতে পার, আমি তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

রাণীকে এবার উত্তেজিত দেখিয়া কর্ত্তা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কহিলেন—এঃ! সেই মামুলী রাস্তাতেই শেষটায় গড়িয়ে পড়লে তুমি! শাস্তির কথাও ওঠে নি, আর বৌমার কথা আমি মোটেই তুলি নি, তুমি খামকা সেই ভদ্রলোকের মেয়েকে টেনে মামলাটা ভারী করতে চাইছ! তা হ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখন বৌমাই হ'য়ে দাঁড়াচ্ছেন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী!

রাণী শ্লেষের সুরে উত্তর দিলেন—এটা আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলি!

কিন্তু এই ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে সৌভাগ্যের বিষয় ক'রে নেওয়া যায় না?

কি সূত্রে শুনি?

এই মুখরা মেয়েটিকে মায়ের স্নেহে তোমার কোলে টেনে নিয়ে?

উদ্দীপ্তকণ্ঠে রাণী কহিলেন—তা হয় না, কিছুতেই না! এমন অনুরোধ তুমি যেন দ্বিতীয়বার আমাকে আর ক'র না। তার চেয়ে তোমার জড়ভরত খোকাটিকে যদি ওর কাঁধেই ভর দিয়ে বাগুলীর গদীতে বসাতে চাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই, বাধা দিতে একটি কথাও আমি বলব না।

গম্ভীরমুখে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু নিবারণকে ঠেকাতে পারবে?

দৃপ্তকণ্ঠে রাণী উত্তর দিলেন—আমি তাকে জোর ক'রে টেনে আনব, বেঁধে রাখব—

তারপর? বরাবর এই মেয়েটির প্রভুত্ব সইতে পারবে?

সে ভাবনা পরে! তোমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সুস্পষ্টস্বরে কর্ত্তা কহিলেন—তুমি যে কথাগুলো এইমাত্র বল্‌লে, তার প্রতিবাদ করবার আছে। তুমি নিশ্চয়ই জান, বাশুলীর গদীতে এ পর্য্যন্ত গাঙ্গুলী-বংশের কোনও ছেলে অন্য বংশের কোনও মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে বসে নি; জ্যেষ্ঠের অধিকারে ওখানে একান্তই বস্‌তে যদি হয়, খোকাকেই বসতে হবে; কিন্তু তার আগে মানুষ হবার যোগ্যতাটুকু অর্জ্জন করতে না পারলে ওটা তার পক্ষে দুরাশা ছাড়া কিছু নয়।

রাণী স্তব্ধভাবেই কথাটা শুনিলেন। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই! কর্ত্তা একবার অপাঙ্গে রাণীর মুখের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণে সমবেদনা উদ্রেকের ভঙ্গিতে কোমলকণ্ঠে কহিলেন—তুমি এ ভারটুকু নিতে পার না? যে কোনও কারণেই হোক, যে অবহেলা তার সম্বন্ধে তার শৈশবের অসহায় অবস্থায় আমাদের পক্ষ থেকে হয়ে গেছে, এখন কি সেটা শুধরে নেওয়া যায় না?

ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিয়া রাণী স্নিগ্ধস্বরে উত্তর দিলেন—যদি সম্ভব হ'ত, তোমার এ অনুরোধ আমি মাথা পেতে নিতুম, কিন্তু এখন তা হবার নয়। পাথরকে চেষ্টা ক'রে চালানো যায়, কিন্তু জাগানো যায় না।

মুখে উৎফুল্লের ভাব প্রকাশ করিয়া জোরকণ্ঠে কর্ত্তা কহিলেন—ঠিক! এই সম্ভব কি না, জানবার জন্যই তোমাকে ডেকেছিলুম, আর

এই সূত্রে এত বাজে কথার বৃথা চর্চ্চা করা গেল। কিন্তু আমি এই আসল তত্ত্বটুকু না বুঝেই নিজের খেয়ালে ঐ মেয়েটিকেই অগতির গতি ভেবে ওর হাতে আমার বড় সাধের সোণার চাবুকটি তুলে দিয়েছিলুম।

মৃদুকণ্ঠে রাণী কহিলেন—সে কথা শুনেছি।

গলার স্বর গাঢ় করিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত কর্ত্তা কহিলেন—কিন্তু আজ সে চাবুকটি ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে, বলেছে, পাথরকে জাগাতে মানুষের মনের পরশই যথেষ্ট, সোণার সংস্রবের দরকার হয় না। আমি এ কথার উত্তরে কি সাব্যস্ত করেছি, শুনতে চাও?

জিজ্ঞাসুনয়নে রাণী কর্ত্তার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি উত্তেজিত-কণ্ঠে গাঢ়স্বরে কহিলেন—তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত নালিশ আজ পর্য্যন্ত এসেছে, আমি সব মুলতুবী রেখেছি শুধু তার দিকে চেয়ে, যদি ঐ পাথরটাকে সে জাগাতে পারে, তার সাত খুন মাপ, সকলের ওপরে হবে তখন তার স্থান; কিন্তু যদি হারে, তা হ'লে ঐটিকে অবলম্বন করে তাকে শ্যামাপুরে ফিরে যেতে হবে; যাকে বলে—পুনর্মূষিকো ভব!

কথাটা শেষ হইতেই কর্ত্তার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক দেখা দিল, সে হাসিটুকু প্রখর বিদ্যুতের মতই তীব্র। রাণী অপলকনেত্রে স্বামীর সেই বিচিত্র মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্থ পর্ব্ব

বিকর্ষণ

এক

বাশুলী গ্রামখানি সৌন্দর্য্যময়ী সমৃদ্ধ নগরীর ন্যায় অন্যান্য বিষয়ে সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইলেও, কোনও নদীর স্রোতোধারায় অভিষিক্ত হইবার সুযোগ তাহার ছিল না। তবে এইটুকুই গ্রামবাসিগণের সান্ত্বনার বিষয় ছিল যে, পার্শ্ববর্ত্তী দশ-বারোখানি গ্রামের পরেই যে নদীটির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা স্রোতস্বিনী সরস্বতী এবং এ-অঞ্চলের ভূস্বামীর মতই তাহার প্রভাব ও প্রকৃতি অতিশয় প্রখর। উপরন্তু নদীর সংস্রবগত অভাবটুকু কথঞ্চিৎ মোচন করিতে বাশুলীর বাবুরা বিপুল অর্থব্যয়ে এই বেগবতী নদীটির একটি শাখা খালের আকারে বাশুলীর প্রান্ত দিয়া বিস্তীর্ণ জমিদারীর সীমান্তবর্ত্তী আর একটি নদীর সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং নদীর মোহনায় এক গগনস্পর্শী বিশাল ভবন তুলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন—বাশুলী-কানন।

বাশুলী হইতে প্রায় পনেরো মাইল তফাতে সরস্বতীর কূল ঘেঁসিয়া এই উদ্যানভবন। বর্ষার প্রবল বন্যা ও জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে তীরভূমির ভাঙ্গন রক্ষা করিতে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া কেল্লার গম্বুজের আকারে সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য প্রাকার এই বিশাল উদ্যানভবনটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া থাকে। এই অনুপাতে উদ্যানের রচনা-বৈচিত্র্য, দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য নানাজাতীয় পুষ্প ও তরুরাজির সমন্বয়, উদ্যান-সংলগ্ন প্রাসাদোপম অট্টালিকার শোভা, এবং প্রাসাদ-কক্ষগুলির আড়ম্বরপূর্ণ সজ্জা ও সৌন্দর্য্য সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ কালই এই অতুলনীয় প্রাসাদের বিবিধ আসবাবপত্রে সুসজ্জিত কক্ষগুলি শূন্যই পড়িয়া থাকে। কোনও কোনও বৎসর গ্রীষ্মের সময় খোদ জমিদার সপরিবার এখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থিতি করেন। সে সময় এই অঞ্চলটি জমকাইয়া উঠে ও অধিবাসিগণ সাগ্রহে তাহাদের ভূস্বামীর দীর্ঘ স্থিতি কামনা করে। কিন্তু সকল বৎসরেই হুজুরের শুভাগমন সম্ভবপর হয় না। এ বৎসরও হয় নাই।

তবে কয়েক বৎসর হইতে প্রায় প্রতি ঋতুতেই ছোট হুজুর—খোকা রাজাকে অস্থায়িভাবে বাগুলী-কাননে সপরিষদ দুই এক অহোরাত্র অতিবাহিত করিতে দেখা যাইতেছে বটে। কিন্তু ইহাতে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা বিশেষ উৎফুল্ল হইতে পারে নাই। কেন না, যত বড় রাশভারি হউন না কেন, এবং বাগুলীর সদরে বড় হুজুরের দর্শনলাভ দুর্লভ হইলেও, এখানে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যাইত! এখানকার সদরে বড় হুজুরের সম্মুখে কেহ একবার সাহসের সহিত আসিয়া দাঁড়াইলে, সেই নৃপতুল্য মানুষটির স্নেহলাভে বঞ্চিত হইত না। কিন্তু ছোট হুজুরের প্রকৃতি ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; কেহ দর্শনার্থী হইলেই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতেন যে, সেরেস্তার সুযোগটুকু এখানেই লইবার উদ্দেশে তাহার এই স্পর্দ্ধা; সুতরাং এই সূত্রে সাক্ষাৎকারীর লাঞ্ছনার অন্ত থাকিত না। শুধু প্রজারাই নহে, প্রাসাদের পরিচারক ও দ্বারবান্‌গণ ছোট হুজুরের আবির্ভাব হইলেই আতঙ্কিত হইয়া পড়িত। তাহারা জানিত, দোষ ত' দূরের কথা, সামান্য একটু ভুলচুক হইলেও তাহাদের নিষ্কৃতি নাই, কঠিন দণ্ড অনিবার্য্য। সুতরাং সকলেই ভগবানের নিকট নিয়ত ছোট হুজুরের আশু অপসারণের প্রার্থনাটুকু না জানাইয়া পারিত না।

কিন্তু ইহাদের কাতর প্রার্থনা এবার শ্রীভগবানের কানে গিয়া পৌছায় নাই। যেহেতু, প্রায় তিনটি মাসের উপর আট দশটি সহচরের সহিত ছোট হুজুর নিবারণবাবু বাহাল তবিয়তে বাগুলী-কাননে কায়েমী ভাবেই

বসবাস করিতেছেন। সদরের সেরেস্তার কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া এখানে এভাবে তাঁহার দীর্ঘ অবস্থিতির মূলে অবশ্য বড় হুজুরের মঞ্জুরী ছিল এবং বিচক্ষণ গৃহ-চিকিৎসকের সহায়তায় বিশেষভাবে তদ্বির করিয়া ছোট হুজুরকে সেই মঞ্জুরীটুকু আদায় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মূলে অতি বিচক্ষণ মস্তিষ্কপ্রসূত যে গূঢ়তর উদ্দেশ্যটুকু নিহিত ছিল, বাশুলীর বহুদর্শী বড় হুজুরের সদাসন্দিগ্ধ চিত্তেও তাহার রেখাটি পর্য্যন্ত পড়ে নাই।

এই সূত্রে ছোট হুজুরের নূতন সহায়ক এই বিচক্ষণ গৃহ-চিকিৎসক এম, বি, উপাধিধারী বিশ্বমিত্র মজুমদার নামক নূতন জীবটির পরিচয় একান্ত প্রাসঙ্গিক।

বাশুলীর খাল ও সরস্বতী-কাননের মত বিপুল ব্যয়ে এক সুবৃহৎ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠুভাবে তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া গাঙ্গুলীবাবুরা স্থায়ী কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত কোনও প্রবীণ সিভিল সার্জ্জন উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হইয়া হাসপাতালটি পরিচালনা করিতেন এবং গাঙ্গুলী-পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও তিনি অবহিত থাকিতেন। দুই বৎসর পূর্ব্বেও বিখ্যাত সিভিল সার্জ্জন অমরনাথ ব্যানার্জ্জী বাশুলী হাসপাতালের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার প্রায় দশবর্ষব্যাপী সাধনায় ও আধুনিক পরিকল্পনায় শুধু এই হাসপাতাল কেন, এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিবিধ উন্নতি-বিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসায় তাঁহার যেমন হাত-যশ ছিল, সকল শ্রেণীর রোগীর প্রতি ব্যবহারটিও ছিল তেমনই সুন্দর। জনসাধারণ শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার নামকরণ করিয়াছিল—ধন্বন্তরি দেবতা। এই দেবতাটিই একদা দয়া-পরবশ হইয়া ডাক্তার বিশ্বমিত্র মজুমদারকে তাঁহার সহকারীরূপে অস্থায়ীভাবে হাসপাতালের কার্য্যে নির্ব্বাচিত করেন। সে সময় সহসা কলেরা করাল মূর্ত্তি ধরিয়া এই অঞ্চলে সংহার-লীলা আরম্ভ করিয়া দেয়; ক্যাম্বেলের পাশ যে ডাক্তারটি তাঁহাকে সাহায্য করিতেন,

ডাক্তার অমরনাথ তৎকালে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই ; অস্থায়িভাবে এক জন বিচক্ষণ চিকিৎসক নিয়োগের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন এবং তাহাতে কয়েক দিনের মধ্যেই শতাধিক উপাধিধারী ডাক্তারের আবেদনপত্র তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলে। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মেডেল, ডিপ্লোমা এবং পাঞ্জাব প্রদেশের কতিপয় নামজাদা চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট ও কয়েক জন নামী নেতার সুপারিশপত্রসহ বাগুলীর হাসপাতালে ডাক্তার মজুমদারের শুভাগমন হয়।

প্রথম দর্শনে মজুমদারের আকৃতি প্রিয়দর্শন বর্ষীয়ান্ ডাক্তার অমরনাথের প্রীতিপদ না হইলেও তাহার সঙ্গের এতগুলি দুর্ব্বার হাতিয়ার ও তাহার বাক্‌শক্তির প্রভাব তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই নবাগত ডাক্তার যখন দুই প্রান্তে ক্ষৌরিত মধ্যের হ্রস্ব গোফটুকু কুঞ্চিত করিয়া স্বাভাবিক-বক্র-দৃষ্টিটুকু প্রধান চিকিৎসকের দিকে প্রখরভাবে নিক্ষেপ করে, তাঁহার সহকর্মীরা তখন পরস্পর নিম্নস্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল—বাপ রে! এ যে শনির দৃষ্টি!

সে দিনের এই মন্তব্যটি কয়েক মাসের মধ্যেই নির্ঘাত সত্য হইয়া প্রধান চিকিৎসকের উপর দিয়াই ফলিয়া গিয়াছিল। একটি মাসের মধ্যেই কলেরা বাগুলীর এলাকা ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, তিনটি মাস পরেই নবাগত মজুমদারের অস্থায়ী পদ ত্যাগ করিয়া যাইবার কথা; কিন্তু আরও কয়েকখানি উচ্চস্তরের সুপারিসের দাপটে অস্থায়ী চিকিৎসক স্থায়িভাবেই প্রধান চিকিৎসকের সহকারী পদে পাকা হইয়া বসেন। ইহার কয়েক মাস পরেই বাগুলীবাসী সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিয়াছিল, দশ বৎসরের কর্ম্মক্ষেত্র ও প্রাণতুল্য চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানটির সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া 'ধন্বন্তরি-দেবতা' অমরনাথের সপরিবার বাগুলী ত্যাগ এবং তাঁহার পদে তাহাদের চক্ষুঃশূল বিশু ডাক্তারের অধিষ্ঠান! ইহার

মূলে যে নানা রকমের যোগাড়যন্ত্র ও রীতিমত চক্রান্তের সংযোগ ছিল, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি হাসপাতালের কর্ম্মচারীদের থাকিলেও, শনি দেবতার রোষদিগ্ধ বক্রদৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইবার মত সাহসটুকু তাহাদের কাহারও ছিল না।

ইহার পর যে দিন হাসপাতালের কর্ম্মচারী ও এষ্টেটের আমলাবর্গ পর্য্যন্ত সকলেই জানিতে পারিয়াছিল, সেয়নায় সেয়নায় কোলাকুলি হইয়াছে, অর্থাৎ দুর্ম্মুখ ছোট হুজুরের সহিত হাসপাতালের এই জবরদস্ত হুজুরটির শুভ সংযোগ ঘটিয়াছে, সে দিন সকলকেই চমৎকৃত হইয়া একবাক্যে বলিতে হইয়াছিল—তোফা!

এই শুভ সংযোগের পূর্ব্বাভাসটুকু এইরূপ :—

বধূর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে গিয়া নিবারণ সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তার নিকট যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহা সে সহ্য করিতে পারে নাই; নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা দুর্ব্বিসহ হইয়া তাহাকে শয্যাশায়ী, করিয়া দেয়। তাহার রক্তচক্ষু, কম্পিত দেহ, বিবর্ণ মুখ, উদাস দৃষ্টি, জিহ্বার জড়তা পরিজনদের চিত্তে বিষম বিক্ষোভের সৃষ্টি করে; তৎক্ষণাৎ বিশু ডাক্তারের আহ্বান এবং অনতিবিলম্বে রোগীর কক্ষে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে তাহার প্রথম প্রবেশ!

প্রাথমিক চিকিৎসায় রোগী অনেকটা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলে ডাক্তার পরিজনদের দিকে চাহিয়া গম্ভীরমুখে জানাইলেন—একটি ঘণ্টার জন্য আপনাদের বাইরে যেতে হবে; এ ঘরে ত নয়ই, আমার ইচ্ছা—ঘরের আশে পাশেও কেউ না থাকেন।

পরিজনরা তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করিলে ডাক্তার স্বহস্তে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া রোগীর অঙ্গ ঘেঁসিয়া তাহার শয্যায় বসিলেন। রোগীর দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের দিকে। চোখোচোখি হইতেই ডাক্তার কহিলেন—দেখুন, আমি ডাক্তার; আপনার জীবন-মৃত্যুর ভার যখন আমার হাতে

দিয়েছেন, তখন আপনার মনের দুয়ারটিও অসঙ্কোচে খুলে দিতে হবে; এর মধ্যে কোনও আবরণ থাকবে না।

মৃদুকণ্ঠে নিবারণ প্রশ্ন করিল—আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি, ডাক্তার?

দৃঢ়স্বরে ডাক্তার আশ্বাস দিলেন—স্বচ্ছন্দে। এ বাড়ীতে আপনার চিকিৎসায় আমি এই প্রথম ব্রতী হলেও, আমি আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি, ব্যাধি আপনার মনে; আর তার উৎপত্তি কি সূত্রে, তারও কতক কতক যে জানি না, তা নয়।

আপনি জানেন? আশ্চর্য্য ত!

না জানাটাই বরং আশ্চর্য্যের বিষয়; আমি ডাক্তার, যাঁদের জীবনের সঙ্গে আমার কর্ত্তব্যের যোগসূত্র থাকে, তাঁদের ব্যাধি সম্বন্ধে যেমন সর্ব্বদা সচেতন থাকতে হয়, মনের অনেক তত্ত্বও সেই সূত্রে সংগ্রহ ক'রে রাখতে হয়।

বলেন কি?

ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ানের ওটাও একটা ডিউটি, মনের খবর জানা না থাকলে রোগের চিকিৎসা চালানো এ-যুগে অসম্ভব।

আমার মনের খবর তা হ'লে জেনেই চিকিৎসায় এসেছেন বলুন?

আগেই ত এ কথা বলেছি, কতক কতক জানা আছে বৈ কি! এখন বাধ্য হয়েই আপনাকে এ কথাও জানাতে হচ্ছে আপনার মনের ব্যাধিটি রীতিমত বেঁকে দাঁড়িয়েছে, যদিও ঠিক 'হোপলেস্' অবস্থা নয়, কিন্তু সে অবস্থায় গড়িয়ে পড়া কিম্বা তা থেকে খুব ক্লেভার্লী টার্ণ নিয়ে এড়িয়ে যাওয়া এখন আপনার হাত।

আমার হাত?

হাঁ। আপনার মন ছুটেছিল সেকেলে রাজাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার মত দুর্ব্বার বেগে, তার কপালে আঁটা পরোয়ানা প'ড়ে কেউ তাকে ছুঁতে

ভরসা পায় নি, কিন্তু সে এত দিনে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সবাই তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু এগুচ্ছে না কেউ তাকে বুদ্ধি খেলিয়ে তুলে দিতে ; এই ভাবে দিনকতক প'ড়ে থাকলেই তার অবস্থা হবে ঠিক আপনার জড়ভরত ভাইটির মত।

নিবারণ শিহরিয়া উঠিল ; বুঝিল, ডাক্তার মিথ্যা বলে নাই। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্তে রাখিবার শক্তি সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল ; শুধু তাহাই নহে, মনের ব্যাধির যে নির্দ্দেশ এই মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার আজ দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার শক্তিও ত তাহার নাই। এ পর্য্যন্ত সে যাহাকে কৃপাপ্রত্যাশী ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আজ এই প্রথম তাহার সম্বন্ধে অন্তস্তলে অন্তরের শ্রদ্ধার সঞ্চার! কণ্ঠের স্বর কৌতূহলে কোমল করিয়া সে কহিল—সত্যই আপনি অনেক খবরই রাখেন দেখছি! আচ্ছা বলতে পারেন, ঘোড়াটা ওভাবে হঠাৎ কেন প'ড়ে গেল?

চলতি পথে একখানা শাড়ীর আঁচল ঝাপ্টায় ঘাবড়ে গিয়ে বে-টপকায় মোড় নিয়েছিল, এ ক্ষেত্রে পড়াটা স্বাভাবিক।

পুনরায় ওঠাটা?

উচিত ত বটেই, অবশ্য যদি ডাক্তারের চিকিৎসা এবং পরামর্শ চলে!

কিন্তু যে শাড়ীর কথা তুললেন, তার অধিকারিণীর খবরও আপনি রাখেন না কি?

অনেক। আপনারা তার সিকিও জানেন কি না সন্দেহ!

কথাটা শুনিয়াই দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া নিবারণ উঠিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়া সহজ কণ্ঠেই কহিল—উঠবেন না এখন, শুয়ে-শুয়েই আমার কথা শুনুন, যা জিজ্ঞাসা করবার হয় করুন। যদিও স্পষ্ট অনুভব করছি, আমার কথাতেই আপনার রোগ এখন

পালাবার পথ পাচ্ছে না, তথাপি আপনাকে কিছু দিন রোগী হয়েই থাকতে হবে।

নিবারণ এ কথায় কাণ না দিয়া আগেকার কথার সূত্র ধরিয়াই প্রশ্ন করিল—আমাদের চেয়েও আপনি বেশী খবর রাখেন?

এতে বিস্ময়ের কি আছে, তা ত বুঝছি না; উনি যখন পাঞ্জাবে ওঁর দাদামশায়ের হেফাজতে ছিলেন, আমি যে তখন সেখানে প্র্যাকটিস করতুম।

ওঃ—তাই বলুন! তা হ'লে—

সে সময় অনেক খবর সংগ্রহ করবার আমার অবকাশ হয়েছিল। কিন্তু এখন সে সব কথা থাক, পরে সবই শুনবেন; এখন আমার কথা এই, যে ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তাকে চাঙ্গা ক'রে আবার ছোটাতে হবে, এবার রাস্তার ভুল আর হবে না।

নিবারণের মাথার মধ্যে তখনও পূর্ব্বের কথাটাই তালগোল পাকাইতেছিল, উৎসুকভাবেই পুনরায় প্রশ্ন তুলিল—আপনার সঙ্গে যখন জানাশোনা ছিল, কথাবার্ত্তাও হয়েছিল নিশ্চয়?

ডাক্তার জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—সে ত হবারই কথা, ওঁর শেষের কথাটা এখনও আমার কাণে যেন আঘাত দিচ্ছে!

কি সম্বন্ধে কথা ডাক্তার? বলতে আপত্তি আছে?

কিছুমাত্র না; আমার মানসিক চিকিৎসা সম্বন্ধে উনি একদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন, আপনি ফিজিকস্ (Physics) ছেড়ে ফিজিয়নমির (Physiognomy) চর্চ্চা করুন, তাতে লোকের মুখের ভাব দেখে মনের ভাব ব'লে দিতে পারবেন।

আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন?

জবাব দেবার অবসর পাই নি; দেখা যাক, আপনার ঘোড়াটা যদি

'উইন' করে, তখন হয় ত জবাবটা তারই মারফতে দাখিল করবার সুযোগ হবে।

কথাটা শুনিয়াই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নিবারণ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইল, ডাক্তারের বক্রদৃষ্টিও তাহার দিকেই বদ্ধ হইয়াছিল; উভয়েই উভয়কে শুভক্ষণে চিনিয়া লইয়া স্ব স্ব হৃদয়ের দ্বার অকপটেই খুলিয়া দিল। বয়ঃক্রমগত প্রায় দশটি বৎসরের ব্যবধান, আভিজাত্যের দম্ভ ও অধীনতার সঙ্কোচ মানবদেহধারী এই দুইটি অপূর্ব্ব জীবের মধ্যে এত দিন যে বাধার প্রাচীর তুলিয়াছিল, আশ্চর্য্য রকমেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

নিবারণের ব্যাধি, তাহার নিদান ও তাহা হইতে নিষ্কৃতির বিধান এমন ভাবে এই বিশু ডাক্তার হরিনারায়ণবাবুকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি সে অবস্থায় সভয়ে সায় দিতে বাধ্য হইলেন। অতিরিক্ত কর্ম্মের চাপ এবং তাহার উপরে কোনও নিদারুণ মনস্তাপ যে ব্যাধির ভিত্তি, তাহাকে অবহেলা করিলে অদূর ভবিষ্যতে মস্তিষ্কবিকৃতি অনিবার্য্য—ডাক্তারের এই নির্দ্দেশই তাঁহার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াছিল, সুতরাং এই বিচক্ষণ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সরস্বতী-শীকর-সিক্ত বায়ুপ্রবাহে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য পুত্রকে সরস্বতী-কাননে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতির অনুমতি দিয়াছিলেন।

সরস্বতী-কাননে কয়টি মাসের অবস্থিতিসূত্রে সেখানকার পারিপার্শ্বিক সুষমা-মাধুর্য্যে ও অন্তরঙ্গ বিশু ডাক্তারের সাহচর্য্যে নিবারণ শুধু যে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতেছিল তাহা বলা যায় না; সেই সঙ্গে তাহার তরুণ জীবনে অনাস্বাদিত আরও দুই একটি অভিনব বস্তুর সহিত পরিচয়-সূত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও করিয়াছিল।

নিবারণ যে সময় চা খাইত, ডাক্তার তাহার টেবিলে বসিয়াই সে সময় সুরার পেগ, চালাইতেন; হাসিয়া বলিতেন, স্বাভাবিক উষ্ণ এই তরল

পদার্থটি মনোব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ। সপ্তাখানেক পরেই, নিবারণের চায়ের পিয়ালায় এই মহৌষধটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিলিত হইয়া চায়ের শক্তি বাড়াইয়া দিল। পরের সপ্তাহে পিয়ালাটি উভয় জাতীয় তরল পদার্থের সমানাধিকার মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। পরের সপ্তাহ স্বাভাবিক উষ্ণ তরল পদার্থ-টি পিয়ালাকে উপেক্ষা করিয়া, উচ্চতম আধার অধিকার করিয়া লইল। পানভোজনের টেবিলে দুই বন্ধুর মধ্যে সাম্যের যে খুঁৎটুকু ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেল।

মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ব্যাধিগ্রস্ত বন্ধুর মনোরথ পূর্ণ করিতে এই কয়টি মাস শুধু যে মনোব্যাধির মহৌষধ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। মনের মত বেগবান গতিতে জেলার বিভিন্ন স্থানে ছুটাছুটি করিয়া তিনি বাশুলীর বিশাল এষ্টেট দরিয়ায় টানা দিবার জন্য এক মহাজাল রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের সাগরবন্ধনে ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালীও যোগ দিয়াছিল; ডাক্তারসহায় শ্রীমান্ নিবারণের এই উদ্যমে ছোটবড় অনেকেই জালের গ্রন্থি বাঁধিয়াছিল। বাশুলী এষ্টেটের বধূটির মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার সহিত দেশের বিপ্লবপন্থীদের অনুসৃত নীতির ঐক্য প্রকাশ পায়; শ্যামাপুরে এই বধূটির আব্দার অনুসারে জবরদস্ত ভূস্বামীর অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সেই বিদ্যালয়ে বালিকাদের অধ্যয়নে বাধ্য করিতে তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতাপ্রয়োগ প্রভৃতিও অতিরঞ্জিতভাবে গ্রথিত হইয়াছিল। মিশনারী বিদ্যালয়ের লাঞ্ছিতা শিক্ষয়িত্রীও এই জালে গ্রন্থি দিতে দ্বিধা করেন নাই। জমিদার কর্তৃক বিদ্যালয় স্থাপিত ও চালু হইবার পরেই ছাত্রীর অভাবে মিশনারী বিদ্যালয়টির দরজা বন্ধ হইয়া যায়, ডিষ্ট্রিক্ট মিশন সোসাইটির কর্তারা ইহাতে রীতিমত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন; এ তরফ হইতেও সহযোগিতার অপ্রতুল ঘটে নাই। জেলার কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়াসেন্ সাহেব বরাবরই বাশুলীর

এই খেয়ালী জমিদারটির প্রতি বিরূপ ছিলেন, অথচ তাঁহাকে কায়দা করিতে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন রন্ধ্রই পান নাই। সহসা এই সময় তাঁহার নিকটে নানা সূত্রে বাশুলী এষ্টেট এবং তাঁহার ভূস্বামীর বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল। সাহেব বুঝিলেন, এত দিনে একটা রন্ধ্র মিলিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে সহসা প্রবেশ করিতে মনে স্বভাবতঃই দ্বিধা উঠিতেছিল। উঠিবারই কথা; নামী জমিদার, সরকারী খেতাবের পরোয়া করে না, প্রচুর প্রভাব; যদি অভিযোগ মিথ্যা হয়?

কিন্তু দ্বিধাটুকুও তাঁহার দূর করিয়া দিল, একদা অপ্রত্যাশিতভাবে জমিদারপুত্র তাঁহার খাস কামরায় দর্শন দিয়া। বলা বাহুল্য নিবারণ একা আসে নাই, বিশু ডাক্তার উকীলের মতই তাহার সাথী হইয়া আসিয়াছিল এবং সাহেবের সহিত কথা কহিতে নিবারণ যেখানে খেই হারাইতেছিল, বিশু ডাক্তার তৎক্ষণাৎ দক্ষতার সহিত সেটুকু সংশোধন করিয়া দিতেছিল।

এই সাক্ষাৎসূত্রে প্রকাশ পাইল, যে দুর্দ্দান্ত মেয়েটি জমিদার বধূ হইয়াছে, সে-ই এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে বাশুলীর বৃদ্ধ জমিদারকে চালনা করিতেছে। তাহার স্বামী মূর্খ, জড়প্রকৃতি ও পাগল; সুতরাং জ্যেষ্ঠ হইলেও সে বাশুলীর গদীতে বসিবার যোগ্যতা হারাইয়াছে। কিন্তু বধূ কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া জমিদার এই পাগলকেই বাশুলীর গদীতে বসাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহাতে প্রকারান্তরে বধূই বাশুলীর পরিচালিকা হইবে, কিন্তু তাহা হইলে এই বিখ্যাত ষ্টেট কিছুতেই সরকারের সহিত সদ্ভাব ও সহযোগিতা রাখিতে পারিবে না—যে হেতু এই মেয়েটির প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং বাঙ্গালার যে সকল তরুণী বিপ্লবের পথে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছে, তাহাদের সহিত ইহার রীতিমত যোগসূত্র আছে।

এই সূত্রে নানা কথাবার্ত্তার পর সাহেব নিবারণকে আশ্বাস দিয়া

করমর্দ্দনে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন, ডাক্তারও অনুরূপ সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত হইলেন না।

এই ঘটনার পনের দিন পরে একদা গভীর রাত্রিতে সরস্বতী-কাননের প্রমোদভবনে প্রমোদের প্রবাহ ছুটিয়াছে। গীত, নৃত্য ও বাদ্যের সহিত পানেরও উচ্ছ্বাস বসিয়াছে। কলিকাতা হইতে ডাক্তারের কতিপয় বন্ধু ও তথাকথিতা কতকগুলি তরুণী বান্ধবীর আগমনে তাহাদের অভ্যর্থনা সূত্রে এই নৈশ উৎসবের আয়োজন। উপর্য্যুপরি পেগের প্রাবল্যে মজলিস যখন টলটলায়মান, তখন সরস্বতী-কাননের রুদ্ধ ফটকের সম্মুখে এক সওয়ার উপস্থিত হইয়া শান্ত্রীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিল; ব্যস্তভাবে উঠিয়া সে দেখিল, বাহিরে অশ্বারোহী প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার উর্দ্দী হইতেই প্রকাশ পাইতেছে—সে হুজুরের বার্ত্তাবহ।

দ্বার খুলিতেই অশ্বারোহী জানাইল, বড় হুজুরের রোকা লইয়া সে আসিয়াছে, এখনই ছোট হুজুরের হাতে দাখিল করিতে হইবে; ভারি জরুরী খবর আছে।

চিঠি পড়িবার মত অবস্থা তখন ছোট হুজুরের ছিল না, অগত্যা বিশু ডাক্তারকেই চিঠি খুলিতে হইল; ক্রমাগত পেগ চালাইয়াও তিনি এ পর্য্যন্ত হুঁসিয়ার ছিলেন। মনে মনে চিঠিখানা আগে পাঠ করিয়াই ডাক্তার উল্লাস তুলিলেন—হুর্‌রে!

জোর করিয়াই সকলে চক্ষুগুলি ক্ষণিকের জন্য উঁচু করিয়া চাহিলেন, মজলিসের আর সকলেই সম-অবস্থাপন্ন। ডাক্তার কণ্ঠে জোর দিয়া পড়িলেন—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীহরিনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরম শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ,—এইমাত্র বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার ও জেলার কালেক্টর সাহেব শিকারে বাহির হইয়াছেন, আগামী কল্য প্রত্যুষে তাঁহারা বাগুলী প্রাসাদে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ

করিবেন জানাইয়াছেন। অতএব যে অবস্থায় তুমি আছ, ডাক্তারকে লইয়া পাত্রপাঠ ওখান হইতে রওয়ানা হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ

বড় হুজুরের এই জরুরী পত্র যে এরূপ আনন্দ-সংবাদ বহন করিয়া আনিবে, নিবারণ বা ডাক্তার কেহই তাহা কল্পনা করে নাই। কিন্তু তথাপি দুঃখের বিষয় এইটুকু যে, এ আনন্দে পরিপূর্ণরূপে হৃদয়োচ্ছ্বাস মিলাইবার শক্তি বা উৎসাহ তখন তাহাদের ছিল না। তথাপি ডাক্তারের নির্দ্দেশে এই নৈশ-প্রমোদ-যজ্ঞে শেষ আহুতি অর্পণ করিতে প্রত্যেকেই পূর্ণ পাত্র হস্তে কম্পিতপদে দাঁড়াইল এবং ভগ্নকণ্ঠে সমস্বরে উচ্ছ্বাস তুলিল —মহামান্য কমিশনার এবং কালেক্টর সাহেবের উদ্দেশে—

উদ্দেশ্যটুকু পূর্ণ হইতেই পুনরায় নৈশ যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিজাতীয় ধ্বনি উঠিল—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!

দুই

মা! মা! মা!

স্বামীর আর্ত্তকণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বানধ্বনি বধূর সুপ্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। ধড়মড় করিয়া সে উঠিয়াই অদূরবর্ত্তী মৃদু আলোটির দিকে ছুটিল। আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে সে দেখিল, স্বামী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে; দুই চক্ষু তাহার বিস্ফারিত, মুখে এক অভিনব ভাবের বিকাশ!

কি হয়েছে? এমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠলে যে!

বধূর কথায় স্বামী যেন সম্বিৎ পাইল; দুই চক্ষুর দৃষ্টি স্বাভাবিক করিয়া বধূর দিকে চাহিয়া সে ভাবগদ্গদস্বরে কহিল—মূর্ত্তি ধ'রে মা আমার

বিছানায় এসে বসেছিলেন, আমার গায়ে হাত দুখানি তাঁর বুলিয়ে দিলেন, মনে হ'ল শ্বেতপদ্মের পাপ্ড়িগুলি কে যেন পীঠময় ছড়িয়ে দিচ্ছে ; এখনও সে পরশ যেন অনুভব করছি ; ছবিতে মার যে চেহারা দেখি, ঠিক তাই, কেবল গায়ের রং পদ্মের মত ধবধবে সাদা !

বধূ কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কোনও প্রশ্নও তুলিল না ; স্নিগ্ধস্বরে শুধু কহিল—সাধনায় চিত্তশুদ্ধি হলেই দিব্যভাব আসে, শেষে দিব্যদর্শনও হয়ে থাকে ; এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

গোবিন্দ কহিল—আশ্চর্য্য ত হই নি, কিন্তু দুঃখিত হয়েছি খুবই ; জেগে উঠে মাকে দেখতে পেলুম না ত !

বধূ মধুর কণ্ঠে ব্যথিত স্বামীকে আশ্বাস দিল—চোখের দেখাটাই কি বড় দেখা ? তাঁর প্রতি অচলাভক্তি রাখলে মনের মধ্যে সর্ব্বক্ষণই ত তাঁকে দেখতে পাবে। আনন্দমঠের কথা মনে নেই ?—বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে !

বাহিরের দ্বারে এই সময় ঘন ঘন আঘাতের শব্দ দম্পতিকে চমকিত করিয়া তুলিল। অসময়ে কোন্ প্রয়োজনে কে এ ভাবে উপদ্রব আরম্ভ করিল ! উভয়েই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, চারিটা বাজিতে তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

আজ গোবিন্দই দ্বার খুলিতে অগ্রবর্ত্তী হইল। বধূ মুগ্ধদৃষ্টিতে স্বামীর ক্ষিপ্রগতির দিকে তাকাইয়াছিল, সে তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল, অঙ্গচালনার প্রতি ছন্দে পৌরুষের দীপ্তি যেন ঝলমল করিতেছে ! বধূর কণ্ঠে তখনও উদগ্র হইয়া উঠিতেছিল পদাবলীর সেই মধুর পদটি—ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায় !

গোবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন, তোমাকে ডাকছেন, দাসীরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বধূর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—আমাকে

যখন ডেকেছেন, নিশ্চয়ই অসুখ বেশী রকমেরই হয়েছে। তুমি যাবে না ?

ম্লানমুখে গোবিন্দ কহিল—আমাকে ত ডাকেন নি !

বধূ কহিল—অসুখ-বিসুখে তোমাকে ডাকবারও যে প্রয়োজন আছে, সে ধারণা এখনও ত তাঁর মনে শক্ত হয়ে স্থান পায় নি !

কথাটা শুনিয়া গোবিন্দের মনে অভিমান জাগিল, কহিল—বাবা কি ভেবেছেন, এখনও আমি তেমনিটি আছি ! তিনি ত দেখে গেছেন, আমি ত্রৈরাশিক শেষ করেছি, তাঁর কথার জবাবও দিয়েছি, তারপর, এ ক'মাসে কি আরও কিছু উন্নতি আমার হয় নি ?

স্বামীর কথাগুলি বধূর অন্তর স্পর্শ করিল, কিন্তু সে এইসূত্রে তাহাকে উত্তেজিত না করিয়া প্রবোধ দিবার ছলে কহিল—এমনও হতে পারে, সেই থেকে বাবার মনে একটা অনুতাপ হয়েছে, তুমি এখন শিক্ষায় ও বুদ্ধিশুদ্ধিতে আরও এগিয়েছ অনুমান করে হয় ত তোমাকে ডাকতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। তবে তুমি ইচ্ছা করলে, নিজেই তাঁর কাছে এ অবস্থায় যেতে পার, তাতে কোনও দোষ নেই, তিনি তোমাকে দেখে খুসীই হবেন।

গোবিন্দ ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া কহিল—কিন্তু তাতে যদি মন্দ হয় ? সেদিন একখানা বইয়ে পড়েছিলুম না—অসুখের অবস্থায় খুব খারাপ খবর শোনানো যেমন ঠিক নয়, ভাল খবরও হঠাৎ শোনাতে নেই, তাতে মন্দ হয়। আমি বেশ ভাল হয়েছি দেখে বাবার অবস্থা যদি হঠাৎ আরও খারাপ হয়ে যায় ?

বধূ প্রশংসার দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—কিন্তু আমার মাথায় এ কথাটা ঢোকে নি ! সত্যিই তুমি, মায়ের কৃপা পেয়েছ ! বাসরঘরের সেই মানুষটি তুমি, সে রাত্রেও তোমার কথা শুনেছি, আর আজ রাত্রেও শুনছি !

বধূর কথার উত্তরে গোবিন্দ দুই চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া কহিল—আর তুমি সেখানে যে কথা আমাকে শুনিয়েছিলে, কাজেও তাই করেছ ; তোমার জন্যই না আমি আজ মানুষ হয়েছি !

বধূর মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিলেও নির্ম্মল হাসির স্নিগ্ধতায় সে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল—তুমি যে মানুষ হয়েছ, সে তোমার মনের জোরে।

গোবিন্দ কণ্ঠস্বর আরও গাঢ় করিয়া কহিল—কিন্তু আমার মনে জোর দিয়েছিল কে ? মানুষ হবার পর থেকে আমি কি ভাবি জান ?—লেখা-পড়া যারা শেখে নি, তারা কি হতভাগা ! তোমায় না পেলে আমি ত সারাজীবন এমনই হতভাগা হয়েই থাকতুম ; সবাই দূর ছাই করত, এই দেখ, এখনও আমার মাথার ছিট্ যায় নি ! তোমাকে এখনো আটকে রেখেছি ; তুমি আগে বাবার কাছে যাও, আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম !

বধূ অপলকনয়নে মুগ্ধদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, গোবিন্দ তাহার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই উভয়ের দৃষ্টির সংযোগ ঘটিল ; সঙ্গে সঙ্গে দুইখানি মুখই এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তিন

সুদীর্ঘ কক্ষে পালঙ্কের উপর কর্ত্তা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া আছেন। তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া মাধুরী দেবী, মৃণালিনী ও আরও কতিপয় মহিলা নানারূপ পরিচর্য্যা করিতেছেন। হাসপাতালের বর্ষীয়ান সহকারী চিকিৎসক সহকর্ম্মীদের সহিত অনতিদূরে বসিয়া ঔষধপত্রের ব্যবস্থাবিধানে তৎপর।

বাবা !

এই পরিচিত আহ্বানটুকুর আশ্চর্য্য প্রভাবে রোগীর আচ্ছন্নভাব সেই মুহূর্ত্তেই কাটিয়া গেল, চক্ষু তুলিয়া আস্তে আস্তে স্নেহকোমল কণ্ঠে কহিলেন—বৌমা !

বধূ অসঙ্কুচিতভাবে একেবারে শয্যার প্রান্তদেশে আসিয়া শ্বশুরের পা দুইখানি কোলে লইয়া বসিল।

কর্ত্তার মুখ হইতে তৃপ্তিজনিত মৃদু স্বর বাহির হইল—আঃ !

রাণীর দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া বধূ প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে, মা ?

রাণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—হঠাৎ মাথা ঘুরে প'ড়ে যান, তবে ভগবানের দয়ায় নিজেই সামলে নিয়েছিলেন, চোট লাগে নি ; কিন্তু মাথাটার ভেতর এখনও গোল রয়েছে।

বধূর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কণ্ঠ অত্যন্ত মৃদু করিয়া কহিল—ডাক্তার কি বলছেন মা ?

এরা ত কিছু মুখে বলছে না, মাথায় বরফ দেবার ব্যবস্থা করেছে, একটা ইন্‌জেকসনও দিয়েছে! বিশু ডাক্তার না এলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

বধূ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তিনি এখনও আসেন নি কেন ?

রাণী অপ্রসন্ন-মুখে কহিলেন—তিনি বাইরে গেছেন। তবে শুনছিলুম, অসুখ হবার আগেই নাকি কি দরকারে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন ; সকালেই এসে পড়বে।

সকলকে চমকিত করিয়া রোগী এই সময় প্রশ্ন করিলেন—বৌমা, ঘুমুচ্ছিলে বোধ হয় ?

বধূ কহিল—না বাবা, আমি জেগেই ছিলুম। কিন্তু আপনি চুপ করুন বাবা, কথা কইবেন না।

কণ্ঠস্বরে অপেক্ষাকৃত জোর দিয়া কর্ত্তা কহিলেন—তা হ'লে তোমাকে

ডাকলুম কেন, মা? আজ ত ডাকবার কথা নয়—পিতৃপক্ষ চলেছে, দেবীপক্ষ আসতে এখনো ক'টা দিন বাকি; কিন্তু বাধ্য হয়েই আমাকে অকাল-বোধন করতে হ'ল যে, মা!

রোগীকে এভাবে কথা কহিতে দেখিয়া প্রবীণ ডাক্তার হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, চিকিৎসকের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া অনুযোগের সুরে কহিলেন—করছেন কি হুজুর! একটা কথা বলাও এখন আপনার পক্ষে সাংঘাতিক যে!

আরক্ত দুটি চক্ষু প্রখর করিয়া রোগী ডাক্তারের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণে তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন—জীবনে কোনও দিন কারুর শাসন মানি নি, ডাক্তার! আজ তুমি রোগের দোহাই দিয়ে আমাকে ঠেকাতে এসেছ?

ডাক্তার হাত দু'খানি যোড় করিয়া কহিল—আমার অপরাধ হয়েছে, আপনি থামুন।

তর্জ্জনী তুলিয়া রোগী কহিলেন—থামব আমি! এখনই?—সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতকণ্ঠে অদ্ভুত রকমের উচ্চ হাস্যের সহিত কহিলেন—রেসের ঘোড়া বেপরোয়া ছুটে চলেছে, তোমার সাধ্য কি তাকে থামাবে! থামবে সে আপনি, একেবারে সীমানায় গিয়ে।

ডাক্তার রোগীর প্রকৃতি বোধ হয় জানিতেন, সুতরাং আর না ঘাঁটাইয়া তাঁহার স্থানে ফিরিয়া গেলেন।

বধূকে উদ্দেশ করিয়া রোগী কহিলেন—ডাক্তার বুঝি পালালো বৌমা, তা ত পালাবেই! ও কি কবরেজের মেয়ে যে চোখ পাকিয়ে একটি কথায় দাবিয়ে দেবে! হাঃ হাঃ হাঃ—কিন্তু, কথাটা শুনে তুমি ত রাগ কর নি, মা?

বধূ ডাকিল—বাবা!

এ ডাকে শুধুই সম্বোধনের আভাস ছিল না, আরও অনেক কিছুই

ছিল। রোগীর কানে এই দৃপ্ত আহ্বান যেন উন্মাদনাময় সুরের ঝঙ্কার দিল। উদ্বেলিতকণ্ঠে কহিলেন—বাঃ! এই ডাকই শুনতে চাইছিলুম মা!

বধূ স্নিগ্ধস্বরকে কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল—কারুর শাসন কোনও দিনই আপনি মানেন নি, তা আমরা জানি; কিন্তু এখন আপনাকে শাসন মানতেই হবে, বাবা! আপনি একটি কথাও কইতে পাবেন না; এ কথা যদি না মানেন, আমরা সকলেই উঠে যাব এখনি।

আস্তে আস্তে একখানি হাত তুলিয়া কর্ত্তা কহিলেন—তা আমি জানি, তুমি মা, সব পার। ডাক্তারকে ভয় করি না, কিন্তু তোমাকে করি।

দৃঢ়স্বরে বধূ কহিল—তা হ'লে আপনার একান্তই ইচ্ছা, আমরা উঠে যাই?

রোগী এবার বিকৃতকণ্ঠে কহিলেন—উঠে যাবে! তুমি কি ভেবেছ মা, সেবা করতেই তোমাকে ডেকে এনেছি! যে কথা বলবার জন্ম জিভ্‌খানা আমার সুড়-সুড় করছে, তোমাকে তা শুনতেই হবে, না শুনে নিষ্কৃতি নেই; তোমারও নয়, আমারও নয়—

বধূ কোমলকণ্ঠে কহিল—কিন্তু এখন কি কথা শোনবার সময় বাবা?

কর্ত্তা পূর্ব্ববৎ বিকৃতকণ্ঠে হাসিয়া কহিলেন—সময়ও যে ঠিক আমারই মতন, মা! কারুর বাঁধাধরা মানে না; যখন সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়, কেউ ঠেকাতে পারে না। হাঁ, যে জন্য তোমাকে ডেকেছি, তাই বলছি,—দিনটা নিজেই এগিয়ে এসে পড়েছে মা, ফেরাবার যো নেই; কমিশনার সাহেব কালেক্টরকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন, কাল সকালেই হাজীর হচ্ছেন এখানে—

কথার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তার মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বক্তব্যটুকু সমাপ্ত হইবার অবকাশ পাইল না।

বধূ তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া কর্ত্তার বুকখানির উপর আস্তে আস্তে হাত

বুলাইতে লাগিল, তাহার বদ্ধদৃষ্টি শ্বশুরের ব্যথাক্লিষ্ট মুখখানির দিকেই আবদ্ধ রহিল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই। কিন্তু সে ভাবটুকু কাটিতেই কর্ত্তা পুনরায় পরিপূর্ণদৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিলেন।

বধূ শ্বশুরকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়া নিজেই কহিল—আপনার স্বভাবের যতটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি বাবা, তাতে আমি কখনই এ কথা বিশ্বাস করব না যে, কমিশনার সাহেবের খাতিরের কোনো ত্রুটি হবে ভেবেই আপনি এতখানি কাতর হয়ে পড়েছেন!

বধূর কথায় সহসা কর্ত্তার মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল, উৎসাহের স্বরে কর্ত্তা কহিলেন—তুমি মা বাহাদুর মেয়ে, রোগ ঠিক ধরেছ! কমিশনার আর কালেক্টর এখানে শিকার করতে আসছে না মা, বিচার করতে আসছে!

কথাটা রোগীর কক্ষে সমবেত সকলকেই চমকিত করিয়া দিল। বধূ শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—সে এক্তিয়ার কি এখনই ওঁদের আছে বাবা?

আর্ত্তস্বরে কর্ত্তা উত্তর দিলেন—হয় ত নেই; কিন্তু না থাকলেও এমন নালিশ ওঁদের কাছে উঠেছে, আর কেউ হলে বিনা-এত্তেলায় পুলিশ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যেত! কিন্তু জানে কিনা, এ বড় শক্ত ঘানী, তাই পুলিশ দিয়ে ঘাঁটাতে সাহস পায় নি—কর্ত্তারাই সেজেগুজে আসছেন শিকারের ছলে তদারক করতে; না বলবার যো নেই, নতুন অর্ডিনান্সে বাধে—

বধূ বিস্ময়ের সুরে কহিল—এ যে ভারী আশ্চর্য্যের কথা বাবা! সরকার আপনাকেও অর্ডিনান্সের জালে বাঁধতে—

কথাটা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, শ্বশুরের মুখের আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বধূ যেন জোর করিয়াই কণ্ঠরোধ করিল।

কর্ত্তা উষ্ণ হইয়া কহিলেন—আমাকে? এই ত মা, এবার ভুল করে বসলে—

বধূ অবিচলিতকণ্ঠে কহিল—আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি বাবা, আমার অনুমান ঠিক হয় নি ; কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি বাবা, ওরা শিকারের ছলে কাকে শিকার কর্ত্তে আসছেন !

ব্যগ্রভাবে কর্ত্তা কহিলেন—বুঝতে পেরেছ মা, বুঝতে পেরেছ ? তা হ'লে এখন নিশ্চয়ই জানতে পারছ, ওদের আসবার নামে আমি এতটা কাতর হয়েছি কেন ?

বধূ ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর স্নিগ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল—কিন্তু বাবা, আপনার পা দুখানি ছুঁয়েই আমি বলছি, দু একটা কঠিন কাজে হাত দিলেও, এমন কোনও অন্যায় কাজ এ পর্য্যন্ত আমি করি নি, যাতে অর্ডিনান্সের আমলে যেতে পারি। ওরা নিশ্চয়ই একটা কল্পিত বস্তুর ওপর আঘাত করতে আসছেন, কিন্তু সে বস্তুটির অস্তিত্বই নেই।

কর্ত্তা বধূর কথাগুলি ধীরভাবে শুনিয়াও অধীর হইয়া কহিলেন—যদি আমি আজ চাঙ্গা থাকতুম মা, কোনও কথাই ছিল না ; কিন্তু এখন দাঁড়াচ্ছে কি জান মা—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—

বধূ শ্বশুরের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়াই কহিল—আপনি জেনেছেন বাবা, আমার বিরুদ্ধে নালিশটা কি ?

কর্ত্তা অস্থিরভাবেই উত্তর দিলেন—অনেক, অনেক মা, অনেক ; এ সব ত আগে থাকতে জানবার কথা নয় ; তবে কি জান মা, সব দফ্তর থেকেই খবর ফাঁস হয়ে বেরোয়, সরকারের দফ্তরখানাও বাদ যায় না, তাই জেনেছি, নালিশ উঠেছে তোমার বিরুদ্ধে—তুমি নাকি নানা রকমে সন্দেহের মধ্যে পড়েছ, তোমার হাতের অনেক চিঠিপত্র নাকি ধরা পড়েছে, যে সব শক্ত শক্ত কাজ তুমি করেছ, সেগুলো নজীর হয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ; তা ছাড়া—তুমি নাকি আমাকেও মুঠোর ভেতর পূরেছ, আর আমার মূর্খ পাগলা ছেলেকে উপলক্ষ করে প্রকারান্তরে তুমিই

বাগুলীর মালিক হবার চেষ্টায় আছ, আসল উদ্দেশ্য তোমার—সরকারের বিরুদ্ধবাদীদের সাহায্য করা।

বধূ নিবিষ্ট মনেই শ্বশুরের মুখের কথাগুলি শুনিল, কিন্তু তাহার মুখে আতঙ্ক বা দুশ্চিন্তার কোনওরূপ ছায়া পড়িতে দেখা গেল না, সহজ কণ্ঠেই কহিল—ন্যায়কে জোর করে অন্যায় সাব্যস্ত করবার অনেক চেষ্টাই অনেকে করে—কিন্তু ন্যায় চিরদিন ন্যায়ই থাকে; সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। কি বলব, আমি আপনার কুলবধূ, নইলে ওঁরা এখানে এলে আমি নিজেই ওঁদের সামনে গিয়ে জবাবদিহি করতুম—

প্রগাঢ় উৎসাহের স্বরে কর্ত্তা কহিলেন—এই জন্যেই আমি তোমাকে ডেকেছিলুম মা,—এই জন্যই, এই জবাবদিহি করবার জন্যই।

বধূ বদ্ধদৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—বাবা, আমি তা হ'লে—

কর্ত্তা কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া কহিলেন—হাঁ মা, তুমি তৈরী হও, আমি যখন বলছি, কোনও সঙ্কোচ তোমার নেই; আজ সব নির্ভর করছে তোমার ওপর। তুমি যাও মা—

বধূ কহিল—তাঁরা যখন আসবেন, প্রয়োজন বুঝে আমি যাব বাবা, এখন আমার সমস্ত কর্ত্তব্য আপনার কাছে, আপনার সেবায়—

অধৈর্য্যভাবে কর্ত্তা কহিলেন—না মা, তোমার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য এখন তোমার আত্মরক্ষার তোড়যোড় করায়, নিজের ঘরে গিয়ে ভেবে নাও মা, কি ভাবে মুখরক্ষা করবে; আমার সব ভাবনা যে এখন তোমাকে নিয়েই—

বধূ অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল—আপনার পা দু'খানি দু'হাতে ধরেই আপনাকে জানাচ্ছি বাবা, আপনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন, যার মনে পাপ নেই, তার মর্য্যাদা মা জগদম্বাই রক্ষা করবেন, তাঁর কৃপায় বংশের অমর্য্যাদা হবে না বাবা!

মনে মনে যেন একটা তৃপ্তি অনুভব করিয়া কর্ত্তা আবেগের সহিত কহিলেন—রক্ষা শুধু তোমারই নয় মা, আমারও; তার পর মা, যদি এ যাত্রা নিজে রক্ষা পাই—তখন শাসনের একটা—থাক্ মা, ও বাজে কথা; কি বলতে কি বলছিলুম; হাঁ—তুমি তা হ'লে ওঠ মা—ভোর হ'তে বোধ হয় বেশী বিলম্ব নেই।

বধূ শ্বশুরের পা দুইখানি আস্তে আস্তে উপাধানের উপর রাখিয়া মিনতির কণ্ঠে কহিল—আমি ত উঠছি বাবা, কিন্তু আমার মিনতি, আপনি আর বকতে পারবেন না।

কর্ত্তার মুখে হাসি দেখা দিল, কহিলেন—তাই হবে মা, এবার চুপ করব। তুমি এসো মা।

বধূ ধীরে ধীরে রোগীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। কর্ত্তা ক্ষণকাল পরে সজোরে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন—ইসারায় কথাটা বুঝে নিলে, তাই বলি-বলি করেও আসল কথাটা আর বলা হ'ল না।

রাণী এ পর্য্যন্ত বধূ ও শ্বশুরের কথাপ্রসঙ্গে চুপ করিয়াই ছিলেন, এবার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে কহিলেন—তা হ'লে যে উচ্ছ্বাস এতক্ষণ চালালে সেটা নকল?

কথাটা শুনিবামাত্রই কর্ত্তা জ্বলিয়া উঠিলেন; তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিলেন—নকলের কথা তোমার তোলবার কারণ? আমি আসলের কথাই না বলেছি!

রাণীও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন—আসলের কথা উঠলেই নকলের কথা আপনিই আসে। আমি অন্যায় কিছু বলি নি। কথা চেপে রাখবার অভ্যাস আমার নেই!

কর্ত্তা দুই চক্ষুর দৃষ্টি খরতর করিয়া রাণীর দিকে চাহিলেন, পরে একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন—আর এই অভ্যাসটুকু প্রথম আরম্ভ করতে গিয়েই আমার এই অবস্থা।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রাণী প্রশ্ন করিলেন—কথা বলবার অর্থ? কাকে লক্ষ্য ক'রে এই আসল কথাটা এতক্ষণে প্রকাশ করা হ'ল?

এবার কঠিন হইয়াই কর্ত্তা কহিলেন—শুনবে? কিন্তু এটা ঠিক আসল কথা নয়, মুখবন্ধ বলতে পারো। আসল কথাটা কি জান? তোমার গুণধর ছেলে বিশু ডাক্তারকে উকিল ধরে কালেক্টর সাহেবের কাছে এত্তেলা দিয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে—

কে—নিবারণ?

হাঁ, হাঁ, তবে গুণধর ছেলে বললুম কেন!

কি এত্তেলা দিয়েছে?

সে অনেক—যত রকমের অস্তর আছে, আড়াল থেকে সবগুলোই ছুঁড়েছে—

কে বলেছে এ কথা?

সে খবরে কি দরকার? মনে কর, বাতাস আমার কানে কানে শুনিয়েছে সব, কিন্তু মিছে নয়—সত্যি। এই জন্যই কালেক্টর সাহেব কমিশনারকে নিয়ে শিকারের অছিলায় বাগুলিতে শুভাগমন করছেন। এই আসল খবরটা বাপুলি ছাড়া আর কেউ শোনে নি—আমিও মনের ভেতর চেপে রেখে মুখ বন্ধ করেছিলুম, কিন্তু বরদাস্ত হ'ল না;—মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না, তবে আফশোষ এই—এই—ওঃ—

উত্তেজনার প্রাবল্যে কর্ত্তার কণ্ঠস্বর এইখানেই রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখের ভঙ্গি ও চক্ষুর অস্বাভাবিকতা কক্ষের সকলকেই চমকিত করিয়া তুলিল; প্রবীণ চিকিৎসক শশব্যস্ত হইয়া রোগীর সান্নিধ্যে ছুটিয়া আসিলেন।

চার

বাগুলীর অধিবাসীদের চমকিত করিয়া প্রত্যুষেই বিভাগের কমিশনার ও কালেক্টর সাহেব বেশ ঘটা করিয়াই বাগুলীর ভূস্বামী-ভবনে পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে ছিলেন পুলিস-সাহেব, মহকুমার কয়েকজন দারোগা এবং অনেকগুলি সশস্ত্র বরকন্দাজ।

দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী পূর্ব্বাহ্ণেই এষ্টেটের বিশিষ্ট আমলাবর্গের সহিত সাহেবদের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুসজ্জিত ড্রইংরুমে অভ্যাগতদের সম্বর্দ্ধনার পর দেওয়ানজী সবিস্ময়ে জমিদারের আকস্মিক অসুস্থতার সংবাদ জানাইয়া কহিলেন—আমি তাঁর প্রতিনিধিরূপে আপনাদের সেবায় আদিষ্ট হয়েছি, শিকার সম্বন্ধে আপনাদের যেরূপ অভিরুচি তার যথাযথ ব্যবস্থায় কোনও অবহেলা হবে না।

কালেক্টর সাহেব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কমিশনারের দিকে চাহিলেন; ক্ষণকাল উভয়ের মধ্যে চুপি চুপি কি একটা পরামর্শ হইয়া গেল। পরক্ষণে কালেক্টর সাহেব আসন হইতে উঠিয়া দেওয়ানজীকে একান্তে ডাকিয়া তাঁহাকে অন্যের-অশ্রুতস্বরে জানাইয়া দিলেন যে, শিকারের অছিলায় তাঁহারা আসিয়াছেন বটে, কিন্তু শিকারটাই তাঁহাদের ঠিক উদ্দেশ্য নয়; জমিদারের পুত্রবধূর বিরুদ্ধে তাঁহারা যে গুরুতর অভিযোগ পাইয়াছেন, সেই সূত্রে রীতিমত তদন্ত করিতেই তাঁহাদের এভাবে আসা। তবে কমিশনার সাহেবের একান্ত ইচ্ছা এতবড় এষ্টেটের যিনি মালিক, তাঁর পারিবারিক সম্ভ্রম রক্ষার অনুরোধে প্রাথমিক তদন্ত গোপন ভাবেই শেষ করা হয়।

দেওয়ানজী জানাইলেন—আপনার এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ আমাকে চমৎকৃত করেছে; যাঁর সম্বন্ধে আপনারা তদন্ত করতে এসেছেন, তাঁর প্রকৃতি এত সুন্দর ও নির্দোষ যে, শেষে আপনারাই অনুতপ্ত হবেন।

কালেক্টর সাহেব কহিলেন—ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হলেই আমরাও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করব; কিন্তু তদন্ত কার্য্যটি অপরিহার্য্য।

দেওয়ানজী কহিলেন—তা হ'লে, হুজুরের যদি অভিপ্রায় হয়, ষ্টেট্-রুমেই তদন্তের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আবার ক্ষণকাল সাহেবদের মধ্যে পরামর্শ হইল এবং কালেক্টর দেওয়ানজীকে জানাইলেন, সে-ভাল; কিন্তু সে-ঘরে বাইরের কেউ থাকবে না, সরকার পক্ষের কমিশনার, কালেক্টর, পুলিশ-সাহেব ও কমিশনারের পার্শনাল এসিষ্ট্যাণ্ট—এই কয়জন মাত্র থাকিবেন এবং দেওয়ানজী ও কোনও একজন উকীল অভিযুক্তকে সাহায্য করিবেন।

দেওয়ানজী কহিলেন—উকীলের উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন হবে না, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, যদি মিথ্যা হয়, তিনি নিজেই খণ্ডন করতে পারবেন; আর যদি সত্য হয়, স্বয়ং জ্যাকসন সাহেব এসে দাঁড়ালেও কিছুই হবে না।

দেওয়ানজীর কথায় প্রীত হইয়া কমিশনার সাহেব কহিলেন—ঠিক কথা; আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন।

ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইল না। জমিদারী-সেরেস্তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যবর্ত্তী সুবিশাল সুসজ্জিত গদী-গৃহে চারিজন পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী সমবেত হইলেন। বৃহৎ গৃহের আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় ব্যবস্থা সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

কমিশনার সাহেব প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন—জমিদারের ছেলেরা কোথায়? ইচ্ছা করলে তাঁরা এখানে উপস্থিত থাকতে পারেন।

দেওয়ানজী কহিলেন—ছোটকুমার বাইরে গেছেন, কাল রাত্রেই তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছে; বড়কুমার বাড়ীতেই আছেন, তাঁরও শরীর ভাল নয়, তবে যদি তদন্ত সূত্রে প্রয়োজন হয়, তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

বড়কুমারের শরীর সম্বন্ধে সংবাদটুকু কালেক্টর সাহেবকে কতকটা আশ্বস্ত করিল। ইতিমধ্যেই ভিতরে সংবাদ গিয়াছিল এবং যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্তকারীরা সাগ্রহেই সেই ভীষণ প্রকৃতির মেয়েটির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইল না, ভিতরের দিকের দীর্ঘ দ্বারের সুশোভন পরদাখানি ঠেলিয়া তাঁহাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত, যে মেয়েটি তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার অনবদ্য আকৃতি, অনিন্দ্যসুন্দর মুখের অপূর্ব্ব দীপ্তি ও কুণ্ঠাহীন নির্ভিক ভঙ্গি দেখিয়া তদন্তকারীরা ভুলিয়া গেলেন যে, এই অসাধারণ মেয়েটির বিরুদ্ধে আরোপিত গুরুতর অভিযোগগুলির তদন্ত করিতেই তাঁহারা উপস্থিত—কমিশনার সাহেবের দেখাদেখি সকলেই তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাথার টুপী খুলিয়া কিঞ্চিৎ নতও হইলেন।

কিন্তু যাহার উদ্দেশে, পদস্থ রাজপুরুষদের এই সম্মান, সেই মেয়েটিও তৎক্ষণাৎ প্রত্যভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা অবনত করিয়া পরিষ্কার ইংরেজীতে কহিল—সামান্য একটা নারীকে গ্রেপ্তার করতে এসেও আপনারা যে শিষ্টাচারের পরিচয় দিলেন, সেটা আপনাদের জাতিগত সভ্যতারই নিদর্শন, এজন্য আমিও বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলেই চমৎকৃত। বাঙ্গলার এমন অতি অল্প ভূস্বামীর সহিত কমিশনার ও কালেক্টর সাহেব পরিচিত ছিলেন, যাঁহারা বিশুদ্ধ ইংরাজীতে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে সমর্থ। পল্লী-বঙ্গের এই বিখ্যাত জমিদারটিও যে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহাও কালেক্টার সাহেবের অবিদিত ছিল না। কিন্তু তাঁহারই তরুণী বধূটির মুখে এমন শিষ্টাচার-সঙ্গত ইংরেজী বাণী ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া তাঁহারা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বধূই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল—আমাদের দুর্ভাগ্য, যে আমার

মাননীয় শ্বশুর অসুস্থতাবশতঃ আপনাদের স্থায় পদস্থ রাজপুরুষদের সম্বর্দ্ধনায় বঞ্চিত, যদিও আমি তাঁর পুত্রবধূ, কিন্তু আপনাদের যোগ্য সম্বর্দ্ধনার অধিকার আমারও নেই; যেহেতু আমি জানতে পেরেছি, আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগসূত্রেই আপনারা তদন্ত করতে এসেছেন। আপনাদের এ কার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করতেই আমি এসেছি। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আসন গ্রহণ করুন, আমি আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই প্রস্তুত।

কমিশনার সাহেব কহিলেন—আপনি আপনার আসনে আগে বসুন; যদিও আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই অপ্রীতিকর কার্য্যে অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আপনার অপরাধ প্রতিপন্ন না হবে, আপনার স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আপনি অনুগ্রহ করে বসুন।

অগত্যা সন্নিহিত একখানি শোফায় বধূকে বসিতে হইল। বধূ বসিলে, কমিশনার সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীরা আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হইল। কমিশনার সাহেবের সহকারী বাঙ্গালী-সাহেবটি দলিল দস্তাবেজের ফাইলটি কমিশনার সাহেবের হাতে দিলেন।

কাগজগুলি ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত হইয়া ফাইলে আবদ্ধ ছিল। প্রথম কাগজখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া কমিশনার সাহেব বধূকে প্রথম প্রশ্ন করিলেন—আপনার নাম শ্রীমতী চণ্ডী দেবী?

বধূ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—হাঁ।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন—কতদিন হল আপনার বিবাহ হয়েছে?

বধূ উত্তর দিল—আজকের দিনটি ধরে ছয় মাস একুশ দিন মাত্র।

পুনরায় কমিশনার সাহেবের প্রশ্ন—শ্যামাপুরে আপনার পিত্রালয়? বিবাহের পূর্ব্বে সেইখানে থাকতেন?

বধূ কহিল—হাঁ।

কমিশনার—সেখানে আপনি কোন মিসন গার্ল স্কুলের লেডী টিচার মিস্ খ্রীষ্টকুমারীকে প্রহার ও রীতিমত লাঞ্ছিত করেছিলেন ?

বধূ—প্রহার অবশ্য করি নি, কিন্তু প্রয়োজন-মত লাঞ্ছিত যে করেছিলুম এ কথা সত্য।

কমিশনার—এটা কি অপরাধ ব'লে গণ্য হতে পারে না ?

বধূ—এ ঘটনা দেড় বছর পূর্ব্বের, এতকাল পরে কি সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে নালিশ উঠেছে স্যার ?

কমিশনার—নালিশ ঠিক ওঠে নি, কিন্তু মূল নালিশের সংস্রবে এটা নজীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি উত্তর দিন।

বধূ—আমার উত্তর কি আপনি সত্য বলে বিশ্বাস করবেন ?

কমিশনার—নিশ্চয়ই ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার মত সুশিক্ষিতা মহিলা মিথ্যা বলবেন না।

বধূ—তা হ'লে সে ইতিহাসটা আমাকে সংক্ষেপে বলতে হয়।

কমিশনার—বলুন।

বধূ—আমার যতদূর মনে অছে, ঐ ইস্কুলের কোনো উৎসব-সভায় গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের মত আমিও নিমন্ত্রিতা হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ইস্কুলের লেডী টিচার আমাদের অকারণ অপমান করেছিলেন।

কমিশনার—কি সূত্রে ?

বধূ—তিনি বক্তৃতাসূত্রে আমাদের সমাজ, ধর্ম্ম ও সংস্কারের ওপর অযথা আক্রমণ করেন, আমি সেখানে একমাত্র মেয়ে প্রতিবাদ তুলেছিলুম।

কমিশনার—বটে ! তার পর ?

বধূ—সেই প্রতিবাদের উত্তরে তিনি তর্কসূত্রে কোনও প্রতিবাদ না তুলে, আমাকে তাঁর সামনে ডেকে আমার এই গালে হাত তুলেছিলেন।

কমিশনার—আপনি তখন কি করলেন ?

বধূ—প্রভু যীশুখ্রীষ্টের উপদেশটি মেনে নিয়ে এ গালটিও অবশ্য তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিই নি—বরং তাঁকে কিঞ্চিৎ শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হাতখানা দিয়ে তাঁর টেবিলখানা উল্‌টে দিয়েছিলুম, তিনি সেই সঙ্গে অবশ্য পড়ে গিয়েছিলেন, দোয়াতের কালিতে তাঁর কালো মুখখানা আরও কালো হয়ে গিয়েছিল।

কমিশনার সাহেব ও তাঁহার সহচরগণ এ সময় অতিকষ্টে মুখের উদগ্র হাসি সম্বরণ করিলেন।

বধূ অকুণ্ঠিতভাবেই পুনরায় কহিল—এ কার্য্যকে যদি আপনারা অপরাধ বলে ধরেন, তা হ'লে অবশ্যই আমি অপরাধী।

এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সস্মিতমুখে কমিশনার সাহেব অন্য প্রশ্ন তুলিলেন—এ কথা কি সত্য নয়—আপনিই জোর-জবরদস্তি করে ঐ ইস্কুলটা তুলে দেন

বধূ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—কখনই না; হতে পারে গৌণভাবে এ ব্যাপারে আমাকেই উপলক্ষ হতে হয়েছিল, কিন্তু আমি নিজে ওর বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলি তোলবারও অবসর পাই নি।

কমিশনার—কেন বিবাহের সময় আপনার শ্বশুরের কাছে এই মর্ম্মেই কি যৌতুক চান নি যে, ঐ ইস্কুলের পাঠ উঠে যায়, আর আপনার নামে একটা নতুন ইস্কুল বসে?

বধূ—আমি আমার শ্বশুরের কাছে সত্যই এই যৌতুক চেয়ে নিয়েছিলুম যে, এমন একটা ভাল ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়, যেখানে মেয়েরা বিনা-খরচে লেখাপড়া শিখতে পারে এবং সেই শিক্ষাতে বাধ্যবাধকতা থাকে; কোনও ইস্কুল তুলে দিতে তাঁকে বলি নি, তিনিও দেন নি; তবে যদি আমার এই প্রার্থনা উপলক্ষ হয়ে আপনা-আপনিই কোন স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, সে আলাদা কথা।

কমিশনার—কিন্তু এই চাওয়াটা কি সমর্থনযোগ্য?

বধূ—আপনাদের ইয়োরোপের কোনও সভ্য রাজ্যের একটা নজীর দেখিয়ে আমি প্রতিপন্ন করতে পারি যে আমার ঐ চাওয়াটা কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি ;—এর গোড়ায় ছিল শুধু জাতীয় সমাজ ও শিক্ষার প্রতি দরদ, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ নয়।

কমিশনার—ইয়োরোপের কি নজীর আপনি দেখাতে চান ?

বধূ—ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের আলসেস-লোরেন নামে দুটো প্রদেশ জার্ম্মাণরা দখল করে নেয়, আর সেখানকার সমস্ত স্কুলে জার্ম্মাণ-সরকার জার্ম্মাণ ভাষাতেই ফরাসী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা দেন ; ফরাসীদের আপত্তি-প্রতিবাদ সমস্তই ভেসে যায়। কিছুকাল পরে জার্ম্মাণীর রাণী আলসেস-লোরেন পরিদর্শন করতে আসেন, সেই সময় সমস্ত ইস্কুলের মেয়েরা মিলিত হয়ে তাঁর সম্বর্দ্ধনা করে। রাণী মেয়েদের ব্যবহারে অত্যন্ত খুসী হয়ে বলেন—তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি,—তোমরা কি চাও ? দশ বছরের একটি মেয়ে তৎক্ষণাৎ রাণীকে জানায়—আলসেস-লোরেনের সমস্ত ইস্কুলে যাতে ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করে যান, তা হ'লেই আমাদের সমস্তই পাওয়া হবে। রাণী তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন।

কমিশনার সাহেব কহিলেন—হাঁ, এ ইতিহাস আমি পড়েছি।

বধূ—তা হ'লে আপনিই বলুন, যেখানে আমাদের ধর্ম্ম ও সংস্কারের সম্বন্ধে সঙ্গতি রেখে সুশিক্ষা দেবার মত বিদ্যালয়ের একান্ত অভাব ছিল, সেই অভাবটুকু মোচনের প্রার্থনাই আমি যদি করে থাকি, সেটা কি দোষের হয়েছে ?

কমিশনার সাহেব স্তব্ধভাবে হাতের কাগজপত্রগুলির উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, কোনও রূপ বিদ্বেষ যদি আপনার এই প্রার্থনার মূলে প্রচ্ছন্ন না থাকে, তা হ'লে নিশ্চয়ই এটা দোষের নয়, বরং প্রশংসার বিষয়। কিন্তু নানাসূত্রে

আমরা জানবার সুযোগ পেয়েছি যে, শিক্ষা-প্রচার সম্বন্ধে-আপনার উদ্দেশ্য বিপ্লবমূলক!

বধূ কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল—কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করে আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনাদের এই ভয়ঙ্কর ধারণা, সেটা আমি জানতে পারি?

হাতের ফাইলটি তুলিয়া ধরিয়া কমিশনার সাহেব কহিলেন—নিশ্চয়ই; এই ফাইলটা আপনি দেখুন, এতে সব চিঠি এবং ছাপা ইস্তাহার আছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন; তারপর এগুলো সম্বন্ধে আপনার কৈফিয়ৎ দিন।

ফাইলটির ভিতর কতকগুলি চিঠি ও কয়েকখানি মুদ্রিত ইস্তাহার ছিল। বধূ সেগুলি দেখিয়া ও কিছু কিছু পড়িয়া ফাইলটি সন্নিহিত একখানি আইভরি টিপয়ের উপর রাখিয়া কহিল—এর মধ্যে যে অস্ত্রগুলি আপনারা সংগ্রহ করে রেখেছেন, এগুলি অবলম্বন করেই যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকেন, আপনাদের সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়েছে।

বধূর স্পর্দ্ধায় বিরক্ত হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কমিশনার প্রশ্ন করিলেন—কেন?

শ্লেষের সুরে বধূ উত্তর দিল—কারণ, ওর সবগুলিই অচল।

কমিশনারের মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বধূ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল—ওগুলোর সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎটুকুও অনুগ্রহ করে শুনুন।

বধূ পরক্ষণে ফাইল হইতে একখানি ছাপা ইস্তাহার বাহির করিয়া কহিল—নীচে আমার নাম দিয়ে এই সব ইস্তাহার ঘোষণা করা হয়েছে—"শ্যামাপুরের মিশন ইস্কুল তুলে দিতে তার চেয়েও কঠোর, এমন কি স্থল-বিশেষে চরম পন্থা অবলম্বন করা চাই; দু-একটা মিশন ইস্কুলে উপদ্রব হ'লে, মিশনারী টিচারের উপর আক্রমণ চ'ললে, এদেশে এদের যতগুলো

ইস্কুল আছে, সবগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।"—আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এই ইস্তাহারে প্রেসের নাম নাই, শুধু আমার নামটাই ছাপা আছে। আপনাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমার নামের কোনও খ্যাতি নেই এবং অন্তঃপুরের বাইরে পা-বাড়াবার আমার অধিকার নেই, আমার যদি এই উদ্দেশ্যই থাকবে, আমি তার সিদ্ধির জন্য এভাবে ইস্তাহার ছাপাতে যাব কেন? আমার শ্বশুরের যে প্রতাপ ও প্রভাব, তাতে তাঁর সমস্ত জমিদারীর মধ্যে যতগুলো মিশনারী ইস্কুল আছে—আইন সঙ্গত উপায়েই সেগুলোর দরজা বন্ধ করা যেতে পারত, কিন্তু এক শ্যামাপুরের দৃষ্টান্ত ত অন্য কোথাও অবলম্বন করা হয় নি?

কমিশনার সাহেব মনোযোগের সহিত বধূর কথাগুলি শুনিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—তা হ'লে এই ছাপানো ইস্তাহারগুলোর সঙ্গে আপনার সংস্রব অস্বীকার করতে চান?

বধূ কঠিন হইয়া উত্তর দিল—নিশ্চয়ই।

কমিশনার—আর ঐ সব চিঠি? ওগুলোর সঙ্গেও কি আপনি সংস্রব অস্বীকার করবেন?

বধূ—আমি ত আগেই বলেছি স্যার, ও সমস্তই অচল! চিঠিগুলো পরীক্ষা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন,ভেতরের লেখা কোনও মেয়ের, কিন্তু তার শিক্ষা সামান্য, পত্রের ছত্রে ছত্রে বর্ণাশুদ্ধি; আর লেফাফার ঠিকানা কোনও শিক্ষিত পুরুষের, পাকা হাতের ইংরেজী হস্তাক্ষর। আমার হাতের ইংরেজী ও বাঙ্গলা দুটোই আপনাদের সামনেই লিখে দিচ্ছি, আপনারাও পরীক্ষা করুন এবং পরে হস্তলিপি বিশারদদের পরীক্ষার জন্য দিলেও জানতে পারবেন, আমার কথা মিথ্যা নয়।

নিকটের আধারে লিখিবার যাবতীয় উপকরণ ছিল, বধূ একখানি সাদা কাগজে কয়েক ছত্র বাঙ্গলা ও ইংরেজী লিখিয়া কমিশনার সাহেবের টেবলে রাখিয়া দিল।

তৎক্ষণাৎ বধূর হস্তলিপি ও ফাইলটি লইয়া কমিশনার সাহেবের তত্ত্বাবধানে সমবেত কয়জন রাজকর্ম্মচারী গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পরীক্ষা অন্তে কোনও রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া কমিশনার সাহেব কহিলেন—কিন্তু চিঠিগুলির লেফাফায় এখানকার ডাকঘরের মোহর পড়েছে, সেটা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন?

বধূ পরিষ্কার কণ্ঠেই উত্তর দিল—করেছি। প্রেসে ইস্তাহারগুলো ছাপা হয়েছে যেমন সত্য, চিঠিগুলোও ডাকঘরে ফেলা হয়েছে তেমনই সত্য; কিন্তু লেখিকা ও প্রেরিকা বলে যে নামটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেইটিই শুধু সত্য নয়।

কমিশনার—এমন হওয়াও ত আশ্চর্য্য নয় যে, আপনি আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে চিঠিগুলো অপর কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন?

বধূ—তাতে আমার লাভ? আন্দোলনে যোগ দিয়ে বাঙ্গলার যে সব মেয়েরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মত নামের প্রতিষ্ঠা আমার যখন নেই, আমার নাম ইস্তাহারে জড়াবার কি সার্থকতা বলুন ত? হাতের লেখা প্রকাশ করবার সাহস যার নেই, ইস্তাহারে নাম প্রকাশের সাহস তার পক্ষে কতটুকু সম্ভব?

কমিশনার—আপনি শপথ করে বলতে পারেন, ফাইলের এই সব কাগজপত্রের সম্বন্ধে আপনি বরাবরই অজ্ঞ—কোনও সংস্রবই আপনার নেই?

বধূ—এই ফাইলটি দেখেও ত আমার বক্তব্য আমি আগেই বলেছি, আর ঈশ্বরের নামে শপথ করে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এইটুকু বলতে পারি যে, এ পর্য্যন্ত আমি একটি মিথ্যা কখনও বলি নাই এবং সত্য গোপনের শিক্ষা পাই নাই।

কমিশনার—তা হ'লে, আপনার কোনও শত্রুপক্ষ আপনার অনিষ্টের

উদ্দেশ্যে আপনার নামেই এই কাজগুলি সুকৌশলে সম্পন্ন করেছে, আপনি কি এরূপ অনুমান করেন ?

বধূ—এ সম্বন্ধে আমার অনুমান অপেক্ষা আপনাদের অনুসন্ধান কি অধিক বলবান নয় ? আমি এ সম্বন্ধে একটা কথা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

কমিশনার—নিশ্চয় ; আত্মপক্ষ সমর্থনে এখানে যে কোনও প্রশ্নই আপনি তুলতে পারেন।

বধূ—ইস্তাহারের নীচে শুধু আমার নামটি ছাপানো আছে, কোনও সমিতির নাম ঠিকানার উল্লেখ মাত্র নেই ; চিঠিগুলি যে সব লেফাফার মধ্যে পাঠানো হয়েছে, তাতে লেখা আছে—'সেক্রেটারী, নারী-প্রগতি সমিতি, টালিগঞ্জ, সাউথ কলিকাতা।'—নিশ্চয়ই আপনারা এই ঠিকানা থেকেই এসব অস্ত্রগুলি আবিষ্কার করেছেন ; কিন্তু সেখানে কি সত্যই কোনও সমিতির অস্তিত্ব আছে ? যদি থাকে, সেক্রেটারীর সন্ধান পেয়েছেন ? কোনও সভ্যকে সেখানে দেখেছেন ? আমার সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত গ্রহণ করেছেন ? তাঁরা কি একরার করেছেন, আমাকে জানেন বা আমি তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংস্রব রাখি ?

এ প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবেই কমিশনার সাহেব কহিলেন —আপনার এই প্রশ্নগুলির সম্বন্ধে কোনও উত্তরই উপস্থিত আপনাকে দিতে পারব না, ক্ষমা করবেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার কমিশনার সাহেবের দিকে চাহিয়াই বধূ বেশ সহজ কণ্ঠেই কহিল—আমাকে আর কিছু প্রশ্ন করবার আছে ? আপনাদের সন্দেহ কি আমি মোচন করতে পেরেছি ?

কমিশনার সাহেব কথায় একটু জোর দিয়াই এবার কহিলেন—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমাদের তদন্ত এখনও শেষ হয় নি, আরও প্রশ্ন আছে।

বধূর মুখখানি আপনা-আপনিই একটু নত হইল। কমিশনার সাহেব বক্রদৃষ্টিতে বধূর দিকে একবার চাহিলেন, তাহার পরই পুনরায় প্রশ্ন তুলিলেন—আপনার স্বামীর নাম গোবিন্দনারায়ণ?

বধূ—হাঁ।

কমিশনার—তিনি জন্মাবধিই জড়ভাবাপন্ন, মূর্খ এবং উন্মাদ?

বধূ—অনেকেরই এরূপ ধারণা বটে।

কমিশনার—আপনার কি ধারণা তাঁর সম্বন্ধে?

বধূ—এ প্রশ্নেরও কি উত্তর দিবার কোনও সার্থকতা আছে আমার পক্ষে? জিজ্ঞাসা করতে পারি কি স্যার, কি উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন আমাকে করা হচ্ছে?

কমিশনার—এই উদ্দেশ্যে যে, আপনার মত একজন মার্জ্জিত-রুচি শিক্ষিতা মহিলা এমন অপদার্থকে বিবাহ করেছিলেন কোনও দলের প্ররোচনায়—ভবিষ্যতে এইসূত্রে এই এষ্টেটের অর্থে উক্ত দল প্রভাবান্বিত হবে এই অভিপ্রায়ে?

বধূ—আমি যদি এই প্রশ্নের উত্তরে বলি, সকলেই যে-মানুষটিকে অপদার্থ সাব্যস্ত করেছিল, আমি তার মধ্যে পদার্থ আছে বুঝে, নিজের চেষ্টায় তাঁকে আদর্শ মানুষ করে তুলব বলেই বিবাহ করেছিলুম এবং আমার সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে—তা হ'লে কি আপনি স্বীকার করবেন যে, আপনার এ সন্দেহও অমূলক?

বধূর এই উত্তর শুধু কমিশনার সাহেব নহে, তাঁহার অন্য তিন জন সহচরকেও সেই মুহূর্ত্তে সচকিত করিয়া তুলিল। চারিজন রাজকর্ম্মচারীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময়ের অভিনয় বধূর দৃষ্টি এড়াইল না। বধূ বুঝিল, প্রসঙ্গ এবার উপসংহারের পথে আসিয়াছে। সাহেবরা ভাবিলেন, নিজের কথাতেই এই অদ্ভুত মেয়েটি এবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এরূপ ভাবিবার হেতু যথেষ্ট ছিল। অন্য প্রসঙ্গগুলির অবস্থা বধূর যুক্তিতে কাহিল হইয়া

পড়িলেও, আলোচ্য প্রসঙ্গটি যে একেবারেই অব্যর্থ সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে কোনও সন্দেহই ছিল না। তদন্তকারীরা তদন্তে আসিবার পূর্ব্বে কোনও ইংরেজী সাময়িক পত্রে এই এষ্টেট সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণেও জ্ঞাত হইয়াছেন যে, জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জড়ভাবাপন্ন ও বিকৃত-মস্তিষ্ক; বাগুলীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের অভিমত হইতে এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত বলিয়াই তাঁহারা অবগত হইয়াছেন। অথচ, বধূই এখন তাঁহাদের সমক্ষে বলিতে চাহে—তাহার স্বামী অপদার্থ নহে।

বধূর কথাটা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কমিশনার সাহেব কহিলেন—আপনি কি আপনার এই কথাগুলি এখনই প্রত্যাহার করবেন?

বধূ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—কেন?

কমিশনার—আপনার কথায় স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে যে, আপনার স্বামী মোটেই অপদার্থ অর্থাৎ বিকৃত মস্তিষ্ক বা মূর্খ নন, তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন!

বধূ—অন্ততঃ আমার এইরূপ ধারণা তাঁর সম্বন্ধে।

কমিশনার—কিন্তু অন্যের ধারণা তাঁর সম্বন্ধে কিরূপ, আপনি কি তা বিশেষভাবে জ্ঞাত নন?

বধূ—আমাকে এ প্রশ্ন করাই বৃথা; অন্যের ধারণা অনুসারে আমার বিবেকবুদ্ধি পরিচালিত হতে পারে না।

সাহেবের লাল মুখখানার উপর মুহূর্ত্তের জন্য যেন একখানা ধূসর আবরণ পড়িল। পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া কমিশনার সাহেব দৃঢ়স্বরে কহিলেন—তা হ'লে অনর্থক আমরা সন্দেহের পথে চলেছি, আপনার উপযুক্ত স্বামীর সহিত পরিচিত হবার সুযোগ এক্ষেত্রে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না; আমরা তাঁর উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি।

বধূ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেওয়ানজীর দিকে চাহিতেই, তিনি উঠিয়া দ্বারের

দিকে অগ্রসর হইলেন। ভিতরে কতিপয় পরিচারিকা আজ্ঞা প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি তাহাদিগকে যথোচিত নির্দ্দেশ দিলেন।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। সহসা কমিশনার সাহেব সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বধূকে প্রশ্ন করিলেন—আপনার স্বামীর সম্বন্ধে আপনার উচ্চ ধারণা অনুসারে তাঁকে সুশিক্ষিত বলে গ্রহণ করবার আশা বোধ হয় আমরা করতে পারি?

বধূ উত্তর দিল—ইংরেজীই যদি শিক্ষার মাপকাঠি হয়, আর সেইটি উপলক্ষ করেই আপনারা তাঁর শিক্ষার বিচার করতে চান, তা হ'লে হয় ত হতাশ হবেন, সে রকম সুশিক্ষিত অবস্থায় উপনীত হওয়াটা তাঁর পক্ষে এখনও সময়সাপেক্ষ। তবে কিছুকাল পরে সে ত্রুটিটুকুও তাঁর থাকবে না, বাঙ্গালার যে কোনও সুশিক্ষিত জমিদারের সঙ্গে সমান-তালে পা ফেলে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারবেন—এ ভরসা আমি রাখি।

কমিশনার সাহেব কহিলেন, আপনার স্বামীর সম্বন্ধে অন্যপক্ষ থেকে আমরা এপর্য্যন্ত যে সংবাদ পেয়েছি, সেই সূত্রেই আমরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করব। আমরা যদি দেখি, তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন, তা হ'লেই আমরা আপনার সমস্ত উক্তি স্বীকার করে এইখানেই তদন্ত শেষ করব।

বধূর মুখে কোনও পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা গেল না, শুধু সে কহিল—আমি কি কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে যেতে পারি?

বধূর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কমিশনার সাহেব আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন—নিশ্চয়ই; যদি প্রয়োজন হয় আমরা আপনাকে আহ্বান করব।

বধূ এই কক্ষে আসিবার সময় যে ভাবে সাহেবদের সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছিল, এই কক্ষ ত্যাগ করিবার সময়ও তাহাতে বঞ্চিত হইল না।

অল্পক্ষণ পরেই দ্বারের পরদা ঠেলিয়া গোবিন্দনারায়ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ

করিল। তুষারশুভ্র ক্ষৌম পরিচ্ছদধারী কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ আগন্তুক যুবার দীর্ঘায়ত দিব্যমূর্ত্তির দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে সাহেবরা চাহিয়া রহিলেন।

দেওয়ান কহিলেন—ইনিই এই এষ্টেটের জমিদার বাবু হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দনারায়ণ গাঙ্গুলী।

গোবিন্দনারায়ণ রীতিমত গাম্ভীর্য্যের সহিত অগ্রসর হইয়া সাহেবদের উদ্দেশে ইংরাজীতে সুপ্রভাত জানাইয়া অভিবাদন করিল।

তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কমিশনার সাহেব আসন হইতে উঠিয়া প্রত্যভিবাদনসূত্রে গোবিন্দের করমর্দ্দন করিলেন, কালেক্টর প্রভৃতিকেও তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিতে হইল।

শিষ্টাচার বিনিময়ের পর সকলেই আসন গ্রহণ করিলে কমিশনার সাহেব গোবিন্দনারায়ণের দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় প্রশ্ন করিলেন—এই এষ্টেটের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি কি বিষয়ে আছে—জানতে পারি?

গোবিন্দনারায়ণ ধীরে ধীরে প্রতি কথাটি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন—কি রকম সম্বন্ধের কথা আপনি জানতে চাইছেন?

কমিশনার সাহেব গাঢ়স্বরে কহিলেন—আমি জানতে চাই, এই ষ্টেটের য়্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশান সম্বন্ধে আপনি কি ভাবে আপনার পিতাকে সহায়তা করে থাকেন?

গোবিন্দনারায়ণ হাসিমুখে কহিল—আমাকে নিয়েই এই ষ্টেট এবং আমার পিতা বরাবরই বিব্রত, সুতরাং আমার পক্ষে তাঁর সহায়তা করা কি সম্ভব?

কমিশনার—এ কথা আপনি বলছেন কেন? আপনাকে নিয়ে ওদের বিব্রত হবার কারণ?

গোবিন্দ—কারণ, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সকল বিষয়েই অযোগ্য ছিলুম।

কমিশনার—এখনও আপনি নিজেকে সকল বিষয়েই অযোগ্য মনে করেন?

গোবিন্দ—না। শিক্ষার অভাবে তখন ভাবতুম, সত্যই আমি অযোগ্য, কিন্তু এখন কিঞ্চিৎ শিক্ষা পেয়ে ভাবি, চেষ্টা করলে যোগ্যতা লাভ করা বিশেষ কঠিন নয়। হয় ত উপযুক্ত শিক্ষা পেলে, আমার বাবাকে এবং তাঁর ষ্টেটকে য়্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশান সম্বন্ধে সাহায্য করাও ভবিষ্যতে আমার পক্ষে সম্ভব হবে।

কমিশনার—আপনার সম্বন্ধে আমরা যে সব রিপোর্ট পেয়েছি, অর্থাৎ আপনি ভদ্রসমাজে মিশতে পারতেন না, লেখাপড়া মোটেই জানতেন না, আপনার মাথাও পরিষ্কার ছিল না—এসব কি ঠিক শুনেছি?

গোবিন্দ—ঠিক শুনেছেন। আমার পূর্ব্বের জীবন এখন আমার নিজের কাছেই দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। সবাই আমাকে ভাব্‌ত—ম্যাড, ফুল, য়িডিয়াট—

কমিশনার—আর, আপনি কি ভাবতেন?

গোবিন্দ—আমিও নিজেকে বেকাস, পাগলা বা গাধা ভেবে নিয়েছিলুম! ম্যাড, ফুল আর য়িডিয়াট কথার মানে ত তখন বুঝতুম না!

কমিশনার—এখন সমস্ত ইংরেজী কথার মানে বুঝতে পারেন?

গোবিন্দ—সমস্ত কথারই যে মানে বুঝতে পারি তা নয়, তবে কতক কতক কথার পারি। এখনও আমার শিক্ষা শেষ হয় নি।

কমিশনার—শিক্ষা কতদিন আরম্ভ করেছেন?

গোবিন্দ—বিবাহের পর, এখনো সাত মাস পূরো হয় নি।

কমিশনার—তার পূর্ব্বে কি করতেন?

গোবিন্দ—কিচ্ছু না—না-মানুষ না-পশু এমনি অবস্থায় ঘরের কোণে

পড়ে থাকতুম ! যাঁরা আমাকে মানুষ করতে আসতেন, দিন দুই নাড়াচাড়া করেই সরে পড়তেন, বলতেন, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, ষ্টিডিয়াট, জড়ভরত, কিচ্ছু হবে না।

কমিশনার—তা হ'লে কি আপনি বলতে চান, আপনার বিবাহের পর —এই কয়মাসের চেষ্টাতেই আপনি এতটা উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন ?

গোবিন্দ—হাঁ।

কমিশনার—কি করে এটা সম্ভব হল, আমাকে বলবেন কি ?

গোবিন্দ—আমার স্ত্রীর চেষ্টায়। আমাকে অপদার্থ দেখে তিনিই আমার শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন।

কমিশনার—আপনি তা হ'লে স্বীকার করছেন, তাঁরই শিক্ষায় আপনার এই পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি ?

গোবিন্দ—নিশ্চয়ই, আমি এ কথা গর্ব্বের সঙ্গে স্বীকার করছি।

কমিশনার—আচ্ছা, আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ; আপনার স্ত্রী যেমন আপনার পড়াশুনার সাহায্য করতেন, আপনি তাঁর অন্যান্য কাজেও সেইভাবে নিশ্চয়ই সাহায্য করতেন ত ?

গোবিন্দ—তাঁর ত আর কোনও কাজই ছিল না, আমার শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া ! তিনি যে এই কাজেই তার জীবন উৎসর্গ করেছেন, স্যার !

কমিশনার সাহেব সহর্ষে এইবার গোবিন্দনারায়ণের করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন—আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, বাবু ; ধন্যবাদ !

ঠিক সেই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, নিবারণ, তাহার পশ্চাতে ডাক্তার বিশ্বমিত্র ; তাহাদের মুখ দুইখানি তখন ছায়ের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দেওয়ান কহিলেন—ইনিই বাগুলীর জমিদারের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু নিবারণ গাঙ্গুলী।

কালেক্টর সাহেব তর্জ্জনের সুরে কহিলেন—হ্যালো! এই তোমার ভাই গোবিন্দ, তোমার কথিত—য়িডিয়াট এবং ম্যাড?

নিবারণের নেশা কাটিলেও জিহ্বার জড়তা তখনও কাটে নাই; স্খলিতকণ্ঠে সে কহিল—ইয়েস্, দিন ও রাত যেমন সত্য, তেমনই সত্য আমার ভাই ফুল, য়িডিয়াট এবং ম্যাড—

কমিশনার সাহেব বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কহিলেন—But now we see, the tables have been turned!

কমিশনার সাহেবের ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত তীক্ষ্ণ রোষের সুর মিশাইয়া কালেক্টর সাহেব কহিলেন—Now, save your situation Nibaran Babu!

ডাক্তার বিশ্বমিত্র এই সময় নিবারণকে চুপি চুপি আত্ম-সমর্থনকল্পে কমিশনার সাহেবের স্তুতির কতিপয় মন্ত্র বাতলাইয়া দিলেন।

সেই অনুসারে নিবারণ সাহেবের অভিমুখে অগ্রসর হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেহের টাল সামলাইতে পারিল না, পড়িয়া ত গেলই, এবং সেই সঙ্গে এমন কদর্য্য নিদর্শনও প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, পানাসক্তিসূত্রে তাহার মত্ততার কথাও সাহেবদের অবিদিত রহিল না।

ভৃত্যগণ কক্ষমধ্যে ছুটিয়া আসিয়া ছোট হুজুরকে তুলিয়া ধরিল।

কমিশনার সাহেব তর্জ্জনের সুরে সেই অবস্থায় তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

অতঃপর কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া সাহেব দেওয়ানের দিকে চাহিয়া কহিলেন—এক্ষণে আমার এইমাত্র অনুরোধ আপনার জমিদারের নিকট, কয়েক মিনিটের জন্য তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলবার অনুমতি প্রদান করেন।

সাহেবের প্রস্তাব শুনিয়া দেওয়ান তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে কর্ত্তার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

পাঁচ

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ প্রহরে প্রহরে শ্রবণ করিতে যেরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন, ততোধিক আগ্রহে শয্যাশায়ী হরিনারায়ণবাবু বাগুলীর সভা-গৃহের বার্ত্তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ করিতেছিলেন। বার্ত্তার অভিনবত্ব ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার রোগমলিন মুখের উপর একটা অননুভূত আনন্দের রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিল!

দরবারী পরিচ্ছদ চোগা-চাপকানের পরিবর্ত্তে পুত্রের পিধানে বিশুদ্ধ গরদের ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ পিতাও বুঝিয়াছিলেন, কাহার উন্নত পরিকল্পনা পোষাক সম্বন্ধে চিরাচরিত রীতির পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। বিমুগ্ধ পিতার পদধূলির সহিত আশীর্ব্বাদ লইয়া গোবিন্দ উদ্বেলিত অন্তরে কমিশনার-সন্দর্শনে গমন করিয়াছিল, পুনরায় যখন ফিরিল, মুখখানি তাহার প্রফুল্ল এবং সঙ্গে কমিশনার সাহেব স্বয়ং।

গোবিন্দই প্রথমে কহিল—বাবা, সাহেব এসেছেন; ইনিই আমাদের বিভাগের কমিশনার—

বধূ ভিতরে আসিয়াই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া শ্বশুরের শিয়রে গিয়া বসিয়াছিল। সাহেবকে দেখিয়াই মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কর্ত্তা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চাহিলেন মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব হাত তুলিয়া ভারতীয় প্রথায় নমস্কারের ভঙ্গিতে পরিষ্কার বাঙ্গলায় কহিলেন—নমস্কার গাঙ্গুলীবাবু! আপনার এইপ্রকার অসুস্থ অবস্থা জেনেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে কয়েক মিনিটের জন্য আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আপনার পুত্রবধূর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সূত্রেই আমরা তদন্তে এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে আনন্দের সহিত জানাচ্ছি, আপনার পুত্রবধূ তাঁর অসাধারণ শিক্ষা, সত্য-নিষ্ঠা ও মনের দৃঢ়তায় সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে

তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে তাঁর ন্যায় আদর্শ উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখপ্রকাশ করছি।

কর্ত্তা হাতখানি কষ্টে তুলিয়া কহিলেন—ধন্যবাদ সাহেব! আপনার সৌজন্যে আমি যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তেমনই আনন্দ পাচ্ছি ও আশ্চর্য্য হচ্ছি আপনার মুখে এমন পরিষ্কার বাঙ্গলা শুনে।

সাহেব হাসিয়া কহিলেন—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই বাবু! আমি জাষ্টিস উড্রফের শিষ্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শৈশব থেকেই আমার মাতৃভাষার মত চর্চ্চা করে আসছি।

সাহেবকে বসিবার জন্য অনুরোধ করা হইল, কিন্তু তিনি বসিলেন না,—সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া এবং অবগুণ্ঠনবতী বধূর উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

বধূর মাথায় শিথিল হাতখানি রাখিয়া কর্ত্তা কহিলেন—সব দিক দিয়েই তুমি জিতেছ মা, তুমি যে স্বয়ংসিদ্ধা, তাই এমন ক'রে সর্ব্বরক্ষা করতে পেরেছ, মা! বোবাকে বাণী দিয়েছ, পাথরকে জাগিয়ে তুলে বাঙালীর মুখ রক্ষা করেছ মা, তুমি!

বধূ আত্মপ্রশংসার উচ্ছ্বাসে অভিভূতা না হইয়া কোমল কণ্ঠে ভক্তির আবেগে কহিল—সবই তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে, বাবা, আমার কোনো কৃতিত্বই ত নেই; আপনি ত জানেন বাবা—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬